মনোনিবেশ করেছিলেন। নতুন বক্তব্য, জীবনবোধ নিয়ে ভিন্ন ধরনের দর্শক আকর্ষণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে প্রযোজনা, সেক্ষেত্রে এ ঘটনা কিছুটা স্বাভাবিক ছিল। তার ফলে যে বিষয়-পরম্পরায় গোটা নাটকের সন্ধিগুলো অগ্রগামী হয়ে নাটকের সুষম সমাপ্তি ঘটে, সে নিয়ম পরম্পরা সব সময় বজায় থাকেনি। বস্তুত নাটকটির প্রতিটি দৃশ্য চমক বিশিষ্ট। প্রত্যেকটা দৃশ্যের শেষে অতর্কিত চমকসৃষ্টির একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তাতে দর্শক সাধারণের উপভোগ্যতা বহুগুণ বেড়ে যায় ঠিক কিন্তু তাতে গোট নাটকে যে উৎকণ্ঠা বজায় থাকবার ˉ .. নোট থাকেন। কালীধন ধাড়া হারু দত্ত পর্যন্ত একটা Dramatic Suspense বজায় ছিল। কিন্তু তাদের হাতে হাতকড়ি পড়বার পর নাটকে সে উৎকণ্ঠা আর বজায় থাকেনি। ফলত নাটকে গতিপ্রবাহের তীব্রতা সৃষ্টর পরিবর্তে কেবলমাত্র কয়েকটি সমাজচিত্র তুলে ধরবার চেষ্টার প্রতি একাগ্রতা লক্ষ্য করা গেছে।

৮৭.৮ মূলপাঠ ৪ : 'নবান্ন' নাটকের গঠন

কোনো কাহিনীকে নাটক করে তুলতে গেলে গোটা কাহিনীকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করে নিতে হয়। সাধারণত পাঁচটি ভাগে এই স্তর বিন্যাস হয়ে থাকে । নাটকের পরিভাষায় একে বলা হয় পঞ্চসন্ধি। একটি পূর্ণাঙ্গ বড় নাটকে এই পাঁচ স্তর বা পঞ্চসন্ধির কড়াকড়ি নিয়ম নিয়ে কাহিনীকে নাটক হিসেবে গড়ে তোলা হয়। সর্বাধুনিক বাংলা নাটকের পূর্ব পর্যন্ত এই নিয়মে নাটক গ্রন্থিবদ্ধ হত। কিন্তু আধুনিক নাটকে এই নিয়মের কড়াকড়ি থাকল না। নাটক আকারে এবং প্রকারে ছোট হয়ে আসবার ফলে আধুনিক নাট্যকারগণ গোটা নাটকটিকে তিনটিকে স্তরে ভাগ করে নিলেন। এই স্তর বিন্যাসের সংক্ষিপ্তকরণের কারণটা অনুসন্ধানটা করা যেতে পারে। শুধুমাত্র আকারে এবং প্রকারে ছোট হয়ে যাওয়াটাই বোধ হয় একমাত্র কারণ নয়। গ্রীক নাটকে গুরুত্ব পেত বিষয়বস্তু। তাই গ্রীক নাটককে বিষয় প্রধান বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু সেক্সপীয়রের নাটকে বিষয়টা প্রধান হলনা। প্রধান হল চরিত্র। এই ধারা বয়ে চলল দীর্ঘদিন। বাংলা নাটকের যে যুগটাকে স্বর্ণ যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে অর্থাৎ গিরিশ-অর্ধেন্দু-শিশির-অহীন্দ্র যুগ পর্যন্ত নাটকে প্রধান হয়ে দেখা দিল চরিত্র। যার জন্য প্রায় প্রত্যেকটা নাটকে এমন একজন চরিত্র অঙ্কিত করা হতে থাকল যাতে অভিনয় করবেন কোনো প্রতিষ্ঠিত নট বা নটী। তাদের অভিনয় সাফল্যের সঙ্গে নাটকের সাফল্য ছিল নির্ভরশীল।

আধুনিক কালের বাংলা নাটক দুটি ধারায় বয়ে চলে। একটিতে মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য পুরোপুরি বজায় থাকে। অপর ধারাটি গণনাটকের খাত বেয়ে গণচেতনা বৃদ্ধি, যে গণচেতনা সমাজ পরিবর্তনের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহন করবে— সেই দিকে এগিয়ে যায়। গণনাটকে তাই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এবং মনস্তত্ত্বের সংমিশ্রিত রূপেই পরিবর্তন ঘটে গেল। নাটকে এসে গেল শোষক শোষিতের সংঘাত মুখর সম্বন্ধ। অর্থাৎ শ্রেণীদ্বন্দ্ব। তাই ব্যক্তিরই হোক বা মনস্তত্ত্বেরই হোক একক প্রাধান্য বজায় থাকল না। প্রধান হয়ে উঠলো গোটা সমাজ। সমাজে একক ব্যক্তির ভূমিকা নিষ্ক্রিয়। তাই ব্যক্তি প্রধান্যের স্থলে সমষ্টি প্রাধান্য সাব্যস্ত হল। সমষ্টি বলতে এখানে বলা হচ্ছে শোষিত গোষ্ঠী। শোষিত গোষ্ঠীর সংখ্যা বিপুল, তাই বিপুল সংখ্যক মানুষের কথা বলবার জন্য গণনাটক বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। তাই গণনাটকে আমরা দেখলাম প্রতিরোধ আর সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি। তাই এই ধরনের নাটককে বলা হয় প্রতিবাদের নাটক বা Drama of Protest।

'নবান্ন' নাটক Drama of Acceptance বা Interjection অথবা Discomfort নয়, অথবা Frustration কিংবা Drama of Chaos অথবা Absured- ও নয়। 'নবান্ন' প্রতিবাদের নাটক, প্রতিরোধের নাটক,Drama of Protest বা Drama of Revolt বলা যেতে পারে। প্রতিবাদ, প্রতিরোধের মনোভাবটাই এই নাটকের মূল সেন্টিমেন্ট। সুতরাং এই নাটকে ব্যক্তি মনস্তত্ত্বের বক্রগামী রেখাচিত্রের শিল্পসম্মত রুপায়ণ মূল লক্ষ্য নয়, জনগণের দুঃখ দুর্দশার কারণগুলো বিশ্লেষণ করে বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ গড়ে তুলে জনগণকে প্রতিবাদের স্তরে নিয়ে যাওয়াই মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। আর তারপর প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যে দিয়ে কাঙ্খিত মুক্তির শীর্ষবিন্দুটি স্পর্শ করবার পজিটিভ ইঙ্গিতের মধ্যে দিয়ে নাটকটির অভীষ্ট পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে। 'নবান্ন' নাটক এই ধ্যানধারণার সরিক।

সুতরাং এই ধরনের নাটকের স্তর-বিন্যাসেও অনিবার্য ভাবে এসে যায় কিছু অদল বদল। নাটকের গতানুগতিক ঠিকুজি-কুষ্ঠিটা ছিঁড়ে যায়। নাটক যেহেতু প্রত্যক্ষ জীবনের রণক্ষেত্র থেকে উঠে আসে, তাই তার সুরটা হয় চড়া। চড়া সুরকে দীর্ঘতর করলে অনুচিত ফলের সম্বাবনা দেখা দিতে পারে, তাই নাট্যকার পাঁচটি স্তরের পরিবর্তে কেউ তিনটি,কেউ চারটি স্তরে সমস্ত নাটকটি বিন্যস্ত করেন। একেবারে ছোট নাটক তিনটি স্তরে। একটু বড় নাটককে চারটি স্তরে ভাগ করে নিয়ে নাটক গড়ে তোলবার আধুনিক ইচ্ছাটাই অধিক কার্যকরী হয়ে উঠতে দেখা যায়। 'নবান্ন' নাটক বড় নাটক, তাই এই নাটকটি চারটি স্তরে বিন্যস্ত হয়েছে বলা যেতে পারে।

'নবান্ন' নাটকের উৎসমুখ উৎসারিত হয়েছে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে। প্রথম অঙ্গের প্রথম দৃশ্যে দেখান হয়েছে স্বাধীনতার আন্দোলন আর তার ফলস্বরুপ আমিনপুর গ্রামের ক্ষয়ক্ষতি। তারপর দেখান হয়েছে প্রধান পরিবারের সাংসারিক জীবনযাত্রা এবং অনতিবিলম্বে বন্যার ভয়াবহ আক্রমণে গোটা আমিনপুরের সাধারণ মানুষের জীবনের বিপর্যয়ের চিত্র। সেই সঙ্গে মহামারীর ব্যাপক আক্রমণে সহায়সম্বলহীন মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে, খাদ্যাভাবের সংগ্রামের চিত্র। এরই সঙ্গে অসৎ ধনীর অর্থগৃধ্নুতা, লোলুপতার নগ্ন চিত্র অঙ্কিত হয়ে উঠতে থাকল বীভৎসভাবে। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে বন্যা; ঘর বাড়ি মানুষজন জীব জন্তুকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে সমস্ত আমিনপুরকে সমুদ্রে পরিণত করে ফেলেছে। .....সমুদ্দুর, চারদিকে শুধু সমুদ্দুর—জল আর জল, কিছু নেই শুধু জল.....সমুদ্দুর উঠে এয়েছে গ্রামে। রাঙার মা, রাঙা, রাঙার মা রাঙার মা! তার পরের দৃশ্যে বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে খাদ্যাভাবে এবং রোগ অসুখের চিত্র অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত। তারপরের দৃশ্যে পয়সাওয়ালা মানুষের জমি আত্মসাতের অপকৌশলের, লোলুপ দৃষ্টির অবলেহনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই দৃশ্যে সমাদ্দার পরিবার, হারু দত্ত ও তার লোকজনদের নির্মম অত্যাচারে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে শহরে। এই দৃশ্যেই ঘটেছে মাখনের মৃত্যু।

নাটক এরপর উঠতে থাকে ওপরে।, দ্রুতগতিতে রাইজিং এ্যাকসনের স্তর ছেড়ে ক্লাইমেক্স-এর স্তরে পৌঁছতে চায় নাটক। প্রথম দৃশ্যে নারীর ইজ্জত রক্ষা দেশে সঙ্কটত্রাণ সাম্রাজ্যবাদীর পাশবিক শক্তির ব্রিটিশ দমননীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম বস্তুত কেড়ে নিল পঞ্চাননীকে। তৃতীয় দৃশ্যে বন্যা নিল প্রধানের প্রতিবেশী দয়ালের স্ত্রী এবং তার একমাত্র সন্তানকে রাঙা, রাঙার মা। কিন্তু তবুও আমিনপুরের মনোবলটা ভেঙে পড়েনি। তবুও উনানের ধোঁয়া উড়ল। শাকপাতা সেদ্ধ করে মানুষগুলো বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যেতে লাগল

আপন বাস্তুভিটার মাটিটুকু আঁকড়ে। তবে খেত-খামার খাল-বিলের শাকপাতা জগডুমুর আর কুচো কাঁকড় দিয়ে কদিনেই বা চলে, আর ওই বস্তুগুলো অত অপর্যাপ্তই বা কোথায়! তাছাড়া ঘাসেরও দাম বেড়ে গেছে দুর্ভিক্ষের বাজারে। 'এ যেন আমার ঢোলকলমি জলার ঘাস বলে মনে হচ্ছে! তা সে যা করেছ করেছ, আর কেটো না। ঘাসের আজকাল বড্ড দর।'[হারু দত্ত : ১ম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য] প্রধান ঠিক করে জমি বিক্রি করবে। হারু দত্তের সঙ্গে কথা পাকা করে ফেলেছে শুনে বাধা দেয় কুঞ্জ। তার কাছে বাধা পেয়ে প্রধান মত বদলিয়ে ফেলে। ইতিমধ্যেই চালের চোরাচালানদার হারু দত্ত এসে পড়ে ঘটনার কেন্দ্রে। কুঞ্জর সঙ্গে শুরু হল ঘাত-প্রতিঘাত। কুঞ্জকে প্রধান প্রতিবাদী হিসেবে ঘরে নিয়ে তাকে নিষ্ঠুরের মতো লাঠিপেটা করল। প্রধান বাধা দিতে গিয়েছিল, তাকেও রেহাই দিলনা। সমাদ্দার পরিবারের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে বিধ্বস্ত করে দিয়ে বেরিয়ে গেল দস্যু হারু দত্ত তার দলবল নিয়ে। হারু দত্তের অতর্কিত আক্রমণের অভিঘাতে বালক মাখনের মৃত্যু ঘটল। ভয়বিহ্বল বিনোদিনীর চোখেমুখে নেমে আসল 'একটা সমূহ বিপৎপাতের কালো ছায়া'।

'নবান্ন' নাটকের মুখ্য ঘটনা এটাই। এরপরই সমাদ্দার পরিবার শহরের পথে পাড়ি দেয়। অলি-গলিতে পথে পার্কে ঘুরে ঘুরে ভিখিরির জীবনযাপন করতে থাকে। প্রধান সমাদ্দার হয়ে যায় উন্মাদপ্রায়। এরপর কাহিনী কয়েকটি ধারায় বিভক্ত হয়ে ক্রমশ অগ্রসর হয়েছে। একদিকে অঙ্কিত হয়েছে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের মর্মান্তিক জীবনযাত্রার ছবি। তুলে ধরা হয়েছে সমসাময়িক কালের সংবাদপত্রে সাংবাদিক এবং ফটোগ্রাফারদের অর্থ উপার্জনের নোংরা পথ অবলম্বনের চিত্র। তুলে ধরা হয়েছে অসহায় অভাবগ্রস্ত যুবতী মেয়েদের কেনাবেচার চিত্র। পথে পার্কে অসহায় মেয়েদের ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেওয়ার বিবরণ রাখা হয়েছে এই নাটকে।

বিনোদিনীকে এমনিভাবে কাজের লোভ দেখিয়ে এক দালাল তুলে এনে কালীধনের কাছে বিক্রি করে দেয়। এখানে বিনোদিনী মিলিত হয় নিরঞ্জনের সঙ্গে। কালীধন অসৎ উদ্দেশ্যে মেয়ে সংগ্রহ করে অল্প পয়সার বিনিময়ে। 'সেবাশ্রম' নামক একটা জায়গায় তাদের লুকিয়ে রাখে। কালীধনের আরো একটি কারবার আছে। সে চলের মজুতদার। অল্প মূল্যে চাল কিনে গুদামজাত করে রাখে বেশি পয়সায় বিক্রি করবে বলে। তার গুদামে চাল এবং সেবাশ্রমে মেয়ে সরবরাহ করে হারু দত্ত ও টাউটের মত ঘৃণ্য মানুষজন. নাট্যকার কালীধন-হারু দত্ত নিরঞ্জন-বিনোদিনীকে নিয়ে একটি এপিসোড তৈরি করেছেন। এই অংশের পরিণতি ঘটিয়েছেন এইরকম ভাবে যে, সেবাশ্রমে আশ্রিত বিনোদিনী নিরঞ্জনের সঙ্গে আকস্মিকভাবে মিলিত হয়। সেবাশ্রমের সমস্ত গুপ্ত বিবরণ সে তাকে দেয়। নিরঞ্জন সমস্ত শুনে থানায় যায়। কালীধনের চালের গুদামের বিবরণ এবং সেবাশ্রমের বে-আইনী ব্যবসার কথা ফাঁস করে দিয়ে দারোগাকে ডেকে আনে। দারোগা বামালসমেত কালীধন, রাজীব ও হারু দত্তকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। এই ঘটনার পর নিরঞ্জন বিনোদিনী গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে। পুনরায় আমিনপুরের পরিচিত মাটির কোলে ফিরে আসে, নিজেদের বাস্তুভিটেতে আবার নতুন করে ঘর তোলে।

কুঞ্জ রাধিকা প্রধান তখনও শহরের পথে ভিখিরি জীবনযাপন করতে থাকে। নাট্যকার শহরের অলিগলিতে ঘুরিয়ে শেষে তাদের নিয়ে আসে এক বড়লোকের বাড়ির সামনে। উদ্দেশ্য একটা বৈপরীত্যপূর্ণ

ছবি তুলে ধরা। অর্থাৎ একদিকে দুর্ভিক্ষপীড়িত অসহায় মানুষের অ-মানুষিক জীবনযাত্রার ছবি অঙ্কন করা আর তার পাশাপাশি ধনী মানুষের বিলাস-বৈভবের চিত্র, অকারণ অপচয়ের চিত্র তুলে ধরা। সেই সঙ্গে কালোবাজারী ও চোরাকারবারীদের সঙ্গে অশুভ আঁতাত দেশের শাসনব্যবস্থায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের চরিত্র উদঘাটন এবং এ সমস্তের পাশাপাশি ধনের সঙ্গে ধনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিযোগিতার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অপরদিকে নিরন্ন গরিব মানুষদের মধ্যে সম্পর্ক কত আন্তরিক, হৃদ্যতাপূর্ণ, প্রেমপ্রীতির বন্ধন কত নিবিড় তা দেখান হয়েছে। মানুষ যে অবস্থার ফেরে কুকুরের সঙ্গে সহাবস্থানে রত, জন্তুর জীবনযাপনে বাধ্য, কিন্তু তবুও তাদের অন্তঃকরণ মানবিক গুণসমৃদ্ধ সে দৃশ্য দেখিয়ে নাট্যকার কাহিনীকে টেনে নিয়ে গেছেন অন্যদিকে।

এই দৃশ্যের পর সমাদ্দার পরিবার আবার দুটি টুকরোয় বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে যায় কুঞ্জ রাধিকা, আর একদিকে যায় প্রধান সমাদ্দার। কুঞ্জ রাধিকা এসে পড়ে শহরের এক লঙ্গারখানায়। এখানে এসে তার সমবেত ভিখিরিদের কথাবার্তার মধ্যে আমিনপুরের ফিরে যাওয়ার প্রেরণা পায়। অতঃপর আমিনপুরের পথে পা বাড়ায়, 'কুঞ্জর হাত ধরে রাধিকা এগিয়ে চলে।' অপর দিকে দল থেকে বিশ্লিষ্ট প্রধান সমাদ্দার ঘুরতে ঘুরতে এসে ওঠে একটা হাসপাতালে। তার চোখ দিয়ে নাট্যকার হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থার চরম দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরেন। এর পরে প্রধান কোনো দুর্জ্ঞেয় প্রেরণাবশে আমিনপুরে প্রত্যাবর্তন করে নাটকের শেষাংশে।

অতঃপর নাটক চলে আসে পুনরায় আমিনপুরে। নবান্নের উৎসবে সকলে মিলিত হয়।

উপরোক্ত কাহিনী বিশ্লেষণ থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, 'নবান্ন' নাটক সরলরৈখিক ক্রিয়াকাণ্ডের নাটক নয়। জটিল ঘটনার ঘনঘটায় পূর্ণ, সেই সঙ্গে আছে আকর্ষণীয় নাটকীয় উৎকণ্ঠা। প্রতি দৃশ্যে চমক, চমকের পর চমকে নাটকটি জমজমাটি। নাটকটির চারটি অঙ্ক। প্রথম অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কেও পাঁচটি, তৃতীয় অঙ্কে দুটি এবং চতুর্থ অঙ্কে তিনটি দৃশ্য। অতএব চারটি অঙ্কে মোট দৃশ্য সংখ্যা পনেরটি। প্রথম অঙ্কের পাঁচটি দৃশ্যে আমিনপুর গ্রাম। দ্বিতীয় তৃতীয় অঙ্কের সাতটি দৃশ্য শহর। চতুর্থ অঙ্কের তিনটি দৃশ্য পুনরায় আমিনপুর। সব মিলিয়ে আমিনপুর গ্রাম পেয়েছে আটটি দৃশ্য, শহর পেয়েছে সাতটি দৃশ্য। এদিক থেকে মোটামুটি ভারসাম্য বজায় থেকেছে বলা যেতে পারে। আট আর সাতে পনেরটি দৃশ্যের স্তরে স্তরে নাট্যকার সঞ্চারিত করে দিয়েছেন অপর্যাপ্ত নাট্যরস। যে রস দর্শক সাধারণকে জমিয়ে রাখবার জন্যে যথেষ্ট। শম্ভু মিত্র এই নাটকের সম্পাদনা, অভিনয় এবং পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বলেছেন 'নবান্ন' এ ছিল একটা এপিক নাটকের ব্যাপ্তি। নাটকটির একটা এপিসোডিক কারেক্টার আছে। দৃশ্যগুলি এমনভাবে বাঁধা যে, এক একটি ক্লাইম্যাক্স, প্রতিটি দৃশ্যের শেষে আছে। সুতরাং নাটকটি যে খুব জমজমাট সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে প্লট গঠনে শৈথিল্য খুব খানিকটা দুর্নিরীক্ষ নয়।

৮৭.৯ সারাংশ

বাংলা নাটক ও মঞ্চের ইতিহাসে 'নবান্ন' রচনা, প্রকাশ ও অভিনয় একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেছে।

এর পেছনে সক্রিয় ছিল একটি নতুন ভাবনা, বাংলা সহিত্য সংস্কৃতি জগতে অপেক্ষাকৃত নতুনতর রাজনৈতিক দর্শন। মানুষের কথা, মানুষের কাছে, তাদের ভাষায়, তাদের বোধের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার সঙ্কল্প থেকে 'নবান্ন' নাটকের সৃষ্টি। এই নাটকে সমকাল ও ক্রান্তিকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক অবস্থার একটি চিত্র পাওয়া যায়।

সামগ্রিক বিচারে কিছু অসঙ্গতি সত্ত্বেও 'নবান্ন' নাটককে দুর্গতি ও প্রতিরোধের নাটক হিসাবে গণ্য করা হয়। এ নাটকের মূলধারার আবর্তন ঘটেছে প্রধান সমাদ্দার-এর পরিবারকে কেন্দ্র করে। সেখানে প্রধান পুত্রদ্বয় শহীদ শ্রীপতি-ভূপতি, পত্নী পঞ্চাননী, বড় ভাইপো কুঞ্জ ও তার স্ত্রী রাধিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও বিনোদিনী ও তার স্বামী নিরঞ্জন অপেক্ষাকৃত গৌণ চরিত্র। অথচ এই দুটি চরিত্রই নাটকের দুষ্টের দমন—এই সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে—চোরাচালান, মেয়ে পাচারকারী হারাধন ও মজুতদার ও নারীদেহের ব্যবসাদার কালীধনকে ধরিয়ে দিয়ে সামাজিক ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করেছে। Suffering and Struggle-এর মধ্য দিয়ে মানুষের মুক্তির এটি যদি কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক বিধান হয় প্রধান-কুঞ্জ সেক্ষেত্রে অনেকটাই অতি সাধারণ দুর্বল চরিত্র মাত্র। যদিও এ নাটকে সমস্ত ধরনের প্রতিকূলতার তারা শিকার, তাদের জীবন যন্ত্রণাই সর্বাধিক প্রতিফলিত। কিন্তু এদের বাঁচবার আকাঙ্খাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। সম্ভবত এই শেষোক্ত কারণেই—শত হতাশার মধ্যেও বাঁচবার আকুলতা মানুষের জীবনে গভীরতর সত্য বলে বিষয়বস্তু অভিনয় নৈপুণ্য ও সংলাপ নাটকটিকে সেদিন জনপ্রিয় করে তুলেছিল। নবান্ন গণনাট্য হিসেবে সাফল্যের অধিকারী হয়েছে। কারণ নাটক দেশকালের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে গণচেতনার সঞ্চারে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নাটকের চতুর্দশ-পঞ্চদশ দৃশ্যে, পরিশেষে আমিনপুরের হিন্দু-মুসলমান চাষী জীবনের ক্ষয়ক্ষতি ভুলে সকলে মিলেমিশে ফসল একই খামারে তোলা, ঝাড়াই-এর পর তার একটি অংশ অনাগত ভবিষ্যৎ দুর্যোগ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ধর্মগোলায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা যেমন করেছে, তেমনি প্রথা অনুযায়ী মরা গঙ্গার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে নবান্ন উৎসবের আয়োজন করেছে।

নাটকের সামগ্রিক পর্যালোচনা শেষে স্মরণ করতে হয়, নাটকের গঠন বিন্যাস প্রসঙ্গটিও। নাটক সাধারণত পঞ্চসন্ধি সমন্বিত। একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক সাধারণত পাঁচটি অঙ্কে বিন্যস্ত। প্রথমে নাটকীয় ঘটনার প্রস্তাবনা বা সূচনা বা এক্সপোজিশন, দ্বিতীয়ে তার ক্রমবির্বতনের প্রথম ধাপ আরোহপর্ব বা রাইজিং অ্যাকশন, পরে নাটকের চূড়ান্ত সঙ্কট মুহূর্ত (crisis) বা ক্লাইম্যাক্স-এর পর একটি পরিণতির দিকে অবরোহ, অবনমন বা ফলিং অ্যাকশন এবংনাটকের পরিণতি পর্ব বা ক্যাটাসট্রফি/ডেনোমেন্ট—পূর্ণাঙ্গ বড় নাটক এই পাঁচটি স্তর অতিক্রম করে সমাপ্ত হয়। কিন্তু আধুনিক নাটক যুগ ও জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে বিষয় ও চরিত্র প্রাধান্য সূত্রে নাট্যাভিনয় ও নাটকের গঠন বার বার পরিবর্তিত হয়েছে। কাহিনী নির্ভর চরিত্র নাটক, নাটকের ভরকেন্দ্র পরিবর্তন করেছে। সেক্সপীয়রীয় নাটকে চরিত্র বিকাশের জন্য যে গঠন প্রয়োজন ছিল, গিরিশ-অর্ধেন্দু-দানীবাবু-অহীন্দ্র যুগে আবেগপ্রবণ চরিত্রাভিনয়ে যে দর্শককে আবেগতাড়িত করবার জন্য নাটকের বিস্তার প্রয়োজন ছিল, পরবতীকালে যুগযন্ত্রণাকে প্রকাশের জন্য দ্বন্দ্বসঙ্কুল মূহূর্ত ফুটিয়ে তুলতে সেই পরিসরের প্রয়োজন নেই, তাই পরবর্তীকালে ব্যক্তিগত আবেগসর্বস্ব চরিত্রাভিনয়ে ভাটা পড়ায় আধুনিক

নাটক ক্রমশ তিন অঙ্ক থেকে একাঙ্কে রূপান্তরিত হয়েছে। এ যুগের প্রধান চরিত্রগুলি ক্রমশ হয়ে উঠেছিল মনস্তত্ত্ব নির্ভর এবং সমস্ত নাটকে ঘটছিল মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য। ঠিক এরই পাশাপাশি আরও একটি ধারা যুক্ত হল চারের দশকে, গণনাট্যের সূচনাপর্ব থেকে। এ নাটকে ব্যক্তি নয়, ব্যষ্টি বা সমষ্টির প্রাধান্য। আর এই সমষ্টি ভাবনার জন্যই গণচেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে নাটক ব্যবহার করা হয়। গণনাটকে তাই ব্যক্তি ও সমষ্টির ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সমাজ মনস্তত্ত্বের যোগ দেখা যায়। গণনাটকে শোষকদের সঙ্গে শোষিতের সংঘাত হয়ে ওঠে অনিবার্য। এই সংঘাত থেকেই নাটকীয় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। নবান্নে বহু মানুষের সমর্থনে দাঁড়িয়ে নাট্যকার শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের, সংগ্রামের ছবি তুলে ধরেছেন।

উচ্চকণ্ঠ হয়ে এই বক্তব্য দীর্ঘ সময় জুড়ে বলা যায়না। তাই নাট্যকার পাঁচটি অঙ্কের পরিবর্তে চার অঙ্কে মোট পনের দৃশ্যে তাঁর বক্তব্য পরিবেশন করেছেন। অকুস্থল মেদিনীপুর, আমিনপুর একটি কল্পিত গ্রাম হলেও, সমকালীন বহু বিচিত্র ঘটনার প্রেক্ষাপটে এ নাটক রচিত। যেমন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন, মেদিনীপুরের সংগ্রামী ইতিহাস, মন্বন্তর-মহামারী, মড়ক—এরই মধ্যে কিছু মানুষের বাঁচার সংগ্রাম। দুঃখ, দুর্যোগের অবসানে, সকলে মিলে সব দুঃখ সয়েও, অনাগত ভবিষ্যতের সঙ্কট উত্তরণের জন্য ধর্মগোলার সঙ্কল্প নিয়ে।

দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে নাটকের মূল বিষয়বস্তুকে পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত করেছেন। নাটকের চরম মুহূর্ত বা ক্লাইম্যাক্স বলে যদি কোনো কিছু কল্পনা করা হয় তবে দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যটিকে ধরা যেতে পারে। দ্বিতীয় অঙ্কে গ্রামসমাজের অত্যাচার অনাচারের নায়কদের শাস্তির উপযুক্ত ব্যবস্থার পর তৃতীয় অঙ্কের সামান্য দুটি দৃশ্যে লঙ্গরখানা ও চিকিৎসাকেন্দ্রের অব্যবস্থার পরিচয় দিয়ে দ্রুত নাটকের উপসংহার টানা হয়েছে চতুর্থ অঙ্কে। নবান্নের কাহিনী বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্টত বোঝা যায়, এনাটক সরলরৈখিক ক্রিয়াকাণ্ডের নাটক নয়। এটি জটিল ঘটনার ঘনঘটায় পূর্ণ। এর প্রায় প্রতিদৃশ্যে আছে চমক। পনের দৃশ্যের মধ্যে আটটি দৃশ্যে আমিনপুরে, আর সাতটি শহরে সংঘটিত। গ্রাম-শহরের দৃশ্য সমাবেশ করে নাট্যকার ভারসাম্য রক্ষা করে স্তরে স্তরে নাট্যরস সঞ্চারিত করেছেন। প্রথম পর্বের অন্যতম নাটক পরিচালক ও অভিনেতা শম্ভু মিত্র। নবান্ন নাটকের মহাকাব্যিক (এপিক) ব্যাপ্তি এপিসোডিক ক্যারেকটার পরিচয় লক্ষ্য করেছেন। ফলত নাটকটি যে অভিনয়ে খুবই জমে উঠেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৮৭.১০ অনুশীলনী ২

১। নিচের সংলাপগুলি পড়ে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দিন :

(ক) প্রধান। চলো চলে যাই।

দয়াল। কোথায়?

প্রধান। কোন শহরে? অন্নকুট খুলেছে সেখানে সব বাবুরা।

—বক্তা কেনে পরিস্থিতিতে, কেন এবং কোথায় যাওয়ার কথা বলেছেন? 'অন্নকূট' শব্দটির বাচ্যার্থ

ও ব্যঞ্জনার্থ বুঝিয়ে দিন।

(খ) "চাল খায়। বড় চাল খাউন্যা! চাল খাইতে আইছে! দুর্ভিক্ষের পোকামাকড় যত সব।" —বক্তা কে? কোন প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে? মন্তব্যটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

(গ) "আমার অন্তর জ্বলে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অন্তর—" —বক্তা কে? কুঞ্জকে একথা বলার কারণ কী?

(ঘ) "আমিনপুরের কলঙ্ক তোরা সব, তাই পেছু হটছিস।"—বক্তা কে? কাদের বলেছেন? আমিনপুরের কলঙ্ক বলবার কারণ কী? বক্তার চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। "নবান্ন' নাটকের গঠনগত বিশিষ্টতার পরিচয় দিন।

৩। 'নবান্ন একই সঙ্গে দুর্গতি ও প্রতিরোধের নাটক।'—মন্তব্যটির সারবত্তা স্থির করুন।

৪। বিষয়বস্তু, উপস্থাপক ও চরিত্র পরিকল্পনায় 'নবান্ন' অভিনবত্ব দাবি করতে পারে।— মন্তব্যটি কতদূর যথার্থ আলোচনা করুন।

৫। 'নবান্ন' সমকালীন সমাজ ও নাট্য আন্দোলনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করলেও, শিল্পসৃষ্টি হিসেবে দুর্বল। — এ সম্পর্কে আপনার অভিমত যুক্তিসহ প্রতিষ্ঠিত করুন।

৮৭.১১ মূলপাঠ ৫ ঃ 'নবান্ন' নাটকের চরিত্র আলোচনা

একটি নাটকের জন্য কাহিনী, সংলাপের সঙ্গে চরিত্রের বিশেষ প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যাবে না। নাটকে চরিত্র একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বর্তমানে নাটকে চরিত্র সংখ্যা খুবই সীমিত। একটি বা দুটি চরিত্র দিয়ে একটি নাটকের সাবলীল গঠনকার্য সমাধা হতে পারে।

বাংলা অপেশাদার গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম মঞ্চসফল নাটক 'নবান্ন' কিন্তু এদিক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'নবান্ন' নাটকে ছোট বড় চরিত্র মিলে প্রায় পঁয়তাল্লিশটা চরিত্র। আমরা এখানে 'নবান্ন' নাটকের প্রথম অভিনয়ের চরিত্রলিপিটা তুলে দিলাম :

প্রধান সমাদ্দার	আমিনপুরের বৃদ্ধচাষী	বিজন ভট্টাচার্য
কুঞ্জ সমাদ্দার	প্রধানের ভাইপো	সুধী প্রধান
নিরঞ্জন সমাদ্দার	কুঞ্জের সহোদর	জলধর চট্টোপাধ্যায়
মাখন	কুঞ্জর ছেলে	মণিকা ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী)
দয়াল মণ্ডল	প্রতিবেশী	শম্ভু মিত্র
হারু দত্ত	স্থানীয় পোদ্দার	গঙ্গাপদ বসু
কালীধন ধাড়া	চাল ব্যবসায়ী	চারুপ্রকাশ ঘোষ
রাজীব	কালীধনের সরকার	সজল রায়চৌধুরী
চন্দর	জনৈক চাষী	রঞ্জিত বসু
যুধিষ্ঠির	আন্দোলনকারী	নীহার দাশগুপ্ত

ফটোগ্রাফারদ্বয়	সংবাদপত্রের প্রতিনিধি	অমল ভট্টাঃ, রবীন মজুমদার
প্রথম ভদ্রলোক	চাল খরিদ্দার	মনোরঞ্জন বড়াল
বরকর্তা	বড়কর্তা	চিত্ত হোড়
বৃদ্ধ ভিখারি	—	গোপাল হালদার
ডোম	—	শম্ভু হালদার
দারোগা	—	বিমলেন্দু ঘোষ
ডাক্তার	—	সমর রায়চৌধুরী
দিগম্বর	—	অজিত মিত্র
ফকির	—	সত্যজীবন ভট্টাচার্য
পঞ্চাননী	প্রধানের স্ত্রী	মণিকুন্তলা সেন
রাধিকা	কুঞ্জর স্ত্রী	শোভা সেন
বিনোদিনী	নিরঞ্জনের স্ত্রী	তৃপ্তি ভাদুড়ী (মিত্র)
খুকির মা	হারু দত্তের মা	
ভিখারিণী	—	বিভা সেন
বাংলার ম্যাডোনা	—	ললিতা বিশ্বাস

ভদ্রলোক, নির্মলবাবু, টাউট, ভিখারী, হারু দত্তের শালা, কনেস্টবল, রোগী, ভৃত্য, চন্দরের মেয়ে, বরকত, কৃষক, নিরন্নের দল, জনতা ইত্যাদি।

চরিত্রলিপি থেকে বোঝা যাচ্ছে 'নবান্ন' নাটকের চরিত্র সংখ্যা অনেক। এতো চরিত্র সংখ্যার পিছনের কারণটা অবশ্য এই নাটকের বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা। বিষয় বৈচিত্র্য, সময়দীর্ঘতা এবং প্রেক্ষাপটের বিস্তীর্ণতা প্রভৃতি হেতু নবান্ন নাটকের চরিত্রলিপিও বিরাট হয়ে গেছে। একই সঙ্গে আগস্ট আন্দোলন, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, এবং বিশ্বযুদ্ধের পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে হয়েছে নাটকে। গ্রাম ও শহরের চিত্র, সমাজব্যবস্থার চরম দুরবস্থা, নৈতিক অধঃপতন, অর্থনৈতিক সংকট ইত্যাদি তুলে ধরে একটা প্রতিরোধমূলক মুহূর্ত সৃষ্টি করতে গেলে যেমন নাটককে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে বিছিয়ে দিতে হয়, সেইরকম সর্বস্তরের সুচারু নাট্য রূপায়ণ করতে গেলে চরিত্র সংখ্যাবৃদ্ধির অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করা যাবে না। বর্তমানে, নাটকে জাঁকজমকপূর্ণ বিরাট ও ব্যপকত্বের পরিবর্তে ছোট ছোট ছবি তুলে ধরবার প্রয়াসটা লক্ষিত হয় বেশি।

'নবান্ন' নাটকে বড় চরিত্রগুলো ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে দেওয়া গেল। প্রধান সমাদ্দার, কুঞ্জ সমাদ্দার, নিরঞ্জন সমাদ্দার, দয়াল মণ্ডল, হারু দত্ত, কালীধন ধাড়া, রাজীব। স্ত্রী চরিত্রগুলি যথাক্রমে রাধিকা, বিনোদিনী, পঞ্চাননী। একটিমাত্র শিশু চরিত্র মাখন। নাটকে এদেরই ভূমিকাংশ বেশি। এরাই নাটকের প্রধান চালিকাশক্তি। এদেরই অভিনয় নৈপুণ্যের দৌলতে নাটক দ্রুত গতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। আলোচ্য প্রতিটি চরিত্রের অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শনের ক্ষেত্র নাটকে সুবিস্তৃত। প্রধান সমাদ্দার, কুঞ্জ ও নিরঞ্জন সমাদ্দার, রাধিকা, বিনোদিনী, পঞ্চাননী এবং মাখন এক পরিবারভুক্ত। দয়াল প্রতিবেশী, হারু দত্ত, কালীধন চোরাকারবারী ও

চোরাচালানদার। রাজীব কালীধনের সরকার। মূলত এই চরিত্রগুলোকে বিকশিত করবার জন্য, প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য, পরিণতি প্রদর্শনের জন্য নাটকের অপরাপর চরিত্রগুলো রূপায়িত হয়েছে।

নাটকে সাধারণত তিন ধাঁচের চরিত্র দেখা যায়। ফ্লাট চরিত্র, রাউণ্ড চরিত্র, টাইপ চরিত্র। ফ্লাট চরিত্র বড় কিন্তু আগাগোড়া একঢালা। একই রকমভাবে চলতে থাকে। অন্তর জগতের উত্থান-পতন, ভাঙাগড়া, দ্বন্দ্ব-সংঘাত—ইত্যাদির গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত আকুলতা ব্যাকুলতার টানাপোড়েনের রেখচিত্র অঙ্কিত না করে সরলরৈখিক ভাবে চলতে থাকে। এ ধরনের চরিত্র প্রধান সমাদ্দার। রাউণ্ড দ্বন্দ্ব-সংঘাতময়। অর্ন্তদ্বন্দ্বে এবং বহির্দ্বন্দ্বে বিশেষভাবে আন্দোলিত। নাটকে সাধারণত নায়ক চরিত্র এই শ্রেণীতে পড়ে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয় এই ধরনের চরিত্র। নবান্ন নাটকে কুঞ্জ এই রাউণ্ড চরিত্রের মধ্যে পড়ে।

প্রধান সমাদ্দার নাটকের প্রথম দৃশ্যেই দর্শকের সামনে যখন উপস্থিত হয় তখনই তার বার্ধক্য অবস্থা। কিন্তু সেই বয়সেই তার ভেতরে একটা আগ্নিস্ফুলিঙ্গ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তার দুটি পুত্র ছিল, শ্রীপতি ভূপতি। বৃদ্ধা স্ত্রী পঞ্চাননীর পুত্র এই দুটি মৃত। মৃত পুত্রের শোক বুকে নিয়ে প্রধান সমাদ্দার হত্যা ও সন্ত্রাসবাজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। সে দুর্দান্ত আবেগে ভরপুর। এরই মাঝে সে অঙ্কন করেছে অনাগত দিনের রক্তিম চিত্র। কিন্তু সব মিলিয়ে কেমন যেন এক উদ্‌ভ্রান্তি তার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে। ভ্রাতুষ্পুত্র কুঞ্জর চোখে সেটা এড়িয়ে যায়নি। অসংলগ্ন কথাবার্তা, অপ্রকৃতিস্থ মস্তিষ্কের অসংযত পরিকল্পনা কখনো কখনো প্রাণ দেওয়ার পাগলামো ব্যাকুল কথাবার্তায় কুঞ্জ ঠিকই ধরেছে 'শেষ পর্যন্ত পাগলই হয়ে গেল দুটো ছেলের শোকে।' পুত্রদুটিকে হারিয়ে বৃদ্ধ প্রধান সমাদ্দার পঞ্চাননীকে সম্বল করে বাকি জীবনটা কাটাতে পারত, কিন্তু সর্বব্যাপক আন্দোলন ও তাকে দমন করবার জন্য সর্বনাশা অত্যাচার ও নির্যাতনে প্রতিরোধ বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তার মৃত্যু হওয়াতে সে সম্বলটুকু চলে গেল। সর্বনাশা ঘাত-প্রতিঘাত কেড়ে নিল দুই পুত্র। তিন মরাই ধান নষ্ট হয়ে গেল। পঞ্চাননী প্রাণ দিল। এরই মধ্যে ভ্রাতুষ্পুত্রের সংসার এবং নাতি মাখনকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিল যেটুকু জমি জায়গা আছে তার ওপর ভর করে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর এবং সর্বনাশা বন্যা এসে স্বপ্নের শেষাংশটুকু কেড়ে নিয়ে গেল। তারপর এলো চোরাচালানদার হারু দত্তের আক্রমণ। অপদস্থ হল গ্রামের মাতব্বর গোছের প্রধান সমাদ্দার। এরই ভেতর ঘটল মাখনের মৃত্যু। ছাড়তে হল গ্রাম। শহরের পার্ক ও ফুটপাতকে আশ্রয় করে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হল তাকে। একের পর এক এবম্বিধ দুর্ঘটনায় প্রধান সমাদ্দার মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল।

গ্রামের এই সরল সাদাসিধে মানুষটি যার অভ্যন্তরে এক প্রতিরোধপরায়ণ প্রতিস্পর্ধী সাহসিকতার অপর্যাপ্ত সঞ্চয় ছিল,যা তার মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে উত্তপ্ত লাভা স্রোতের মতো বেরিয়ে এসেছে, 'চল্‌তো গাও বরাবর এগিয়ে গিয়ে বেড় দিয়ে ফেলি গে ওদের, ডাক সব ওদের কুঞ্জ।' কিন্তু তারপর থেকে চরিত্রটা কেমন এক অহেতুক অসহায়তার কবলে আত্মসমর্পণ করে শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব প্রকাশের পরিবর্তে অসংযত পাগলামোর খাপছাড়া বিগ্রহে পরিণত হল। এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে প্রথম অঙ্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চম দৃশ্যে। হারু দত্তের লোকজন যখন কুঞ্জকে লাঠিপেটা করছে তখন প্রধানের বুকের ভেতর স্তূপীকৃত

বারুদের বিস্ফোরণ ঘটবার পরিবর্তে আত্মরক্ষার অসহায়তা ফুটে উঠেছে, 'মেরে ফেলোনি বাবা ওরে। বাবা, মেরে ফেলোনি। মেরে ফেলোনি।' প্রথম দৃশ্যের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় দর্পিত বীরত্বের একটুখানিও যদি দেখা যেত তাহলেও চরিত্রটা সঙ্গতিসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারতো। আর তার পরের পরিবর্তনটাকে আমরা এইভাবে মেনে নিতে পারতাম যে বিপর্যয়ের আতিশয্যবশত চরিত্রটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু প্রথম অঙ্কের বিভিন্ন দৃশ্যে তার চরিত্রে কখনো কখনো দেখা গেছে তীব্র সচেতনতা, 'কী কী বললি তুই কুঞ্জ! ছলনা! নাকী কান্না! আমার সহানুভুতি মিথ্যে তোর কাছে? অপমান করলি তুই আমারে! আমারে অপমান করলি তুই! তুই আমারে অপমান করলি —'[১ম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য] কিংবা, 'ছোট ভুলের ক্ষমা আছে, বুঝলে দয়াল! কিন্তু বড়ে ভুলের আর চারা নেই। করতেই হবে তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত।' অথবা, 'ভদ্দরনোকের নামে মুখ করছ, কিন্তু এই ভদ্দরনোক ছাড়া আবার গতিও নেই আমাদের এখন। শত হোক, সেই ঘুরে ফিরে যেতেই হবে তোমার ভদ্দরনোকের দোরে। উপায় নেই।'[১ম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য] সংলাপগুলো চরিত্রটার সচেতনতার দিকটি তুলে ধরে, গভীরতর উপলব্ধির তলদেশ থেকে উঠে এসেছে বলে বোধ হতে পারে, কিন্তু তাৎক্ষণিক। পরের পর্বেই দেখা গেছে চরিত্রটি গতিপথ পরিবর্তন করেছে। আর গ্রাম থেকে শহরে এসে পড়বার পর চরিত্রটি হয়ে পড়েছে অতিরিক্ত নিষ্ক্রিয়। পাগলামির ভাব বজায় আছে বটে এবং কখনো কখনো পাগলামো অবস্থায় কিছু কিছু প্রতীকধর্মী সংলাপ উচ্চারণ করে দর্শক মনে দাগ টানবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করেছে ঠিক, কিন্তু মনের জগতে যে তীব্র দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রতিচ্ছবি সরীসৃপের মতো এঁকেবেঁকে উঠে এসে বাহ্যিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটা তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে চরিত্রটি যাতে রাউন্ড হয়ে ওঠে, তার এমন কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ফলে চরিত্রটি এক ঢালা হয়ে অসংযত চিন্তা ভাবনার খাপছাড়া বিগ্রহে পরিণত হয়েছে। কোনো ভাবেই কখনোই গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি। অথচ চরিত্রটার প্রতি যত্নের কোনো ত্রুটি ছিলনা। কিন্তু এই যত্ন সম্ভবত একটিমাত্র কলমের নয়। নাটকটি লিখিত হওয়ার পর, মনে হয়, সম্পাদনার সময় বহুজনের সযত্ন হস্তক্ষেপের ফলে এমনটি ঘটেছে, যা নাটকের মধ্যে খুব খানিকটা দুর্নিরীক্ষ নয়। বহু যত্নে সন্তানের যে অবস্থা হয় প্রধান সমাদ্দারের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। তাই চরিত্রটি ধাপে ধাপে বিকশিত হয়ে পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি, টুকরো টুকরো মনে সযত্ন প্রয়াসের ফল হিসাবে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও গভীর হয়ে উঠতে পারেনি। ঠিক যেন শান্ত নদীর বুকে মৃদুমন্দ বাতাসের আন্দোলনে অল্প অল্প তরঙ্গের উত্থান-পতনের মতো হয়ে চরিত্রটা অতর্কিত ভাবে পরিণতির পর্বে এসে পৌঁছেছে। প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝায় সমুদ্র গর্ভে যে ভয়াল ভয়ঙ্কর উত্তালতা সৃষ্টি করে মনের ওপর গভীর ও গাঢ় দাস টানে তেমন ভাবে চরিত্রটা গড়ে ওঠেনি। অথচ নাটকের বিষয়টা ছিল ঝড়-ঝঞ্ঝা-বিক্ষোভের ঘনঘটায় পরিপূর্ণ।

অপরপক্ষে, কুঞ্জ চরিত্রটা কিঞ্চিৎ পরিমাণে জীবনের উষ্ম আবর্তের ওপর দিয়ে বিশ্বাসযোগ্য পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছে। তার সংবহনতন্ত্রী তারুণ্যের তাজা রক্ত সুষম বন্টনের ফলে মস্তিষ্কের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার যথাযথ ভারসাম্য বজায় থেকেছে। সে বুঝতে পারছে মারমুখী সন্ত্রাসবাজদের সামনে এগিয়ে যাওয়া মানে হঠকারিতা, তাই অত্যন্ত ধীর মস্তিষ্কে প্রধানের প্রৌঢ় মনের দপ করে উদীপ্ত হয়ে ওঠাকে দমন করেছে, 'তা খামখা জান দিয়ে কি কোনো লাভ আছে? চলো, চলো! ঐ বনের ভেতরই পালাই।'[১ম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য] যদিও প্রধান

এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছে, 'আমি তাই বলি কুঞ্জ এগিয়ে চল, এগিয়ে চল্, বেড় দিয়ে ফেলি গে ওদের; তা কুঞ্জ শোনো না, কুঞ্জ শুধু পালায়, কুঞ্জ শুধু—'[১ম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য] এই বক্তব্য কুঞ্জর পলায়নবাদিতার দৃষ্টান্ত হতে পারে, কিন্তু কুঞ্জ সম্পর্কে এই কথাই যথেষ্ট নয়। হারু দত্ত প্রধানকে জমি বিক্রি করতে বাধ্য করার সময় কুঞ্জ তীব্র প্রতিবাদ বাক্য উচ্চারণ করে তার বীরত্বের প্রমাণ রেখেছে,.....'জমি যার সে বলছে বিক্রি করব না; আর উনি শুধু বলছেন কথার খেলাপ করেছে। ভারি আমার কথা রাখনেওয়ালা রে।' প্রধান চুপ করতে বলায় সে দপ করে জ্বলে উঠেছে, 'কেন, কিসের জন্য। গলা দিয়ে এইবার এট্টা রা কাড়ো বুঝলে, চেঁচাও,—অন্তত আর পাঁচজন মানুষ জানুক।' হারু দত্ত ছোটলোক বলে গালাগালি দেওয়ায় কুঞ্জ মাথা ঠিক রেখে প্রতিবাদ জানিয়েছে, 'এই গালাগালি দিয়ো না বলছি, ভালো হবে না।' 'এই মুখ সামলে কথা বলো কিন্তুক।' কিন্তু হারু দত্ত যখন উত্তেজিত ভাবে প্রধানকে খচ্চর বলে গাল দিয়েছে, তখন কুঞ্জ নিজেকে সামলে রাখতে পারেনি, দপ্ করে জ্বলে উঠেছে সে, 'হেত্তেরি শালা নিকুচি করেছে তোর ঝামেলার—' বেগে প্রস্থান করে লাঠি হাতে প্রবেশ করেছে সে। হারু দত্তের লোকজনের সঙ্গে লড়াই করেছে সে জমি এবং মান ইজ্জৎ রাখতে। কুঞ্জ চরিত্রের এটাই প্রথম মাত্রা। কুঞ্জ ভীরু নয়, পলায়নী মনোভাবকে আশ্রয় করেনি, সাহসিকতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কুঞ্জ দুর্দান্ত শক্তিসম্পন্ন।

কুঞ্জ চরিত্রের দ্বিতীয় মাত্রা, কোনো ওপরওয়ালা নয়, ভাগ্য কিংবা ভগবান নয়, আত্মশক্তির ওপর নির্ভরশীলতা। কুঞ্জ কৃষক জীবন মন্থন করে যে সত্য তুলে এনেছে, তা হল—'জানি জানি, ওপরের দিকে হাত দ্যাখাবে তা জানি। তা সে বিশ্বাস ভেঙে গেছে; ওতে আর ভয় করি নে।' [১ম অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য] কুঞ্জ এই সত্যের শীর্ষবিন্দুতে একদিনেই আরোহণ করেনি। অতি বাস্তব ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থেকে অর্জন করেছে এই অভিজ্ঞতা। সে দেখেছে, মনুষ্যসৃষ্ট সন্ত্রাস মানুষের প্রাণ নিয়েছে, পুড়িয়ে দিয়েছে মানুষের ঘরবাড়ি। অতি বাস্তব বন্যা গরিব মানুষের আশ্রয় এবং অন্ন কেড়ে নিয়ে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কবলে ঠেলে দিয়েছে মানুষকে। অপরপক্ষে যারা নিরন্ন মানুষের মুখের খাবার আর অসহায় নারীর মান ইজ্জতের মূল্য না দিয়ে বেচাকেনার খোলা বাজার বসিয়েছে ঈশ্বর কেবলমাত্র তাদের প্রতি সদয় এটা একটা লোকঠকানো ধুর্তুমি। তাই অত্যাচারী যখন সেই কথা স্মরণ করিয়ে শোষণকে অব্যাহত রাখতে চায় তখন দৃপ্ত প্রতিবাদের অগ্নি দপ করে জ্বলে ওঠে তার চোখে মুখে। বলে, 'তা সে বিশ্বাস ভেঙে গেছে; ওতে আর ভয় করি নে।' [১ম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য] সুতরাং ওপরওয়ালা, ভাগ্য বা ভগবান নয়, মানুষের অত্যাচারী ভূমিকা এবং সেই মানুষের ভেতরই রয়েছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। অযুত সম্ভাবনা, নিযুত সাহসিকতা।

কুঞ্জ গার্হস্থ জীবনযাত্রার এক জীবন্ত প্রতিনিধি। প্রধানের পর সমাদ্দার পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান সে। সেই সুবাদে সে এই পরিবারের যুবরাজ। স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভ্রাতৃবধূ ও জ্যেষ্ঠতাত—এই নিয়ে তার চাষাড়ে সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের মূলধন জমি, কিন্তু অভাবের একচ্ছত্র আধিপত্যের কাছে সামান্য জমি এতগুলো মানুষের জীবনযাত্রাকে সরলরৈখিক পথে টেনে নিয়ে যেতে পারেনা। তাই অনিবার্যভাবে তার ঘর গৃহস্থালীতে এসে পড়ে ছোটখাট ঝগড়া-বিবাদ। রচিত হয় মতানৈক্যের রোজনামচা। 'সোজা কথায় বললেই হয় যে, না, ফুরিয়ে গেছে সেই ধান। তা না মেয়েমানুষের চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনলে আমার পায়ের তলা থেকে মাথার চাঁদি পর্যন্ত একেবারে রি রি করে জ্বলে ওঠে।' [১ম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য] নিজের স্ত্রীর প্রতি

এধরনের মন্তব্য করতে এই চাষাড়ে যুবরাজের এতটুকু দ্বিধা হয় না বটে কিন্তু ভাই নিরঞ্জনের গঞ্জনায় যখন ভ্রাতৃবধূ বিনোদিনীর চোখে জল ঝরতে দেখে তখন মাথা ঠিক রাখতে পারে না, ফের মেরেছিস বুঝি?.....বলি ফের আবার তুই গায়ে হাত তুলিছিস পরের মেয়ের? পশু বলে গালাগাল দিয়ে একখানা কাঠ দিয়ে মাথায় আঘাত করে চেঁচিয়ে ওঠে, 'মেয়ে মানুষের গায়ে হাত.....বেরো বেরো তুই, বেরো।' কিন্তু তারপর ভাই-এর রক্ত দেখে সম্বিত ফিরে পেয়ে আত্মগ্লানিতে ভরে যায় তার মন।'খুন করে ফেললাম! খুন করে ফেললাম আমি নিরঞ্জনরে! নিরঞ্জন! নিরঞ্জন!!' (১/২) কুঞ্জর যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ের হাহাকারটা নাট্যমঞ্চ প্রবল প্রতিক্রিয়া সঙ্গে দর্শন করলে আমাদের মনে মর্মস্পর্শী আবেদন সৃষ্টি না করে পারেনা। সুতরাং গৃহকর্তা হিসাবে অভাবের আতিশয্যে যেমন সে নিজের সহধর্মিণীর সঙ্গে অন্যায় ঝগড়া বিবাদে মত্ত হয়, তেমনই পরিবারের অন্যদের দয়ামায়া স্নেহমমতার গাঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে রাখতে চায়। এই যে প্রীতিপূর্ণ বন্ধনস্পৃহা—এটি কুঞ্জ চরিত্রের তৃতীয় মাত্রা।

কুঞ্জ শুধু নিজের সংসারটাকে ঝড়ঝাপটার মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার দায়ে আবদ্ধ নয়। প্রতিবেশী সম্পর্কেও তার অন্তরে একটা দুর্বল জায়গা আছে। কুঞ্জ বাইরে কঠিন, বাহ্যিক আচরণও খুব খানিকটা রুঢ়। কিন্তু রুঢ় কাঠিন্যের অভ্যন্তরে একটা নরম তুলতুলে জায়গা আছে, যেখানটা ঠিকমতো ঘা লাগাতে পারলে দরদর করে নিঃসৃত হবে অজস্র দয়ার নির্যাস। নিজের অভুক্ত পরিবারের জন্যে ঘটিবাটি বিক্রি করে যে ক'মুঠো চাল কিনে এনেছে তার দাবিদার পরিবারস্থ পাঁচজন ব্যক্তি। প্রধান সমাদ্দার সে কথা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেও ফেলে, 'শেষ সম্বল দু'খানা পেতলের কাঁসি আর ঘটিবাটি বেচে সের দুয়েক চাল নিয়ে এয়েছে কুঞ্জ; পাঁচজনের সংসার, বলো তো কার মুখে দিই এই চাল ক'টা?' (১/৩)কুঞ্জও কতকটা প্রধানের কথার প্রতিধ্বনি করে, 'রাঙার মা ধুঁকছে কাল বিকেলবেলা থেকে, অমুকের মা ধুঁকছে কাল দুপুরবেলা থেকে, তমুকের মা ধুঁকছে আজ সকালবেলা থেকে, এই তো এখন শুনতে হবে। (১/৩) মুখে উচ্চারণ করলেও কুঞ্জর অন্তরের কথা তা নয়। তাই দয়ালের একমুঠো চালের আবেদন অগ্রাহ্য করতে পারেনা সে। শেষ সম্বলের থেকে কিছুটা চাল দয়ালকে দিয়ে নিজে খুব খানিকটা তৃপ্তি পায়। এই প্রতিবেশী প্রীতি কুঞ্জ চরিত্রের চতুর্থ মাত্রা।

কুঞ্জ গ্রাম্য এক কৃষক সন্তান। রাগ দ্বেষ বিবাদ বিসম্বাদের পাশাপাশি পরিবার এবং প্রতিবেশীর প্রতি প্রীতি এই কৃষক সন্তানের সব কথা নয়। সময়ের ঘূর্ণাবর্তে বিঘূর্ণিত হতে হতে সময়ের গতিপ্রকৃতি কোন আবর্ত রচনা করতে পারে সে সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। গ্রাম্য জীবনে যে অনতিবিলম্বে নেমে আসবে এক হাহাকার তা তার দূরদর্শিতায় ধরা পড়ে। তাই সে অন্য সকলের মতো বিচলিত না হয়ে খুব সহজেই উচ্চারণ করে, 'বলা-কওয়ার তো আর এখন কিছু নেই। আর পাঁচজনের যে অবস্থা হয়েছে, আমাদেরও সেই অবস্থা হবে। দশজনের মতো আমাদেরও ঐ রাস্তায় নেমে দাঁড়াতে হবে।'(১/৩)

কুঞ্জের এই ভবিষ্যদ্বাণী কোন অদৃষ্টদ্রষ্টা সাধুসন্তর ভবিষ্যদ্বাণী নয়, ঘটনার স্রোতে ভাসন্ত এক বাস্তববাদী মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। এই সত্য যে কতখানি নির্মম, নিষ্ঠুর তার পরিচয় দ্বিতীয় অঙ্কে পাওয়া যায়। অসংখ্য মানুষের সঙ্গে তারা গ্রামের মাটির কোল থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে শহরের পার্কে, ফুটপাতে নিক্ষিপ্ত হয়ে ভিখারী জীবনে সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য হয়। (দ্রষ্টব্য ২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য) এক গ্রাম্য অশিক্ষিত কৃষক সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সময়ের গতি প্রকৃতি জীবনের ওপর যে অনিবার্য বিপর্যয় টেনে আনতে পারে সে সম্পর্কে

দুরদর্শিতার ক্ষমতা কুঞ্জ চরিত্রের পঞ্চম মাত্রা।

গ্রাম্য পটভূমিকায় কুঞ্জের ছোটখাটো একটা মর্যাদার আসন ছিল। পাড়াপড়শীরা সে আসনটা কেড়ে নেয়নি। কুঞ্জও সে আসনের যথাযোগ্য মূল্য দেওয়ার চেষ্টা করেছে। আবার নিজের পরিবারস্থ সভ্যগণের প্রতি তার আন্তরিক স্নেহমমতা ভালবাসার ঘাটতি ছিল না। একের পর এক বিপর্যয় প্রধানকে উন্মাদগ্রস্ত করে তুলেছে, সংসারে জ্যেষ্ঠ সভ্য হওয়া সত্ত্বেও মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে যথাযোগ্য কর্তব্যকর্মে অনেকক্ষেত্রে ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটেছে, দুটি পুত্রকে হারিয়ে শোকের পৌনঃপুনিক বিলাপের শোককে গভীর হতে দেয়নি। কিন্তু কুঞ্জ একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে সংযত বিলাপে শোককে গভীরে নিয়ে গেছে। মতিভ্রান্ত হয়ে পুরো পরিবার—যারা তাকে আঁকড়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছে, তাদের প্রতি উদাসীন হয়ে ওঠেনি। কেন না, পুত্রশোকটা তার কাছে তত বড় হয়ে ওঠেনি, যত বড় করে দেখেছে সে গোটা কৃষক সমাজের বিপর্যয়কে।

কিন্তু তবুও সকলকে ধরে রাখতে পারেনি সে। প্রথম হারিয়েছে নিরঞ্জনকে। সে দেশান্তরী হয়েছে, দারিদ্র ও ক্ষুধার তাড়নায় ঝালা-পালা হয়ে। পরে পুত্র মাখনকে অতর্কিত মৃত্যু এসে ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে গেছে। তারপর প্রাণের প্রিয় আমিনপুর, তারপর ভ্রাতৃবধু বিনোদিনী। কিন্তু তবুও অবিচলিতভাবে ভিখারী জীবনের হাত ধরে নিদারুণ দুঃসময়ের আঘাতকে সহ্য করবার শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চেয়েছে সে। বৃদ্ধ প্রধানকে সঙ্গে নিয়ে কুকুরের সঙ্গে সহাবস্থান করেছে। কুকুরের সঙ্গে লড়াই করে টুকরো খানেক খাবার অন্বেষণ করেছে ডাস্টবিনের মলয়া ঘেঁটে। পশুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গেছে পশুর কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। (দ্রষ্টব্য :২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য) কিন্তু তবু জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগেনি। দুর্দান্ত জীবন সংগ্রামে ক্লান্ত হয়নি। অবসাদগ্রস্ত হয়ে পিছু হটেনি। বরং জীবনকে আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরেছে গভীর মমতায়। স্ত্রীর প্রতি তার সেই মমতা অজস্রধারে ঝড়ে পড়েছে। গভীর প্রেমে, 'কুঞ্জ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রাধিকার দিকে; তারপর বাঁ হাতখানা তুলে দেয় রাধিকার মাথার ওপর।' ফুটপাতের ওপর তৈরি করে ফেলে বড় প্রেমের এক বিরল অথচ সকরুণ মুহূর্ত।

এই স্নেহমমতা প্রেমপ্রীতি আর ভালবাসা কুঞ্জ চরিত্রের সবচেয়ে বড় সম্বল। ঝড়-ঝঞ্ঝা দৈব-দুর্বিপাকেও সে বিনষ্ট হতে দেয়নি এগুলিকে। রক্তাক্ত হয়েছে। ক্ষতবিক্ষত হয়েছে; লাঞ্ছনা, অবমাননা আর নিপীড়নে জর্জরিত হয়েছে, কিন্তু ভেঙে পড়েনি, দুমড়ে মুচড়ে দলা পাকিয়ে যায়নি। আজন্ম কালের বাস্তুভিটা আমিনপুরের স্মৃতি একটুও মলিন হয়ে যায়নি। স্মৃতির টানে তাই সে আমিনপুরে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুলতা বোধ করে, 'হেঃ, কী যে আনন্দ হয় বউ আমার, সে আমি তোরে—চল্ বউ আমরা গাঁয়ে ফিরে যাই। এ পোড়া মাটির দেশে আর থাকব না।' (৩/১) আমিনপুর-প্রীতিই তার প্রত্যাবর্তনের পথ প্রশস্ত করে।

সর্বশেষে বলা যায় কুঞ্জ চরম আশাবাদী। বড় বড় দুর্ঘটনা তাকে নৈরাশ্যের পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত করেনি। সব হারিয়েছে বটে তবে হা হুতাশের মধ্যে ফুরিয়ে যাওয়ার মানসিকতা পোষণ করেনি। বরং সর্বহারা হয়েও অন্তরের অন্তস্থলে জ্বালিয়ে রেখেছে আশার অনির্বাণ দীপশিখা। তাই, রাধিকা যখন বলে, 'গাঁয়ে ফিরে যাবে, সে তো আমার সৌভাগ্যির কথা। কিন্তু কোথায় যাব?.....সেখানকার মাটিও তো পুড়ে গেছে আমার ভাগ্যে—যদি আমার মাখন থাকত—'(৩/১) কুঞ্জ তখন হতাশ রাধিকার সামনে হাজির করেছে একবুক আশা, 'আশা হবে বউ, সব হবে। দুঃখ করিস নে।' কুঞ্জর এই আশা হতাশের প্রতি স্তোকবাক্য নয়।

এক বাস্তব বোধসম্পন্ন দূরদর্শী মানুষের আত্মবিশ্বাস। এই বিশ্বাসের ওপর ভর করে কুঞ্জ গ্রামে ফেরে এবং ফিরে পায় তার পুরো সংসার। তাই কুঞ্জ সম্পর্কে বলা যায়, সঠিক অর্থে যদিও কুঞ্জ ট্রাজিক চরিত্র নয়, আর নবান্ন নাটকও ডোমেস্টিক নাটক নয়, তথাপি সে রাউন্ড চরিত্রের অধিকারী মানতেই হবে।

'নবান্ন' নাটকে নিরঞ্জন চরিত্রটিও একটু গুরুত্ব দাবী করে। যদিও চরিত্রটির গতিপ্রকৃতি তেমন লক্ষণীয় নয়। সংসারের অভাবে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে দুঃখ ভোগের দার্ঢ্য তার ছিলনা। দুঃখের আতিশয্যকে সহ্য করতে না পেরে সে পালিয়ে গিয়ে উপার্জনের স্বতন্ত্র রাস্তা ধরতে চেয়েছে এবং ধরেছে। কিন্তু পুরো গ্রামটার সঙ্গে তাদের সংসার তরণীটি তখন হাবুডুবু খাচ্ছিল, তখন স্বতন্ত্র জায়গায় ঝঞ্ঝার থেকে পিঠ ফিরিয়ে দিন কাটাচ্ছিল সে। তথাপি দুটি কারণে চরিত্রটিকে অল্পাধিক গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, সে গ্রামের চোরাচালানকারী হারু দত্ত এবং দুশ্চরিত্র কালোবাজারী কালীধন ধাড়াকে বামাল সমেত ধরিয়ে দেওয়ায় দুঃসাহস দেখিয়েছে। দ্বিতীয়ত, গ্রামে ফিরে গিয়ে ভাঙা সংসারকে গড়ে তুলেছে, যে সংসারের আওতায় কুঞ্জ রাধিকা ফিরে গিয়ে পুনরায় পল্লী জীবনের সুন্দর সুনিবিড় ছায়ায় আত্মস্থ এবং আশ্বস্ত হয়েছে। প্রধান সমাদ্দার ফিরে পেয়েছে তার বিপন্ন চৈতন্য। সে স্বস্ত অনুভব করেছে মারি মন্বন্তরের বিরুদ্ধে জোড় প্রতিরোধের সুদৃঢ় আশ্বাসে।

দয়াল চরিত্রটি পূর্বাপর পরম্পর্য সম্পন্ন ক্রমবিকাশমান চরিত্র নয়। তাৎক্ষনিক চমকসৃষ্টির এক বিশেষ প্রক্রিয়া প্রদর্শনের ইচ্ছার দ্বারা চালিত সে। গূঢ় কোন ব্যঞ্জনা কিংবা দুঃখ আর দুঃখ জয়ের কোনো বলিষ্ঠ মনোভাবের দ্বারা সে পরিচালিত হয়নি। নাটকের ভূমিকালিপিতে তার যে পরিচয় জানা যায় তাতে সে প্রতিবেশী মাত্র। অভাবের সংসার ; জমির উপর নির্ভরশীল জীবন। সে আর তার স্ত্রী ও একমাত্র সন্তান 'রাঙা'কে নিয়ে তার সংসার। বন্যা এসে তার স্ত্রী ও পুত্রকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ভেঙে দেয় তার সাধের সংসার। কিন্তু তারপর গোটা গ্রাম ও গ্রাম্য মানুষদের জীবনে আকাল নেমে আসে এবং আকালের দুর্দান্ত আক্রমণে ঝনঝাহত পতঙ্গের ন্যায় বিপর্যস্ত হচ্ছিল, তখন সে কোথায় ছিল তা জানা যায়নি। অথচ তাকে পুনরায় দেখা গেল এই নাটকের প্রত্যাবর্তন পর্বে। তখন সে অনেকটা উদ্দীপ্ত। গ্রাম্য মানুষদের দলপতির ভূমিকায় তখন সে দাঁড়িয়ে। কোথা থেকে এই উদ্দীপ্তির অপর্যাপ্ত শক্তি সে সঞ্চয় করল এবং গ্রাম্য জনতার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা সে কেমন ভাবে অর্জন করল তার তেমন বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ এ নাটকে নেই। নাট্যকার শেষপর্বে তাকে দিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করিয়ে নিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ রচনা, শস্য উঠিয়ে ধর্মগোলায় তোলার পরিকল্পনা রচনা ও তাকে কার্যকর করা এবং নবান্ন উৎসবের রূপরেখা অঙ্কনের অগ্রবর্তী ব্যাক্তি হিসাবে প্রতিরোধের তেজঃদৃপ্ত বক্তব্য প্রকাশের পুরোধা হিসাবে তাকে দাঁড় করিয়ে নাট্যকার হঠাৎ তাকে গুরুত্ব দিয়ে দিয়েছেন অনেকখানি। চরিত্রটা অতর্কিতভাবে অনেকখানি গুরুত্ব পাওয়ায় খাপছাড়া হয়ে গিয়েছে। বন্যার পর সে কোথায় কিভাবে ছিল জানা যায় না। সমাদ্দার পরিবার গ্রাম ছাড়ার পূর্বে তার ভূমিকা এতই গৌণ ছিল যে শেষ পর্যায়ে এসে তার ওইরকম বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের ছবি খুব খানিকটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। তবে 'মোমেন্টাম'সৃষ্টির ক্ষেত্রে চরিত্রটা যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছে বলা যেতে পারে।

চোরাচালানকারী হারু দত্ত কালোবাজারী দুশ্চরিত্র কালীধন ধাড়া এই নাটকের দুটি খল চরিত্র। খল অর্থে

দুষ্ট প্রকৃতির চরিত্র। ইংরাজীতে যাকে বলে ভিলেন। এই নাটকে সমাদ্দার পরিবার এবং আমিনপুরের কৃষকেরা প্রগ্রেসিভ ফোর্স পজিটিভ শক্তি আর হারু দত্ত কালীধন ধাড়া নেগেটিভ ফোর্স দুষ্টচক্র। এরা মজুতদার,দালাল, মানুষ, ও খাদ্যের বেআইনি ব্যবসাদার। ধূর্ত, মুনাফাখোর, পরশ্রমজীবী, সমাজের নোংরা লোক। নিজেদের ঐশ্বর্যবৃদ্ধির জন্য এরা পারে না এমন কাজ নেই। এরা দুজনেই আকাল কবলিত মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অবৈধ কারবারে লিপ্ত থাকে। কৃত্রিম উপায়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়ে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলবার দুরভিসন্ধির জাল বিস্তার করে চলে।

হারু দত্ত গ্রাম থেকে ধান এবং চাল কম দামে কিনে নিয়ে কালীধনের গুদামে তুলে দিয়ে আসে। কালীধন তা মজুত করে সময় মত বেশি দামে লোক বুঝে বিক্রি করে। সেই সঙ্গে হারু দত্ত গরিব গৃহস্থ ঘরের যুবতী মেয়েও ক্রয় করে কম দামে ও বেশি পয়সায় সরবরাহ করে কালীধনের সেবাশ্রম নামক নারী ব্যবসার এক অবৈধ কেন্দ্রে। তাছাড়া হারু দত্ত অভাবের সুযোগে জোতজমিও কিনে নেয় কম পয়সার বিনিময়ে। প্রধান সমাদ্দারের পরিবারকে পথে বসায় এই হারু দত্ত। বন্যা আর দুর্ভিক্ষের সংগ্রাম করতে করতে এই পরিবারটা যখন মুমূর্ষু, তখন সেখানে নেকড়ের থাবা বসায় সে। কুঞ্জর একটি সংলাপে এই চরিত্রটার কর্মপদ্ধতি স্পষ্ট হয়ে যায়, 'টাকার লোভানি দিয়ে দেশশুদ্ধ, লোকের ধানগুলো সব নিয়ে গেছে এর আগে, এখন আবার জমি ধরে টান মারতে এয়েছে।' প্রয়োজনে এই হারু দত্ত, গ্রাম্য অশিক্ষিত মানুষকে ভগবানের ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করতে চায়, 'জানি জানি, ওপরের দিকে হাত দেখাবে বলে, তা জানি।' কিন্তু সে সবে যখন কাজ হয় না, তখন সে স্বরূপ ধারণ করে,'উঁ, সোজা শিরদাঁড়াটা তা হলে এইবার তো দেখি এট্টুখানি বেঁকিয়ে দিতে হয়; বেটা ছোটলোকের এত বড়ো আস্পর্দ্ধা!' নিজের লোকজনদের ডেকে হুকুম দেয়, ' দে তো রে আচ্ছা করেঘা দু-চার —' (১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য) আবার মেয়ে কেনবার সময়ে কৌশলপূর্ণ চাতুর্যের আশ্রয় নেয়। অক্টোপাসের মতো ঘিরে ধরে মেয়ের বাপকে। মেয়ে সংগ্রহের জন্য সে খুকির মায়ের মত মেয়ে দালাল ছড়িয়ে দেয়। তারা ফাঁকফোঁকর বুঝে তুলে আনে মেয়ের বাপকে। হারু দত্ত মারপ্যাঁচে ঘায়েল করে ফেলে তাকে । 'কিছু না, কিছু না। আমি দেখবো তোমার আপদে , তুমি দেখবে আমার বিপদে, এ না করলে চলবে কেন! —কী বল চন্দর?' প্রথম শিকারকে সে চারিদিক থেকে ঘিরে ফ্যালে, তারপর তার ঘাড়ে কামড় বসায়, 'দু- চোখের সামনে সব না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরে যাবে, এ দেখতে পারব না বলেই তো!' তারপর হর হর করে বিষ ঢেলে দেয়, 'তা সব না, সব খারাপ না, ভালো লোক পৃথিবীতে আছে। ..... তারাই তো চালাচ্ছে এই জগৎটা। এবম্বিধ প্রকারে কাজট হাসিল করে নেয়, 'ন্যাও এসো এইবার টিপ্ সইটা দিয়ে যাও, এসো এসো ।' মেয়ে বিক্রির কোবালায় টিপসইটা দিইয়ে নেয় আটঘাট বাধবার জন্যে, 'মানুষের মুখের কথায় জানবে চন্দর কোন মূল্য নেই, একেবারে কিছু দাম নেই— কথা এই বললে ফুরিয়ে গেল ! না কি! করবে যা তা সব কাগজে কলমে।..... চেপে দ্যাও আঙ্গুলটা, হ্যাঁ, য়্যাঁ।'

(২য় অঙ্ক,৪র্থ দৃশ্য)

হারু দত্ত শঠ, প্রবঞ্চক, প্রতারক, ধূর্ত এবং জালিয়াত। নাট্যকার অতিযত্নে চরিত্রটা গড়ে তুলেছেন। নিপুনভাবে তার মুখে সংলাপ বসিয়েছেন এবং অঙ্গাভিনয়ের যথেষ্ঠ সুযোগও রেখেছেন। ফলে চরিত্রটা হয়ে উঠেছে জীবন্ত।

কিন্তু সেই তুলনায় কালীধন ধাড়া অতটা ফুটে উঠতে পারেনি। সাধারণত মজুতদাররা একটু মোটাবুদ্ধির হয় , বুদ্ধির চেয়ে টাকার জোরটাই তাদের বেশি। কালীধন প্রচুর টাকার মালিক। বিরাট কারবার তার। প্রচুর চাল গুদামজাত করে রেখেছে সে। বলা বাহুল্য দেশের আপৎকালীন অবস্থায় 'ভারতরক্ষা আইন' বলে মন্বন্তরের বাজারে এই মজুতদারী একেবারে বে-আইনি, দণ্ডনীয় অপরাধের সামিল। এহেন গুদাম সংরক্ষণের এবং দেখাশোনার ক্ষেত্রে বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করা দরকার ছিল, কিন্তু কালীধন সেই সতর্কতা অবলম্বন করেনি। দ্বিতীয়ত নারী ব্যবসার কেন্দ্র সেবাশ্রমটির দিকে সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কালীধন সে প্রয়োজন বোধ করেনি। তার অর্থ প্রাচুর্য ছিল, কিন্তু দুরদর্শিতার ছিল একান্ত অভাব। তার ধারণা ছিল তার নৌকার পালে যে সুসময়ের হাওয়া লেগে নৌকাটি তরতর করে সমৃদ্ধির উজানে ছুটে চলেছে এর কখনো কোনদিন ব্যত্যয় ঘটবে না এতোখানি নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য সে নিরঞ্জন বিনোদিণীর জালে জড়িয়ে পড়ল এবং একেবারে ভরা ডুবি হয়ে গেল। তৃতীয়ত, হারু দত্তের সঙ্গে বুদ্ধির কসরতে সে এঁটে উঠতে পারে নি। হারু দত্তের দশ ঘাটে জল খাওয়া ঘোড়েল লোক। বুদ্ধি তার পাকা, প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী এবং তীক্ষ্ণ ও দ্রুতগামী। তার সঙ্গে বুদ্ধির কসরৎ করতে গিয়ে পরাজিত হয়েছে কালীধন। উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য হারু দত্ত অনেক কথা খরচ করে, কিন্তু সেই কথাগুলোকে সে কথার কথা বলে ধরে নেয়। কালীধন কিন্তু চালাকচতুর নয়, কথার চাতুর্য তার তেমন নেই, কথাও তেমন বুদ্ধিদৃপ্ত নয়। নাট্যকার গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি দিয়ে এই দুটি চরিত্র গড়ে তুলেছেন।

নাট্যকারের চরিত্রসৃষ্টির নৈপুণ্য আর একটি চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি দিলে সহজে ধরা পড়ে। চরিত্রটা খুব ছোট, স্বল্প পরিসরে আবর্তিত হয়ে টাইপ চরিত্রের 'ফরমুলাকে পালন করবার চেষ্টা করেছে। চরিত্রটার নাম রাজীব। রাজীব পূর্ববঙ্গবাসী। নাটকের প্রেক্ষাপট ও চরিত্র পরিকল্পনার আদর্শ ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় কথা বলে সে। কয়েকটি তুলির টানে এই ছোট চরিত্রটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। চরিত্রটা প্রথম সংলাপ উচ্চারণ করে হাই তুলে তিনতুড়ি বাজিয়ে, 'রাধে গোবিন্দ বল মন।' অথচ এই গোবিন্দের জীবটি মানুষের ক্ষুধায় তীব্র ব্যঙ্গ করে, 'চাল খায়। বড় চাল খাউন্যা! চাল খাইতে আইছে! দুর্ভিক্ষের পোকামাকড় যত সব। দুর্ভিক্ষের বাজারে মানুষ যে মানুষ নেই, অন্নের হাহাকারে পাগল হয়ে গেছে সবাই, কালীধনের গদিতে সরকারের চাকরি করতে করতে তা তার জানা হয়ে গেছে। কালীধন এবং তার সাঙ্গপাঙ্গারা ছাড়া ক্ষুধার্ত জনগণ মানুষ কিনা সে সম্পর্কে তীব্র সংশয় প্রকাশ করে সে, 'আরে কালীধন, এগুলো কী মানুষ।' তাই ক্ষুধার চাল না পেয়ে তারা যখন ক্ষিপ্ত স্বরে কথা হলে তখন সে কালীধনের হয়ে প্রবল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথা বলে, 'দে দ্যাখ —আবার চোখ ভ্যাটকায়! দেদে গলাটা ধইর‍্যা বার কইর‍্যা দোকান থিহ্যা রাখহরি।' (২/১) ক্ষুধার্ত মানুষ সম্পর্কে তার শেষ সিদ্ধান্ত, 'দুর্ভিক্ষের কাঙালি যত সব, মরার আইস্যা পরছে শহরে— কিংবা বিনোদিনীর সঙ্গে সেবাশ্রমে নিরঞ্জনকে কথা বলতে দেখে সবিস্ময়ে বলে , 'রাখহরি! সুট সুট কইর‍্যা ঘরে ঢুইকা ইয়ারে কয় কিডা রে, য়্যাঁ.....চুপ কইরা আছস অহন, কথা সে কস্ না বড়!.....ভাবস বুইড়্যা কিছু ঠাহর পায় না, না বেটা প্রেমালাপ করনের আর জায়গা পাইলা না! (১/৫) তার ধারণা এবং বিশ্বাস প্রেম ভালবাসা কালীধনের ব্যক্তিগত এক্তিয়ার , এসবে আর কারো অধিকার নেই। তাই সে নিরঞ্জনকে শাসায়, 'সিংহর মুখে খাদ্য আর তুই শৃগাল হাত দিছিস তাইতে! বাবু তোরে আজ কী করে দেহিসনে.... বেটা ছুটলোক

আস্পর্ধা পাইলে কী আর রক্ষা আছে না!' আবার বিনোদিনী যখন ঘরের বাইরে যেতে চায় তখন তাকে গিয়ে বাধা দেয়, 'আরে এইডা কী কর ! তুমি মাইয়া মানুষ তোমার স্থান হইল অন্দরমহলে । বাইরে যাবা ক্যান। যাও ভীতরে যাও। কী আশ্চর্য!' (২/৫)

রাজীব বৃদ্ধ কিন্তু বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়েনি সে। অন্ত্যন্ত করিৎকর্মা। কর্তার বিক্রম প্রকাশ করতে পঞ্চমুখ সে । নিজের প্রভূত্ব খাটাতে সে খুব তৎপর। কালীধনের সেবাশ্রমের ক্রিয়াকাণ্ড তার জানা। এখানে যে সমস্ত স্ত্রীলোকেরা তাদের প্রতি অন্য কারো দৃষ্টি পড়াটা সে যেমন বরদাস্ত করতে পারে না, ঠিক সেই রকম এখান থেকে কোনো স্ত্রীলোক বেরিয়ে যেতে চাইলে সে সতর্ক প্রহরীর মতো বাধা দেয়। চরিত্রটির মধ্যে খুব গভীরভাব এবং ভাবনার চিহ্ন পাওয়া যায়না। হালকা —উপরিস্তরে ভাসন্ত এই চরিত্রটা নাট্যকার অতি যত্ন সহকারে গড়ে তুলেছেন। কথাবার্তা, হালচাল, আদবকায়দার মধ্যেবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে চরিত্রটিকে খুব উপভোগ করে তুলেছেন বলতে হবে।

উপরোক্ত চরিত্রগুলো ছাড়াও 'নবান্ন' নাটকে স্ত্রী চরিত্র আছে কয়েকটি। যেমন, পঞ্চাননী, রাধিকা এবং বিনোদিনী ইত্যাদি।

পঞ্চাননী প্রধান সমাদ্দারের স্ত্রী। আমিনপুরের বৃদ্ধ মহিলা। স্বাধীনতা আন্দোলনে আমিনপুর তথা মেদিনীপুরের একটা বিশেষ একটা ভূমিকা ছিল। গান্ধী বুড়ি মাতাঙ্গিনী হাজরার ভূমিকা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। সম্ভবত এই ঐতিহ্যের পথ ধরে পঞ্চাননী চরিত্রটি নবান্ন নাটকে এসেছে। প্রধান সমাদ্দারের উপযুক্ত স্ত্রী সে। আগষ্ট আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার মানসিকতা ঘিরে শাসক শ্রেণীর অত্যাচারে ভয়ে ভীতু আমিনপুরের মেয়েরা লজ্জা শরম খুইয়ে বনে জঙ্গলে গিয়ে বসে থাকে শুধু আত্মরক্ষার জন্য। এর চাইতে অপমানের কিছু আছে? পঞ্চাননীর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর থেকে শোনা যায়— বলি তোদের এই অক্ষমতার জন্যে মেয়ে মানুষ কেন সহ্য করতে যাবে এই দুর্ভোগ? (১/১).....সব চাইতে বড়ো কথা ইজ্জৎ!! মেয়ে মানুষের ইজ্জৎ! !' (১/১০)— উত্তরে কুঞ্জর কাছ থেকে কোনো ইতিবাচক বক্তব্য না শুনতে পেয়ে পঞ্চাননী স্বয়ং একটা জনতাকে নেতৃত্ব দেয়। তাদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। পুলিশের মার খেয়ে পলায়নপর জনতাকে মারমুখি করে তুলে বিশেষ সাহস ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু জীবনী শক্তি তখন তার খুব কম অংশই অবশিষ্ট ছিল, তাই বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। নাটকীয় চরিত্র হিসেবে নাট্যকারের এটি একটি অনবদ্য সৃষ্টি বলতে হবে।

বিনোদিণী সুসংগত, সংযত এক গ্রাম্য বধূর সু-অঙ্কিত চরিত্র। সমাদ্দার পরিবারের কনিষ্ঠ বধূ লজ্জাশীলা ধী-শক্তি সম্পন্না। স্বামী নিরঞ্জন তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পরও সে এই পরিবারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দুঃখবেদানার সমান অংশীদার হয়ে এই পরিবারের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন থেকেছে। তাঁর একটাই বেদনা—স্বামী নিরঞ্জন সংসারের সংকটে সকলেই যখন ঝালাপালা তখন বিনোদিনীর পাশে থেকে,দুঃখ বরণের সহমর্মী হয়ে, মানসিক স্বস্তি ও আশ্বাসের স্থল হওয়ার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে ইতিবাচক ভূমিকা না নিয়ে দেশান্তরে চলে গেছে। শত মান অভিমান অনুরোধেও কর্ণপাত করেনি। তাঁর নারীসত্তার এ অবমাননা বড় বেদনাদায়ক। অতঃপর পরিবারের সকলের সঙ্গে গ্রাম ত্যাগ করে শহরে এসে অতর্কিতভাবে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এক টাউট তাকে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে এনে তুলে দেয় কালীধনের সেবাশ্রমে। এখানে ঘটনা চক্রে

সে মিলিত হয় স্বামী নিরঞ্জনের সঙ্গে। নিরঞ্জন রাখহরি নামে সেখানে কালীধনের কর্মচারী। নিরঞ্জনকে বিনোদিনী সেবাশ্রমের সমস্ত বিবরণ দেয় এবং কৌশলে কালীধন ধাড়া ও তার সরকার রাজীব সমস্ত বামাল সহ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। তারপর বিনোদিনী নিরঞ্জনকে নিয়ে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে এবং ভেঙে পড়া ঘর ও অগোছালো সংসারকে সে পুনরায় গড়ে তোলে। বিনোদিনী একটি সুঅঙ্কিত গ্রাম্যবধূর চরিত্র।

রাধিকা নবান্ন নাটকের সবচেয়ে বড় স্ত্রী চরিত্র। কুঞ্জর স্ত্রী এবং সমাদ্দার পরিবারের জ্যেষ্ঠ বধূ। একটি সন্তানের জননী। এই চরিত্রটির তিনটি অংশ। পরিবারের জ্যেষ্ঠ বধূ হিসাবে সে খুব দায়িত্বশীলা; সকলকে একসঙ্গে নিয়ে চলবার মনোবাসনা তার অকৃত্রিম। অভাবের সংসারে ছোটখাটো ঝগড়াবিবাদে যেমন জড়িয়ে পড়ে, তেমনই দুঃখের সংসারকে সুখের করে তোলবার ঐকান্তিক আগ্রহে ভরপুর। দ্বিতীয় অংশ শহরের ফুটপাতবাসিনী। এই অংশে ক্ষুধার সঙ্গে তীব্র সংগ্রামরত সে । কিন্তু ক্ষুধার লেলিহান শিখা তার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে স্বামী ভক্তি ও স্বামীপ্রেমকে খাক করে দিতে পারেনি। বরং তা আরো গাঢ় হয়ে উঠতে দেখা গেছে। কুঞ্জর হাতে কুকুরে কামড়াবার দৃশ্যটি এই বক্তব্যকে সমর্থন করবে। কুকুরে কামড়াবার অব্যবহিত পরে রাধিকার অন্তরের অভিব্যক্তি ধাপে ধাপে গভীর থেকে গভীরতম স্তরে পৌঁছেছে। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া 'একেবারে কামড়ে খেলে গো'র অনিবার্য সাধারণ গ্রাম্য নারীসুলভ প্রকাশ—'ভারি পাজি কুকুর তো। .....দূর হারামজাদা লক্ষ্মীছাড়া কুকুর। ঝাঁটা মারো মুখে, ঝাঁটা মারো।'বক্তব্য বিষয় অনেকটাই অমার্জিত Crude । এটি যখন অনুভূতির গভীরে প্রবেশ করে, তখন 'ওমা এ যে অনেকখানি কামড়ে নিয়েছে দেখছি। ওমা আমার কী হবে গো।' ঘর বার যখন একাকার ,তখন তার এ উপলব্ধি অন্তরে যে অসহায়তা তারই প্রকাশ উপরোক্ত অংশে। বোধ করি স্বামী কুঞ্জর যন্ত্রনাকাতর মুখ লক্ষ্য করে, তারচৈতন্যের গভীরে যে উপলব্ধি তা থেকেই বেরিয়ে আসে, 'খুব যন্তনা হচ্ছে, না! জল এনে দেব জল? একটু জল খাবে?— এ যেন নতুন করে স্বামী প্রেমকে ফিরে পাওয়া,' নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার। তারপর ফিরে এসেছে স্বামীর হাত ধরে নিজেদের গ্রামে। তৃতীয় অংশ গ্রামপ্রীতি। গ্রামে প্রত্যাবর্তনের জন্য তার অন্তরে একটা ইচ্ছা সুপ্ত ছিল। তাই কুঞ্জ যখন প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করে, রাধিকা তৎক্ষণাৎ তা সমর্থন করে। সেই মুহূর্তে তার অন্তরে শাশ্বত মাতৃত্বের জাগরণ ঘটে। মৃত পুত্র মাখনের জন্য তার সমস্ত অন্তর হাহাকার করে ওঠে। কিন্তু গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে সে সমস্ত কিছু ভুলে নতুন করে গড়বার আনন্দে আবার মেতে ওঠে। এই অংশের রাধিকাকে আমরা আবার প্রথম অংশের রূপে দেখে মুগ্ধ হই। রাধিকা 'নবান্ন' নাটকের একটি অনবদ্য নারী চরিত্র। নাট্যকার এই চরিত্রটি গভীর নিষ্ঠা ও পর্যবেক্ষণ শক্তির সাহায্যে গড়ে তুলেছেন।

৮৭.১২ মূলপাঠ ৬ : 'নবান্ন' নাটকের সংলাপ ও গান

নাটক সংলাপ নির্ভর। সংলাপের ওপরেই নাটকের নাটকীয়তা, সংলাপের মধ্যে দিয়েই নাটকের বিষয়বস্তু বর্ণনা, সংলাপের মধ্যে দিয়েই নাটকের দ্বন্দ্বসংঘাত সৃষ্টির চেষ্টা, নাটকীয় বৃত্ত গঠন, চরিত্রের বিকাশ, বিশ্লেষণ ইত্যাদি নির্ভর করে। সাহিত্যে অন্যান্য প্রকরণগুলিতে রচয়িতার এক নিজস্ব কলম থাকে, যে কলমে তিনি কিছু বর্ণনা, কিছু বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে কাহিনী, চরিত্র, প্রকৃতি, পারি ার্শ্বিকতা, স্থান ও কালের

অনেকখানি পরিচয় দিয়ে থাকেন। নাটকে কিন্তু নাট্যকারের সে সুযোগ নেই। নাট্যকার এ সমস্ত কিছুই সংলাপের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে থাকেন। নিজে করতে গেলেও নিজেকে প্রথম চরিত্র করে তুলতে হবে, তারপর অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে যুক্তিগ্রাহ্য পথে সংলাপ উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে এ কাজগুলি করে থাকেন।

সুতরাং নাটকের ,সংলাপ যেমন একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তেমনই এর রচনা পদ্ধতির প্রতি রচয়িতার বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়? সচেতন মনের সযত্ন প্রয়াসেও অতিরিক্ত সাবধানতা গ্রহন করতে হয়। মনের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বরগ্রাম্যভিত্তিক সংলাপ রচনা করতে না পারলে নাটক প্রার্থিত ফলদানে সক্ষম হয়না। মনের বিভিন্ন-ভাব- অনুভাব বিভাব, সঞ্চারী ভাবকে বিভিন্ন গ্রামে নিয়ে গিয়ে উপযুক্ত স্বর সহযোগে নিক্ষেপ করতে হয়, তাহলেই নাটক থেকে উপচিত হবে যথেষ্ঠ উপভোগ্য নাট্যরস। এই সংলাপের মধ্যেই নিহিত থাকে বাচিত অভিনয়ের বহুবিধ উপকরণ, আবার এই সংলাপের মধ্যেই অনুল্লেখিতভাবে জড়িত থাকে অঙ্গাভিনয়ের নানা নির্দেশ। যেমন, 'চলে যাও' বললে একরকমের অঙ্গাভিনয় হবে, আবার যাও, তুমি চলে যাও, তুমি চলে যাও' বললে অঙ্গাভিনয়ের ধরনটা যাবে বদলে,আবার, 'যাও, যাও চলে যাও' বললে তার অঙ্গাভিনয়টা হবে অন্যরকম।

এই যে নাটকে দ্বিবিধ অভিনয় তা সংলাপের ওপরেই নির্ভরশীল। তাই যে নাট্যকার যত বেশি ভাল সংলাপ রচনা করতে পারেন, সেই নাট্যকারের নাটক রসিক মহলে তত বেশি সমাদৃত হবে। সেই নাট্যকার কালের দেওয়ালে হাত রাখতে পারবেন। এমন অনেক সময় দেখা গেছে যে , হালকা সংলাপের নাটকে সুদক্ষ অভিনেতাও, সুনাম অর্জন করতে পারেননি, কিন্তু ভাল সংলাপ সংযুক্ত নাটকে তৃতীয় স্তরের অভিনেতাও অতি সহজে দারুন অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করে কৃতিত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি সংলাপই নাটকের প্রাণ। তাকে আশ্রয় করেই নাটকের চরিত্রেরা চলাফেরা করে, তারা পরিস্ফুট হয়, বিকশিত হয়। তাই সংলাপ হওয়া উচিত স্বাভাবিক কথা ভাবানুগ, চরিত্রানুগ ও সংক্ষিপ্ত। এই ধরনের সংলাপ রচনার সূত্রপাত করেন মধুসূদন। তিনি একটি চিঠিতে কেশবচন্দ্রকে লিখেছিলেন, I shall endeavour to creat characters who speak as nature suggests and not mouth mere poetry. — অর্থাৎ চরিত্র স্বাভাবিকভাবে কথা বলবে, কাব্যাংশ আওড়াবে না। তার পরিচয় পাওয়া গেল মধুসূদনের প্রহসন দুটিতে— 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' আর 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'কৃষ্মকুমারী' নাটকে। কৃষ্ন কুমারিতে এসেছে কথ্যরীতি। সংলাপ উচ্চারণের কাল হয়েছে দ্রুত, দ্বন্দ্বমথিত তীব্রতায় সংলাপ চরিত্রকে ব্যক্ত করেছে। সংলাপগুলির ভাষায় চরিত্রগুলির ব্যক্তি পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। মধুসূদনের প্রহসন দুটির সংলাপ ত্রুটিমুক্ত, প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষতা ঘটনাগত ও অনুভূতিগত। সংলাপ, সংস্কৃত নাটকের সংলাপরীতি অনুযায়ী বিবরণধর্মী না হয়ে বক্তব্যের বাহন হয়েছে। বগতোক্তি প্রায় বর্জিত, যা আছে তা সংক্ষিপ্ত, তীক্ষ্ণ। সর্বোপরি সংলাপ হয়ে উঠেছে চরিত্রের দর্পণ। 'একেই কি বলে সভ্যাতা'র থেকে একটি উদাহরণ তুললে মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত হবে। নায়ক নবকুমারের ইয়ার কালী নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে, 'কি পরিচয় দেব বলো দেখি ভাই? তোমাদের কর্তাকে কি বলব যে আমি বিএরের —মুখটি—স্বকৃতভঙ্গা— সোনাগাছিতে আমার শত শ্বশুর—না না, শ্বশুর নয় —শত শাশুড়ির আলয়, আর উইলসনের আখড়ায় নিত্য

মহাপ্রসাদ পাই—'

অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের সংলাপ প্রতীক আর রূপকধর্মী। কাব্যরসাশ্রিত প্রতীকধর্মী সংলাপ রচনার যাদুকর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এক অসম্ভব রকমের নিজস্বতার স্বাতন্ত্র্যে তিনি উদ্ভাসিত। তাঁর সংলাপ অনেক সময় তরঙ্গায়িত বলে মনে হতে পারে। সহজ সরল শব্দগুলিকে তিনি এমনভাবে সাজান যে তার থেকে কাব্য ঝরে পড়ে। লোক প্রচলিত বাজার চলতি শব্দের ব্যবহার না থাকবার দরুন একটা মার্জিতরূপ গড়ে ওঠে। কবির মনোলোকের গভীর তলদেশ থেকে উৎসারিত হয় শব্দতরঙ্গ, সংলাপের মধ্যে আনে এক বোধসম্পন্ন অনুভববেদ্য আবেশ। শ্রীশম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাথের সংলাপ সম্পর্কে বলেছেন, জীবন প্রতিম বলে চিনতে পারার মতো সমস্ত বিশিষ্টতা আরোপ করেও সাধারণ প্রতীকী চেহারাটা তিনি অক্ষুন্ন রাখতে পারতেন।' প্রসঙ্গক্রমে 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অথবা 'কালের যাত্রা' প্রভৃতির সংলাপের কথা বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংলাপের প্রসঙ্গে একটা কথা বললেই যথেষ্ট হবে, তিনি নাটকের সংলাপ লিখতেন কবির কলমে।

কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে আশ্চর্য রকমের বিবর্তন ঘটে গেছে। সংলাপের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে গেছে আমূল। মধুসূদন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংলাপ থেকে এই সংলাপ সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র। দর্শক এবং চরিত্রের তফাৎটা ভেঙে ফেলে পারস্পররিক সাযুজ্য সন্ধানে নতুন রীতি ও কৌশল অবলম্বিত হয়েছে বাংলা নাটকের সংলাপ রচনায়। আমরা পার হয়ে এসেছি—

'গর্ব, মান, বীর-অহঙ্কার—
পাণ্ডবের তুমি হরি!
আদেশে তোমার
অশ্বমেধ হইয়াছে আয়োজন,
নারায়ণ, নাহি লয় মন
তাহে কভু বিঘ্ন হবে।' (গিরিশচন্দ্র)

কিংবা, 'তুমি দেখতে পাচ্ছো না দুর্যোধন, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি ঐ আগুনের শিখা লক লক করে আকাশ ছেয়ে ফেলল, ঐ আর্তনাদ, ঐ হাহাকার—হাঃ হাঃ হাঃ— (অপরেশচন্দ্র)

কিংবা, '—ঐ সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। দিবার চিতাগ্নি তার চারদিকে ধূ ধূ করে জ্বলে উঠেছে। কাল আবার ঐ সূর্য্য উঠবে। উঠুক! একদিন আসবে, সেদিন ঐ সূর্য্য আর উঠবে না। ঐ জ্যোতি ক্রমে ক্রমে শীর্ণ, মলিন, ধূসর হবে যাবে। তার পাংশুরক্তবর্ণ ধূম পৃথিবীর পাণ্ডুর মুখের ওপর এসে পড়বে। তারপর তাও পড়বে না। কৃষ্ম সূর্য্য অনন্ত শূন্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে। কি গরিমাময় দৃশ্য সেই? — কে?' (দ্বিজেন্দ্রলাল)

অথবা, 'সামনে তোমার মুখে চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালো চুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝরনা। আমার এই হাত দুটো সেদিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম পেয়েছিল। মরণের মাধুর্য আর কখনো এমন ভাবে ভাবিনি। সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কালোচুলের নীচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারি ইচ্ছা করছে। তুমি জান না, আমি কত শ্রান্ত। (রবীন্দ্রনাথ)

এ সমস্ত সংলাপ অতিক্রম করে চল্লিশের দশক লিখছে, 'হেঃ, এ রক্তের আবার দাম! এ রক্তের জন্যে আবার মায়া! জন্তু জানোয়ারের মতো বনে জঙ্গলে যাদের পালিয়ে পালিয়ে বাঁচা — ও বেশ হয়েছে কুঞ্জ, তুই আমারে ছেড়ে দে।— আমার অন্তর জ্বলে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অন্তর—

কুঞ্জ। অন্তর কার জলেনি, আমার না?

প্রধান। (ক্ষুব্ধ স্বরে) জ্বলেছে তো এগুলি নি কেন যখন বল্লাম? এগুলি নি কেন? কেন এগুলি নি তুই? তোর অন্তর যদি —আমার শ্রীপতি-ভূপতি—

কুঞ্জ। শ্রীপতি-ভূপতি ব্যথা বড় কম বাজে নি এই বুকে, জানলে জেঠা! তবে তুমি শুধু বারবার ঐ নাম দুটো করে মিথ্যে শান্তি পেতে চাও, আর আমি ভেতরে ভেতরে দগ্ধে মরি, এই তফাৎ।—

এই সংলাপ যেন প্রত্যক্ষ জীবনের উত্তপ্ত ক্ষেত্র থেকে উঠে এসে রূপ নিয়েছে ফোঁটা ফোঁটা রক্তে। অদ্ভুত রকমের জীবন্ত, বাস্তব, স্বাভাবিক। বাস্তবধর্মী জীবনের উন্নতায় ভরা অথচ মেদবর্জিত, বহুবর্ণ অননুরঞ্জিত পেলবতাহীন, অপ্রলম্বিত মৃত্তিকাশ্রয়ী মৃত্তিকাগন্ধী সংলাপ। সর্বনাশা সঙ্কটের বিরুদ্ধে প্রতিকারহীন প্রতিরোধস্পর্ধী আত্মার উত্তপ্ত গ্লানির কেন্দ্রস্থল থেকে উঠে এসেছে,— 'ঐ হয়েছে এক কিন্তু, সব কথার ভেতরে ঐ কিন্তু; (হঠাৎ উদভ্রান্তের মত ছুটে গিয়ে টুঁটি টিপে ধরে কুঞ্জর) ঐ কিন্তুটার টুঁটি একবার, (মরিয়াভাবে) কিন্তুটা-রে একেবারে শেষ করে ফেলে দেই। একেবারে শেষ করে (ধস্তাধস্তি)—'

কুঞ্জ। জেঠা, জেঠা, কী হচ্ছে, কী কর? জেঠা! জেঠা!! (কুঞ্জর ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে প্রধান)

প্রধান। (হঠাৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে) য়্যাঃ!

কুঞ্জ। জেঠা!

প্রধান। আমার অন্তর জ্বলে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অন্তর জ্বলে গেছে।

চল্লিশের দশকে 'নবান্ন' ছড়িয়ে দিচ্ছে জীবনের ঊষর ক্ষেত্রের ওপর দণ্ডায়মান কতগুলো মানুষের মনে প্রতিরোধের স্পৃহায় মূমুক্ষু আত্মার মর্মবাণী, 'আমিনপুরের কলঙ্ক, আমিনপুরের কলঙ্ক তোরা সব, তাই পেছু হটছিস। পেছোস নি, এগিয়ে যা। এগিয়ে যা তোরা সব, এগিয়ে যা।'

এ সংলাপ যেন নাট্যকারের নয়, এ সংলাপ চরিত্রের। এ চরিত্র নাট্যকার সৃষ্ট চরিত্র নয়, সময়ের ঝঞ্ঝাবর্ত্তে ব্যতিব্যস্ত কৃষিভূমিতে দণ্ডায়মান অকালগ্রস্ত, অথচ ভাগ্যবাদী চরিত্রও নয়, বরং বাস্তববোধের দ্বার বিদীর্ণ কতকগুলি জীবন্ত মানুষ। 'জানি জানি, ওপরের দিকে হাত দ্যাখাবে, তা জানি। তা সে বিশ্বাস ভেঙে গেছে; ওতে আর ভয় করি নে।' সংলাপ তাই উঠে এসেছে সত্যকথনের দৃঢ় প্রত্যয়ের অন্তঃস্থল ঠেকে 'টাকার লোভানি দিয়ে দেশশুদ্ধ, লোকের ধানগুলো সব নিয়ে গেছে এর আগে। এখন আবার জমি ধরে টান মারতে এয়েচে। ও জমি বিক্রি হবে না বলে দ্যাও।' অত্যাচারী লুণ্ঠনস্পৃহ দানবের বিরুদ্ধে চাষাড়ে রক্ত টগবগে হুংকার ছোড়ে, 'হেত্তেরি শালা নিকুচি করেছে তোর ঝামেলার—

সংলাপের শব্দগুলো লক্ষ্য করবার মতো এসব শব্দের জন্মভূমি নাট্যকারের মনোজগৎ নয়, গ্রাম বাংলার কৃষক মজুরের ঘরকন্নার মধ্যে, মাঠ ঘাট পথ প্রান্তরের মধ্যে এর অস্তিত্ব। তাদের আনন্দ-উৎসব, পালপার্বণ, সুখদুঃখ, যন্ত্রণা হাহাকার, রাগদ্বেষ, ঘৃণা, হিংসা, ক্রোধ এবং ক্রোধোন্মত্ত অন্তরের উত্তপ্ত ক্ষেত্র থেকে রচনায়

এসেছে শব্দের মণিমাণিক্য।

গ্রামের চাষী মজুরের ভাষা ও শহর কোলকাতার আটপৌরে ভাষার অস্তিত্বও দেখা যাবে 'নবান্ন' নাটকে। আবার পূর্ববাংলার উপভাষা এই নাটকে এসে গেছে রাজীবের মুখে। এ ছাড়া আরবী, ফার্সি শব্দ এসে গেছে। মোটের ওপর এই চার রকমের ভাষার সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে 'নবান্ন' নাটকের সংলাপ।

'নবান্ন' নাটকের গঠনগত একটা বিশেষত্ব— প্রায় প্রতিটা দৃশ্যে একটা করে চরম মুহূর্ত গড়ে তোলা হয়েছে দৃশ্যান্তে। সেই চরমমুহূর্ত গড়ে উঠেছে সংলাপের অদ্ভুত ঠাস বুননে—

(উন্মত্ত অবস্থায় নেপথ্য থেকে দয়াল 'কুঞ্জ কুঞ্জ' ডাক দেয়)

কুঞ্জ। (উৎকর্ণ হয়ে) য়্যাঃ.....কুঞ্জ! .....কে!

[উন্মত্ত অবস্থায় দয়ালের প্রবেশ]

দয়াল। কুঞ্জ,কুঞ্জ, কুঞ্জ!

কুঞ্জ। দয়ালদা। কী হয়েছে দয়ালদা?

দয়াল। (স্বপ্নোত্থিতের মতো) য়্যাঁঃ, কোনো কিছু ছিল নাকি আমার কোনো দিন? ছিল কি কেউ? কোথায় গেল! আমার কি কিছু ছিল না!!

কুঞ্জ। রাঙার মায়ের জন্যে যে তুমি।

দয়াল। রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙা! আমার ঘর, কোথায় গেল আমার ঘর! কুঞ্জ!!

প্রধান। দয়াল!!

দয়াল। প্রধান, সমুদ্দুর, চারদিকে শুধু সমুদ্দুর—জল আর জল, কিছু নেই শুধু জল.....সমুদ্দুর উঠে এয়েছে গ্রামে। রাঙার মা, রাঙা, রাঙার মা রাঙার মা!!

বিস্ময়ে বিমূঢ় করে তোলে আটপৌরে ঘর-কন্নার ভাষাকে দিয়ে কি অদ্ভুত ভবে ক্লাইমেক্স গড়ে তুলেছেন নাট্যকার। বন্যায় দয়ালের ঘরবাড়ি স্ত্রী-পুত্র গোটা সংসারটা ভেসে গেছে। সেই যন্ত্রণার হাহাকার বেরিয়ে এসেছে তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে কুঞ্জ কুঞ্জ ডাকের মধ্যে। দর্শক অতর্কিতে ওই আর্তনাদে চমকে চমকে ওঠে। নাট্যকার প্রধান শব্দটা ব্যবহার করলেন না, কেন না, কুঞ্জ শব্দটার ভেতর অভিনেতা, আতঙ্কিত কণ্ঠস্বরের ঢেউটা খেলাতে পারবেন, যে ঢেউ দর্শক মনে উত্তাপ তরঙ্গ তুলবে। আর একটি শব্দ 'সমুদ্দুর'। সমুদ্র বললে স্বরক্ষেপের কালসীমা যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, 'সমুদ্দুর তারও চেয়ে অনেক বেশি হয়। অভিনেতা কণ্ঠস্বরকে অনেকখানি দর্শকমনে গভীর ছাপ ফেলবার সুযোগটা পেয়ে যান।

হারু দত্তের সরীসৃপ মন লালাসিক্ত রসনায় উচ্চারণ করে অদ্ভুত সংলাপ, 'হেঃ, হেঃ ছেলেমানুষ কিনা! ' প্রস্থানরতা বিনোদিনীর দেহের প্রতি লোলুপতা প্রকাশের পক্ষে ওইটুকু সংলাপই যথেষ্ট। কিংবা কুঞ্জকে যখন হারু দত্তের লোকজন লাঠিপেটা করছে প্রধানের সংলাপ তখন তৈরি করছে অদ্ভুত 'সিকোয়েন্স', 'মেরে ফেলোনি বাবা ওরে। বাবা, মেরে ফেলোনি। মেরে ফেলোনি।' —সংলাপের ওপর অভিনয়, দর্শক মনে গভীরভাবে দাগ কেটে যাওয়ার মতো। আবার তিনটি শব্দের বিচ্ছিন্ন উচ্চারণে প্রেক্ষাগৃহ উত্তাল আবেগে

চঞ্চল হয়ে ওঠে। মাখনের মৃত্যুদৃশ্যে কুঞ্জের আর্তনাদ, 'য়্যাঃ মাখন, মাখন—' লক্ষ্য করবার মতো শব্দগুলো মোটেই আবেগময় নয়। আবেগ উচ্ছ্বাস বর্জিত। এই ধরনের সংলাপ রচনা করে নাট্যকার তাঁর নবান্ন নাটকের বিশেষত্ব মন্ডিত করেছেন।

রাজীব পূর্ববঙ্গীয় উপভাষায় অদ্ভুত অমানবিক ধরনের সংলাপ উচ্চারণ করে, যাতে তার প্রতি দর্শকের ঘৃণা এবং ক্রোধ যুগপৎ বেরিয়ে আসে। 'দে দ্যাখ— আবার চোখ ভ্যাটকায়! দেচে গলাটা ধইর‍্যা বার কইর‍্যা দোকান থিহ্যা রাখহরি। দে চে রাখহরি—' বা প্রধানের উন্মত্ততা প্রকাশের জন্যে নাট্য সংলাপ অদ্ভুত শব্দ সহযোগে গড়ে তোলেন, 'ঐ ব্যথা দৌড়ে পালিয়ে গেল; একেবারে সে সোঁ-ও-ও-ও-ও-ও নদ-নদী, খালখন্দ পেরিয়ে বনবাদাড় ভেঙে সে ব্যথা একেবারে হাওয়া গাড়ির মতো দৌড়ে চলে গেল হুই—' আবার আবেগময় রূপকধর্মী সংলাপ রচনায় নাট্যকার সহজ সরল শব্দ ব্যবহার করেন নিপুণ হাতে,—'তাই ভালো। ভুলে যাও ব্যথার কথা! ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা। ভুলে যাও।'

শহুরে ভদ্র সম্প্রদায়ের ব্যক্তি নির্মলবাবু। স্বশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের অর্থগৃধ্নুতা এবং দুর্ভিক্ষের বাজারে অন্ধকার পথে কামানো অর্থে ঐশ্বর্যের দম্ভ প্রকাশের বিপক্ষে বিরুদ্ধ মানসিকতা পোষণ করে অর্থহীন মানুষদের পক্ষে সওয়াল করেন শহরাঞ্চলে ব্যবহৃত সহজ সরল সংলাপে, সে পয়সা যাদের আছে তার বলতে পারে এ কথা! কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে বেশির ভাগ লোকেরই আবার সেটা নেই কি-না?' এই দৃশ্যে 'মাগো মাগো' ধ্বনি দুর্ভিক্ষের হাহাকার প্রকাশের উপযুক্ত সংলাপ। নাট্যকার এই শব্দ দুটির অভিনয় করিয়েছেন 'অফ ভয়েসে'। নেপথ্য থেকে মাইক্রোফোনে।

দেশী শব্দের সঙ্গে আরবি ফার্সি ভাষার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নাট্যকার নাট্যসংলাপে বৈচিত্র্য এনে সংলাপকে শ্রুতিমধুর করে তুলেছেন যেমন, তেমনি ব্যক্তি পরিচয়ের বাহন হয়ে উঠেছে এ সংলাপ। '.....আর অগরারে ধরতেই পারলাম না কিছুতে। এই খপ করে ধরতে যাব কি সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গিয়ে বেরুল বাদাড়ে! সামনে পেলাম, ধরে নিয়ে এলাম এডারেই! এট্টু কমজোরি, তা হলেও কায়দা জানা আছে। প্যাঁচ মারা তো দ্যাখনি এর! হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, অগরা পর্যন্ত কাছে ঘেঁসতে সাহস করে না এর!

'নবান্ন' নাটকের সংলাপ গণনাটকের আসল সংলাপ। গণনাটকে গণচেতনা বৃদ্ধির একটা সচেষ্ট প্রয়াস থাকে। সেই চেষ্টাকে সফল করে তোলবার জন্য নাট্যকারকে সচেতন হতে হয়। নাটককে অধিক সংখ্যক মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া সেই সচেতনতার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য। সাধারণ মানুষের কাছে নাটককে নিয়ে যেতে গেলে, সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে তুলতে গেলে সংলাপকে সর্বজনবোধ্য করে তুলতে গেলে সহজ সরল শব্দ, অতি প্রচলিত সাধারণ শব্দ দিয়ে সংলাপের দেহ গঠন করতে হয়। সেদিক থেকে 'নবান্ন' নাটক যথেষ্ট সফল বলা যেতে পারে।

'নবান্ন' নাটকের গান :

শিল্পকলা হিসেবে নাটকের উদ্ভবের সঙ্গে গানের একটি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। কোনো দেশেই পূর্ণাঙ্গ নাটক স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেনি। তার সূচনা কোনো ধর্মীয় বা লোকোৎসবের মধ্য দিয়ে

হয়েছে। এই সমস্ত উৎসবকালে গান-নির্ভর আবৃত্তির মধ্যে নাটক ও অভিনয়-কলার জন্মসুত্র জড়িত। গ্রামীণ সৌ রোৎসব থেকে যেমন যাত্রার উদ্ভব ধরা হয়, তেমনি এদেশে প্রাচীন নাটগীত, আধুনিক নাট্যকলার অঙ্কুর বলে মনে করা হয়।

প্রাগাধুনিক বাঙলার লোকজীবন প্রধানত যাত্রা প্রভাবিত ছিল। এই যাত্রাভিনয় ধর্মীয় বা লোকোৎসবকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হত। জনসাধারণের রসপিপাসু মন এর মধ্যেই পরিতৃপ্তি লাভ করত। এই ধরনের রচনায় ধর্মভাব ও সঙ্গীত বাহুল্য ছিল। এ দুটির উপস্থিতিতে নাটকীয় দ্বন্দ্বের অভাব লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া যাত্রা লোকজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে, মুক্তমঞ্চে, দৃশ্যপট ছাড়াই অভিনীত হত।

ঊনিশ শতকে বাংলা নাটক ইউরোপীয় আদর্শে গড়ে উঠলেও, বাঙালি জীবনে যাত্রার সংস্কার, সর্বত্র কাটিয়ে ওঠা সম্ভবপর হয়নি। বিশেষত মঞ্চমুখী নাট্যকারেরা যাদের প্লে-রাইট বলে চিহ্নিত করা যায় তারা জনচিত্তজয়ের জন্য, তাদের রুচির রীতির ওপর অনেকটা নির্ভরশীল হতেন। গান এ ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য অঙ্গ গণ্য হয়। গানের একটা তীব্র আকর্ষণ আছে, মনোরঞ্জক ভূমিকা আছে। ঊনিশ শতকের মঞ্চপ্রাণ নাট্যকারেরা অনেকেই গানের বহুল ব্যবহার করেছেন। কিন্তু নাট্যবোধ যেখানে প্রেরণা, জীবনের গানের ব্যবহার নাট্য প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। নাটকীয় চরিত্র ঘটনা ও পরিবেশ বর্ণনা, সংলাপ ও অভিনয়কে অর্থবহ করবার জন্য বা ভারাক্রান্ত দর্শকমনকে আনন্দ বিরতি (Dramatic Relief). নীতি উপদেশ প্রভৃতি দেবার জন্যও গানের ব্যবহার হয়ে থাকে।

কিন্তু 'নবান্ন' গণনাট্য সংঘের পতাকা নিয়ে এমন একটি সময় ও চেতনাকে প্রকাশ করবার দায়িত্ব নিয়েছে, সেখানে প্রতিপাদ্য বিষয়টি মুখ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও জাপানী আক্রমণ, ৪২-এর আন্দোলনে উত্তাল এ দেশ, মারী-মন্বন্তর ও জলোচ্ছ্বাস, সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা স্বভাবত নাট্যকারের শিল্পবোধ ও সংযম গানের বাহুল্যকে পরিহার করতে সচেষ্ট হয়েছে। নাটকটি সমস্যাকণ্টকাকীর্ণ বৃহত্তর জনসমাজ ও দেশের নানা ঘটনার সামগ্রিক রুপ ফুটিয়ে তোলায় এতই নিবেদিত যে, প্রথম তিনটি অঙ্কের বারটি দৃশ্যে সঙ্গীতের ব্যবহারের সুযোগই ছিলনা। যুদ্ধের জন্য গ্রামীন অর্থনীতিতে বিপর্যয়ের জন্য সমাদ্দার পরিবার গ্রাম জীবন থেকে মন্বন্তর কবলিত শহরে আশ্রয় নিয়ে তার সঙ্কট ও আবর্তে বিব্রত ও হৃতসর্বস্ব হয়ে পরিশেষে ঘরে ফিরেছে। এর পরই একটু স্থিত হবার অবকাশ। বিজন ভট্টাচার্য কতকটা সমাদ্দারদের এই মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে ব্যঞ্জনাময় করবার জন্য এবং বোধকরি কতকটা দর্শক চিত্র রঞ্জনের জন্য, চতুর্থ অঙ্কের তিনটি দৃশ্যেই গান সংযোজন করেছেন।

প্রথম দৃশ্যে নিরঞ্জনের গান 'বড় জ্বালা বিষম জ্বালা' দ্বিতীয় দৃশ্যে জনৈক ফকিরের গান 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' এবং তৃতীয় দৃশ্যে কৃষক রমণীদের গান 'নিস্‌লো চেয়ে সামনের হাটে গলার হাসলি।'

সুধী প্রধান লিখেছেন, মুদ্রিত সংস্করণের ১৫ টি দৃশ্যের পরিবর্তে মোট ১৪ দৃশ্যে নাটক অভিনীত হত। ফকিরের গানটি মূল দৃশ্যকে প্রায় সব বাদ দিয়ে চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কৃষকদের সভাশেষে এবং কুঞ্জ রাধিকার ঘরে ফেরার আগে গাওয়া হত। নিরঞ্জনের গান 'বড় জ্বালা বিষম জ্বালা'— কোনদিনই গাওয়া হয়নি। এমনকি শেষ দৃশ্যে কৃষক মহিলাদের গান দু'একদিন গাওয়া হলেও পরে পরিত্যক্ত হয়।

উপরোক্ত তথ্যগুলি থেকে এটি স্পষ্ট যে, অভিনয়কালে 'আপনি বাঁচলে' গানটি ছাড়া অন্য দুটি গানের

নাট্যোপযোগিতা বস্তুত স্বীকৃত হয়নি।

গণনাট্য আন্দোলন তাঁর অন্যান্য প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শের উদ্বোধনে দায়বদ্ধ। নাটকের প্রথম অঙ্কত্রয়ে ঘটনার ঘনঘটায় এ বক্তব্যটি তুলে ধরা সম্ভবপর হয়নি। চতুর্থ অঙ্কের শান্ত স্নিগ্ধ শান্তির পরিবেশে ফকিরের গান হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত চাষী ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছে। 'হিন্দু-মুসলিম যতেক চাষী দোস্তালি পাতান। ফকির বলে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ভিন্ন আর উপায় নাই সার বুঝ সবে।' বহুদর্শী ফকির আকালের, মন্বন্তরের সীমাহীন দুর্দশার অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেয়েছে—'বাঁচিবারে যদি চাও মনে আনো বল' এবং ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে গাঁতায় খেটে আমন-ফসল ঘরে তোলবার পরামর্শ দিয়েছে।

এই অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে গাঁতায় খাটার এবং দ্বিতীয় দৃশ্যে ধর্মগোলায় ফসল তোলার যে সঙ্কল্প ঘোষিত হয়েছে, তাকেই ফকির তার গানের মধ্য দিয়ে সকলের মনের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছে। গানটি আপাতদৃষ্টিতে উপদেশাত্মক মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে গানটির ব্যবহার এখানে নাটকের যে লক্ষ্য—ঐক্য ও সংহতি এবং সমস্ত প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ রচনা করা তারই ভূমিকা। এদিক থেকে এটি অনেকটা নাট্যোপযোগী।

নিরঞ্জন ও কৃষক রমণীদের গানদুটি সুখী তৃপ্ত গৃহস্থ জীবনের স্মৃতি-বিস্মৃতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি।

যুদ্ধ আন্দোলন মারী মন্বন্তরে বিধ্বস্ত গ্রাম আজ নতুন জীবনের স্বপ্নে বিভোর, কিন্তু পুরনো দিনগুলো স্মৃতিকে ভাবাতুর করে বইটি! কিন্তু দুঃখের দহন জ্বালার মধ্য দিয়ে তো সুখের আসন প্রতিষ্ঠা এ কথাই তো বিজ্ঞজনেরা বলেন। নিরঞ্জন শুয়ে অবকাশ যাপনের সময় গানের মধ্য দিয়ে স্মৃতিবিজড়িত অতীত স্মরণের মধ্য দিয়ে একটি সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করছে, দেখা যায়। গানটি কথার সীমা অতিক্রম করে সুরের মধ্য দিয়ে তার স্বজন হারানোর বেদনাভারটিকে পাঠকের অনুভূতির গভীরে পৌঁছে দেয়। এর পরই কুঞ্জ রাধিকার প্রবেশ যেন—হারিয়ে পাওয়ার সুগভীর আনন্দে পরিপূর্ণতা এনে দিয়েছে।

কৃষক রমণীদের গান গ্রাম্য মেলার পরিবেশে উপস্থাপিত। মেলারব, আনন্দ-উচ্ছ্বাসের স্বপ্নরঙিন জীবনের আকাঙ্ক্ষা এর মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। সঙ্কটাবসানে জনমানসের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরবার পক্ষে গানটির তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা আছে। মূল পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মেলার আনন্দ-উজ্জ্বল পরিচয় তুলে ধরবার ক্ষেত্রে গানটি যথেষ্ট আনুকূল্য করেছে।

নাটকের গান তিনটির একটি মাত্র কার্যত অভিনয়কালে গীত হলেও, কোনটিই নাটকের ভাবরসের সঙ্গে সঙ্গতিহীন তো নয়ই বরং নাটকের অভিপ্রায়ের পরিপূরক।

৮৭.১৩ সারাংশ

নাটকে কাহিনীর পর চরিত্রের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশ্চাত্য বিশেষত গ্রীক নাটকে কাহিনীর প্রাধান্য ছিল, সেক্সপীয়রের নাটকে চরিত্রের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হয়। কিন্তু চল্লিশের দশকে গণনাট্য

আন্দোলনের নাটকে ব্যক্তি নয়, সমষ্টির প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। আর সামগ্রিক অভিনয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়। 'নবান্ন' নাটকে ছোট-বড় চরিত্রের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ। চরিত্রসংখ্যা থেকে বোঝা যায় যে নাটকের বিষয়বস্তুর ব্যাপকতাই হয়তো এর জন্য দায়ী। একই সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালের সঙ্কট, আগস্ট আন্দোলন, বন্যা, দুর্ভিক্ষ-মহামারীর বিশাল ক্যানভাসে গ্রাম-শহরের বিপর্যস্ত চেহারা। এ সময় বিপর্যয় ঘটেছে মানুষের মূল্যবোধে, সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, দেশে অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত, এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে গেলে বিস্তৃতের ক্ষেত্র ও চরিত্র সংখ্যা বৃদ্ধি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু এরা জনতার ভূমিকা নেয়নি। জনতায় অনেকগুলি মুখের সমাবেশ থাকে, অথচ তাদের চরিত্র এক ও অভিন্ন। এখানে তা ঘটেনি।

গুরুত্ব অনুসারে 'নবান্ন'-এর চরিত্রগুলো হল—প্রধান সমাদ্দার, কুঞ্জ, রাধিকা, নিরঞ্জন, বিনোদিনী, পঞ্চাননী ও দয়াল এবং হারু দত্ত, কালীধন ধাড়া ও রাজীব। অন্যান্য চরিত্রগুলো নেহাৎই গৌণ— ক্ষণকালের জন্য এসে তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্বটুকু পালন করেছে মাত্র।

প্রধান সমাদ্দার প্রথম দৃশ্যেই দর্শকের সামনে উপস্থিত হয়েছে। তখন থেকেই তাকে দ্বন্দ্বময়, মর্মজ্বালায় জর্জরিত দেখা যায়। সূচনাতেই যখন দেখা যায় কুঞ্জ নিরঞ্জন আর পঞ্চাননী অবস্থার প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট প্রত্যয় জ্ঞাপন করে— প্রথমোক্তরা অসম শক্তি বিন্যাসের কারণে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে পালিয়ে যেতে বলে, পঞ্চাননী সেখানে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দেয়। এই দুই স্বতন্ত্র মতের কারণে দ্বিধাগ্রস্ত প্রধান প্রতিরোধের কথা বলে — 'কুঞ্জ, ও কুঞ্জ, আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ।.....আমি প্রাণ দেব। এর পেছনে সক্রিয় ছিল তার পুত্রশোক— শ্রীপতি ভূপতিকে পুলিশ-মিলিটারির আক্রমণে সে হারিয়েছে। এ যেন হত্যা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ । প্রধান ক্ষোভে বলেছে 'জন্তু জানোয়ারের মত বনে জঙ্গলে পালিয়ে' বাঁচতে চায় না।

প্রধান দুটি সন্তান হারাবার পর স্ত্রী পঞ্চাননীকে সম্বল করে বাকী জীবন কাটিয়ে দিতে পারত, কিন্তু সে-ও পুলিশের নির্মম অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। ওদিকে প্রকৃতি কেড়ে নিয়েছে তার সমস্ত সম্পদ। প্রলয়ঙ্কর ঝড়, সর্বনাশা বন্যা সঙ্গে নিয়ে এসেছে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর। প্রধানের স্বপ্নের শেষ স্মৃতিটুকুও মুছে গেল। তাকেও পথে নামতে হল। বস্তুতপক্ষে নাটকে শারীরিক ও মানসিক আঘাত তার ওপরই বেশি করে নেমেছে। একের পর কে দুর্ঘটনায় প্রধান তার মস্তিষ্কের ভারসাম্য অনেকটা হারিয়ে ফেলে।

এই প্রধানকেই আবার যখন দেখি একদিকে হারু দত্ত, তার বাড়িতে এসে জমি কিনতে চায়, প্রত্যাখ্যাত হয়ে ক্রুদ্ধ হারু গালাগাল দেয়, কুঞ্জ প্রতিবাদ করলে হারুর লাঠিয়ালারা কুঞ্জ ও প্রধানের মাথায় আঘাত করে। অপরদিকে প্রধানের চোখের সামনেই শক্তিহীন মাখনের মৃত্যু হয়, তখন কিন্তু প্রধান কান্নায় ভেঙে না পরে বলে, 'মাখন চলে গেলি'— তখন বোঝা যায় এ বেদনার ভার বড় কঠিন, এর হাত থেকে নিস্তার নেই।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই প্রধান-ই এক সময় ছিল গ্রামের মাথা, নানা প্রতিকূলতায় পথের ভিখারি। তথাপি তার সম্বিত একেবারে হারায়নি। ফটোগ্রাফার তার বাড়ি জানতে চাইলে সে উত্তর দেয়, '.....এ-এ চিনতে পারবেন!' কঙ্কালসার দেহের ছবি তুলছে দেখে বলে, 'তা ভালো,..... কঙ্কালের ছবির ব্যবসা! '— এ থেকে তার বোধের মধ্যে যে একটা আলো-আঁধারির পরিবর্তন কাজ করছে তা বোঝা যায়। অপর এক দৃশ্যে যখন দেখি এই প্রধান উৎসব বাড়িতে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য সামান্য ভাত চেয়েও তা পাচ্ছে না,

তখন ধিক্কার দিয়ে বলে, 'তোমারা কি সব বধির হয়ে গেছ বাবু। .....অন্তর কি সব তোমাদের পাষাণ হয়ে গেছে বাবু!' তখন মনে হয় প্রধান সম্ভবত আবার বাস্তবে ফিরে এসেছে। আবার চিকিৎসা কেন্দ্রে ব্যথার কথা বলতে গিয়ে অনেক গিয়ে অনেক অসংলগ্ন কথা বলেছে, যা থেকে তাকে অনেকটা অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। নাটকের শেষে গ্রামে ফেরার পর মনে হয়, তার প্রায়ান্ধকার চৈতন্য, পরিচিত পরিবেশ হারিয়ে আবার ফিরে পায়। বলে, 'ভালো, ভালো, নবান্ন ভালো।' দয়াল যখন বলে, 'জোর প্রতিরোধ এবার,' প্রধানও উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে উঠে 'দয়াল'।

এই আলোচনা থেকে স্পষ্টত এটি উপলব্ধির বিষয় যে, প্রকৃত অর্থে 'নবান্নে' কোনো নায়ক না থাকলেও প্রধান সমাদ্দারই এ নাটকের মুখ্য চরিত্র। মূলত তার সার্বিক জীবন যন্ত্রণা (sufferings)....এ নাটকে প্রধানতম ঘটনা। সে এক সময় গ্রামে সম্পদে প্রতিষ্ঠায় মর্যাদায় শীর্ষস্থানে ছিল। ভাইপো, পাড়া প্রতিবেশী সকলেই তাকে মনত। কিন্তু দুর্ভিক্ষ ও সমাজ শোষণ তাকে সর্বতোভাবে রিক্ত করেছে। দুই ছেলেকে হারিয়ে, তিন মরাই ধান পুড়িয়ে, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় দুর্বল একমাত্র বংশধর মাখনকে হারিয়ে, অভাবের তাড়নায় জমি আংশিক বিক্রি করে, সে প্রায় সর্বস্ব খুইয়েছে। বাস্তু ছেড়ে শহরে গিয়ে ক্ষুধার অন্ন সন্ধান করতে বাধ্য হয়েছে—এর চাইতে দুর্বিষহ জীবন যন্ত্রণা আর কি হতে পারে। সমাজের সংসারের মর্যাদার আসন থেকে এই চরম বিপর্যয় ও পতন, তার মত এমন তীব্র শোক, এ নাটকের কোনো চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এদিক থেকে প্রধান সমাদ্দার এ নাটকের অবিসংবাদী মুখ্য চরিত্রের মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী।

কুঞ্জ চরিত্রের মধ্যে তারুণ্যের তাজা রক্ত মস্তিষ্কের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় একটা ভারসাম্য বজায় রেখেছে। সে বোঝে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী শাসকদের শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়া মানে হঠকারিতা, অকারণ জান দিয়ে কোনো লাভ নেই। এই কুঞ্জই আবার হারু দত্তের চক্রান্তের শিকার প্রধান সমাদ্দারকে জমি বিক্রি করতে বাধা দিয়ে হারুর ক্রোধের কারণ হয়েছে।

কুঞ্জ কোনো দৈব নয়, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী। সে দেখেছে, মনুষ্যসৃষ্ট সন্ত্রাস, তারা প্রাণ নিয়েছে, মানুষের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। দেখেছে প্রকৃতির ভয়ঙ্কর রূপ, বন্যা মানুষের আশ্রয় এবং অন্ন কেড়ে নিয়ে তাদের দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কবলে ঠেলে দিয়েছে। তাই সে আর ভাগ্য—ভগবানে নয়, মানুষের নিজের ভেতর যে শক্তি রয়েছে, তার ওপর তার আস্থা সবচেয়ে বেশি।

কুঞ্জ গার্হস্থ্য জীবনযাত্রার মূর্ত প্রতীক। স্ত্রী পুত্র, ভাই ও ভ্রাতৃবধূ ও জ্যেষ্ঠতাত নিয়ে তার চাষাড়ে সাম্রাজ্য। এ সাম্রাজ্যের প্রধান সম্পদ জমি,—তার অপ্রতুলতা অভাব দূর করতে পারেনা। সৃষ্টি হয় মতানৈক্য। অনিবার্য হয় ছোটখাট ঝগড়া বিবাদ। এর ফলে সহধর্মিনীর সঙ্গে কদাচিৎ মতদ্বৈত হলেও পরিবারের অন্যদের জন্য স্নেহ মমতার অন্ত নেই। এই প্রীতিপূর্ণ বন্ধন স্পৃহা কুঞ্জ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

কুঞ্জ নিজের সংসারের ঝড়-ঝাপটা সামলায়, শুধু তাই নয়, প্রতিবেশীদের জন্যও তার হৃদয়ে দুর্বল স্থান আছে। নিজের পরিবারের জন্য ঘটি বাটি বিক্রি করে দুমুঠো চাল কিনে এনে যখন শোনে দয়ালের কুটোটির ব্যবস্থা নেই, তখন তার শেষ সম্বল থেকে খানিকটা দিয়ে তৃপ্তি বোধ করে। সে বুঝতে পারে গ্রামজীবনে একটি অনিবার্য সঙ্কট নেমে আসছে, তাকে অবিচলিতভাবে গ্রহণ করতে হবে। আর পাঁচজনের যা হবে, তারও তাই ঘটবে। সেই বাস্তব পরিস্থিতিতে গ্রামের মাটি থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে তারাও শহরের ফুটপাতে নেমে

এসেছে। পশুর সঙ্গে খাদ্য কাড়াকাড়ি করে খেতে হলেও ক্ষতবিক্ষত কুঞ্জ হার মানেনি, জীবন সম্পর্কে বিতৃষ্ণা হয়নি, অবসাদগ্রস্ত হয়ে পিছু হটেনি। বরং জীবনকে আরও গভীরভাবে আঁকড়ে ধরেছে, স্ত্রীর প্রতি মমতা, অজস্র ধারায় ঝরে পড়েছে। গভীর প্রেমে 'কুঞ্জ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রাধিকার দিকে; তারপর হাতখানা তুলে দেয় রাধিকার মাথার ওপর। তৈরি হয় প্রেমের বিরল মুহূর্ত। তারা অবশেষে আমিনপুরে ফিরে আসে এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে যে সব ঠিক হয়ে যাবে এবং যায়-ও।

নিরঞ্জন অপেক্ষাকৃত গৌণ চরিত্র হলেও দুটি কারণে তার গুরুত্ব মানতে হবে। সে পরিবারের পাঁচজনের সঙ্গে দুঃখ ভাগ করে নিতে না পারলেও গ্রামের চোরাব্যবসায়ী ও মেয়ে পাচারকারী হারু দত্ত এবং কালোবাজারী ও সেবাশ্রমের নামে নারীদেহের ব্যবসাদার কালীধন ধাড়াকে বামাল সমেত ধরিয়ে দেবার দুঃসাহস দেখিয়েছে। সে স্ত্রী বিনোদিনীকে কালীধনের সেবাশ্রমে ফিরে পেয়ে গ্রামে নিয়ে ভাঙা সংসার গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। কুঞ্জ রাধিকা পুনরায় সেখানে গিয়ে আশ্বস্ত হয়েছে। প্রধান তার বিপন্ন চৈতন্যকে ফিরে পেয়েছে।

নবান্নের দুটি খলচরিত্র হারু দত্ত ও কালীধন ধাড়া। এরা মানুষের জীবনধারণের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য নিয়ে কালোবাজারী মজুতদারী করে। নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য এরা পারেনা এমন কোনো কাজ নেই। ধান-চালের মত নিজ গাঁয়ের মেয়ে পাচার করতেও এদের দ্বিধা হয়না। এই হারুই প্রধান সমাদ্দারকে টাকার লোভানি দিয়ে সস্তায় জমি কিনে নিতে চায়। বাধা পেলে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত আক্রমণ করতেও তার বাধেনা। পাচারের জন্য মেয়ে কিনতে সে খুকির মা-র মত দালাল ধরে, সেই সঙ্গে নিজেও অক্টোপাসের মত মেয়ের বাপকে ঘিরেধরে কামড় বসায়। হারু দত্ত শঠ, প্রবঞ্চক, প্রতারক, ধূর্ত ও জালিয়াত। হেন কাজ নেই যা সে পারেনা। নাট্যকার অত্যন্ত সতর্কভাবে চরিত্রটিকে গড়েছেন বলে সে হয়ে উঠেছে জীবন্ত।

কালীধন সে তুলনায় অপেক্ষাকৃত দুর্বলভাবে চিত্রিত। তার অর্থ প্রাচুর্য ছিল, ছিল না দূরদর্শিতা। ভারতরক্ষা আইনের বিধান অমান্য করে প্রচুর চাল গুদামজাত করে রেখেছে, তার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করেনি। ফলে নিরঞ্জন-বিনোদিনীর জালে জড়িয়ে পরে ভরাডুবি ঘটল। এদিক থেকে রাজীব স্বল্প পরিসরে কয়েকটি তুলির টানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সংলাপ উপকরণ ক্ষুরধার ব্যঙ্গ, ক্ষুধার্ত মানুষ সম্পর্কে তার মন্তব্য, 'দুর্ভিক্ষের কাঙালি যত সব বা 'দুর্ভিক্ষের পোকামাকড় সব' তীব্র, তীক্ষ্ণ ও মর্মবিদারী।

নবান্নের স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে পঞ্চাননী, মাতঙ্গিনী হাজরার আদলে পরিকল্পিত। প্রধান সমাদ্দারের স্ত্রী সে। তার চারিত্রিক দৃঢ়তা মর্যদাবোধ উল্লেখযোগ্য। আগস্ট আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য শাসক শ্রেণির অত্যাচারের ভয়ে যখন সাধারণ গ্রামবাসী বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিচ্ছে তখন তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর থেকে শোনা যায়—'তোদের এই অক্ষমতার জন্যে মেয়েমানুষ কেন সহ্য করতে যাবে এই দুর্ভোগ? .....সব চাইতে বড়ো কথা ইজ্জৎ!!' পুলিশের মার খেয়ে মানুষ যখন পালাচ্ছে, পঞ্চাননী তাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন—এগিয়ে যা বলছি, এগিয়ে যা। পঞ্চাননী নিজেও এভাবে শহীদের মৃত্যুবরণ করেছে।

বিনোদিনী সুসংগত, সংযত এক গ্রামবধূর চরিত্র। সে পরিবারের সকলের সঙ্গে দুঃখ যন্ত্রণা ভাগ করে নিয়েছে। ঘটনাচক্রে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে কালীধনের সেবাশ্রমে

নিয়ে যায় এক টাউট। সেখানে আকস্মিকভাবে নিরঞ্জনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ। উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় দুষ্কৃতিরা ধরা পড়ে। নিরঞ্জন বিনোদিনীকে নিয়ে গ্রামে ফিরে আসে, তারা আমিনপুরের বিধ্বস্ত সংসারকে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়।

রাধিকা এ নাটকের প্রধান স্ত্রী চরিত্র। কুঞ্জর স্ত্রী, সমাদ্দার পরিবারের জ্যেষ্ঠ বধূর একটি সন্তানের জননী। জ্যেষ্ঠ বধূ হিসেবে সকলকে নিয়ে চলবার মানসিকতা সম্পন্ন ও দায়িত্বশীলা গৃহবধূ। অভাবের সংসারে মাঝে মধ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও, দুঃখের সংসারকে সুখের করে তোলবার ঐকান্তিক আগ্রহের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যখন তারা ফুটপাথবাসিনী, ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহে বিপন্ন বোধ করেছে, তখনও তার অন্তরের প্রেম শুকিয়ে যায়নি, বরং এই দুর্দিনে তার স্বামী-প্রেম আরও অনেক গভীর হয়ে উঠেছে। (দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য)।

তার চৈতন্যের গভীর থেকে এ প্রেম নিঃসৃত—তা তার কথা থেকে বোঝা যায়—'খুব যন্ত্রনা হচ্ছে, না! জল এনে দেব, জল? একটু জল খাবে?'—এভাবেই নতুন করে তারা দুজনে দুজনের প্রেমের স্বাদ নতুন করে অনুভব করেছে। পরিশেষে, এই প্রেমই তাঁদের গ্রামে ফিরে নতুন করে ঘর বাঁধবার স্বপ্নকে উজ্জীবিত করে। সে মুহূর্তে, তাঁর মৃত পুত্রের জন্য প্রাণ হাহাকার করে উঠলেও, তার সামলে নিয়ে এসে নতুন করে সব কিছু গড়বার আনন্দে মেতে ওঠে। নাটকের দর্শক/পাঠক প্রথম রাধিকাকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করে। রাধিকা 'নবান্ন' নাটকের একটি স্মরণীয় চরিত্র।

সংলাপ এক অর্থে নাটকের 'প্রাণ-ভোমরা'। সংলাপের মাধ্যমে নাট্যকার নাটকের বিষয়বস্তু বর্ণনা, নাটকীয় দ্বন্দ্বের উপস্থাপনা, নাটকের বৃত্ত গঠন, চরিত্র বিকাশ ও বিশ্লেষণ করে থাকেন। আবার এই সংলাপের মধ্যেই একাধারে নিহিত থাকে বাচিক অভিনয়ের উপকরণ, অপরদিকে অঙ্গাভিনয়ের অনেক অনুল্লেখিত নির্দেশ। সংলাপে ভাষা তাই নাটকীয় চরিত্রের ভাব, ভাবনা প্রকাশোক্ষম হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কালের ব্যবধানে বক্তব্য পস্থাপনা রীতিরও যুগে যুগে বিবর্তন ঘটেছে। প্রাকরবীন্দ্র, রবীন্দ্র-উত্তর, রবীন্দ্রযুগে নাটকের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি বদলেছে। চল্লিশের দশকে গণ-নাট্যের নাটকে সংলাপ এবং ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি বলা যায় আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এ সময় সংলাপ হয়ে উঠেছে অনেকটা প্রত্যক্ষ জীবন থেকে উৎসারিত—রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের জীবন্ত ভাষা। যেমন—

প্রধান। চল তো গাঙ বরাবর এগিয়ে গিয়ে বেড় দিয়ে ফেলি গে ওদের, ডাক সব ওদের কুঞ্জ।

কুঞ্জ। না না না, তা হয় না, ... চলো পালাই।

প্রধান। পালাব, পালাতে বলছিস তুই!

কুঞ্জ। আ—া—হা—া, তা খামখা জান দিয়ে কি কোনো লাভ আছে? (১/১)

এই সংলাপ স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক, বাস্তবধর্মী ও জীবন্ত। এর ভাষা মেদবিহীন, বহুবর্ণরঞ্জিত, মাটিঘেঁষা। আবার—

পঞ্চাননী। আমিনপুরের কলঙ্ক, আমিনপুরের কলঙ্ক তোরা সব, তাই পেছু হটছিস। পেছোসনি, এগিয়ে যা। এগিয়ে যা তোরা সব, এগিয়ে যা।

নেপথ্যে বাঁশ ফাটার বিরামহীন শব্দ। পঞ্চাননী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে (ক্ষীণকণ্ঠে) এগিয়ে যা, এগিয়ে

যা তোরা সব....

পঞ্চাননীর এই বাচিক ও আঙ্গিক সংলাপ চল্লিশের দশকে নবান্ন নাটকের মাধ্যমে মানুষের মনে প্রতিরোধের স্পৃহা সঞ্চার করে দেওয়া অগ্নিগর্ভ বাণী। এ সংলাপ নাট্যকারের সাধারণ সংলাপ নয়—প্রতিবাদী চরিত্রের। এ চরিত্র নাট্যকার সৃষ্ট বলা ভুল হবে, বরং বলা ভালো আগস্ট আন্দোলনের ঝঞ্ঝাবর্তে বিপ্লবী ভাবাদর্শে গড়ে ওঠা মানুষের। সেই সঙ্গে বলা যায়, দুর্যোগে ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা মন্বন্তর মারীজনিত দুর্ভোগের প্রতিক্রিয়ায় ব্যতিব্যস্ত বিপন্ন মানুষ, পুলিশ প্রশাসন, চোরাকারবারীদের অত্যাচারে অসহায় গ্রামবাসী, সেই সঙ্গে যুদ্ধের আক্রমণে দিশেহারা জীবন্ত মানুষগুলির এ হল প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর। আবার যখন শুনি 'জানি জানি, ওপরের দিকে হাত দ্যাখাবে, তা জানি। তা সে বিশ্বাস ভেঙে গেছে; ওতে আর ভয় করি নে।' (কুঞ্জ ১/৫) অথবা 'টাকার লোভানি দিয়ে দেশশুদ্ধ, লোকের ধানগুলো সব নিয়ে গেছে এর আগে, এখন আবার জমি ধরে টান মারতে এয়েচে। ও জমি বিক্রি হবে না বলে দ্যাও।' (কুঞ্জ ১/৫)—প্রথমটিতে বক্তার অদৃষ্টবাদ নয়, সুদৃঢ় বাস্তববোধের পরিচয় যেমন ফুটেছে, তেমনি শেষোক্ত সংলাপে যেন উঠে এসেছে সত্যকথনের দৃঢ় প্রত্যয়ের অন্তস্থল থেকে। এসব সংলাপের শব্দগুলো নাট্যকারের বানানো কথা নয়, গ্রাম বাংলার কৃষক মজুরের ঘরকন্না, মাঠঘাট, পথ-প্রান্তর থেকে উঠে আসা। শহুরে বিত্তমান মানুষের ভাষা থেকে এ সংলাপ একেবারেই স্বতন্ত্র।

তাই বলা যায় 'নবান্ন' নাটকের সংলাপ গণজীবন থেকে পাওয়া যথার্থ অর্থে গণনাট্যের সংলাপ। গণনাটকের প্রধান উদ্দেশ্য যদি হয় নাটকের বিষয়বস্তু ও তার বক্তব্যকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া, তার সংলাপের ভাষাও সাধারণ মানুষের বোধগম্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। 'নবান্ন' এদিক থেকে যথেষ্ট সফল।

নাটকে গানের ব্যবহার নানা কারণে হয়ে থাকে। অনেকে মনে করেন, যাত্রা নাটগীতের সঙ্গে বাংলা নাটকের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকায়, নাটকের গঠনের ব্যবহার জন্মসূত্রেই এসে গেছে। তাই গানের একচ্ছত্র আধিপত্য বাংলা নাটকে বাস্তব ঘটনা নয়। কিন্তু যেহেতু প্রাগাধুনিক বাঙলার লোকজীবন যাত্রা প্রভাবিত ছিল, তাই জনজীবনে, সেই সূত্রে সংগীতের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপীয় আদর্শে বাংলা নাটক রচনার আগ্রহ দেখা দেয়। এক্ষেত্রে সংস্কৃত নাটক ও বাঙালির যাত্রার সংস্কার সর্বত্র কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। ফলে গান এক্ষেত্রে অপরিহার্য গণ্য হয়েছে। নাটক, বস্তুত জীবনাশ্রয়ী, বাস্তব জীবনের কথা বলা, তার প্রধান দায় হলেও, এই জীবনে বিনোদনের একটি ভূমিকা আছে, আছে, তাই সঙ্গীত—কণ্ঠ ও বাদ্যযুক্ত হওয়া অসঙ্গত নয়। কিন্তু সঙ্গীত যদি নাট্য বিষয়কে আচ্ছন্ন করে, তবে নাটকের মৌল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য। ব্যবসায়িক থিয়েটারের নাটকে নাচ-গানের বাহুল্য অনেক ক্ষেত্রেই পীড়াদায়ক। নাচগান এখানে পণ্য। দর্শক মনোরঞ্জনের মাধ্যমে ব্যবসায়িক সাফল্য তার প্রধান লক্ষ্য। গ্রিক নাটক বা সেক্সপীয়রের নাটকেও গানের ব্যবহার আছে। গান সেখানে নাট্যবোধ সঞ্চারে যেমন সহায়ক, তেমনি ঘাত-প্রতিঘাত দ্বন্দ্বমুখ্য নাটকে বিশেষ ভাব-রস সঞ্চারের প্রয়োজনে, কখনও কখনও গানের ব্যবহার করা হয়েছে। গানের ব্যবহার এ ক্ষেত্রে নাট্য প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

'নবান্ন' গণনাট্য সংঘের পতাকাতলে একটি সময় ও চেতনাকে প্রকাশ করবার দায়িত্ব পালন করেছে। সেখানে গান মুখ্য বিষয় নয়—মুখ্য তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তাই বিশ্বযুদ্ধ, আগস্ট আন্দোলন, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, মারী, মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা এ নাটকের প্রেরণা, সেখানে মনোরঞ্জক গান প্রধান বিষয় হতে পারেনা। তাই পনের দৃশ্যের নাটকের প্রথম বারোটি দৃশ্যে গানের ব্যবহার নেই। এ নাটকে যে তিনটি গান রয়েছে—তাও নাটকের শেষে চতুর্থ অঙ্কের সমস্যাজর্জরিত মানুষ নতুন ফসল চোখের সামনে দেখে স্বস্তি ও আনন্দের আশ্বাস নিয়ে যখন শহর থেকে একে একে ঘরে ফিরছে, তখন তাদের কণ্ঠে গান উঠে এসেছে। প্রথম দৃশ্যেই ঘরে ফিরে নিরঞ্জন 'ঘরখানা জুড়েতেড়ে' নিয়ে গ্রামের সকলের সঙ্গে আলাপচারিতার পর দাওয়ার ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে গান ধরেছে—'বড়ো জ্বালা বিষম জ্বালায় পুড়ে হব সোনা'। (৪/১) দ্বিতীয় দৃশ্যে জনৈক পথিকের গান—'আপনি বাঁচলে তো বাপের নাম মিথ্যা সে বয়ান/হিন্দু মুসলিম যতেক চাষী দোস্তালি পাতান।' ধর্ম ও সম্প্রীতির গান গণনাট্যের বক্তব্যকেই তুলে ধরেছে। তৃতীয় দৃশ্যে 'নবান্ন' উৎসবের মাতোয়ারা কৃষক রমণীর গান—'নিসলো চেয়ে সামনের হাটে গলার হাঁসুলি।' প্রভৃতি বিষয়ানুগ ও সবিশেষ তাৎপর্যবহ।

৮৭.১৪ অনুশীলনী ৩

১। **সঠিক উত্তরে (✓) টিক চিহ্ন দিন :**
(ক) 'নবান্ন' নাটকের চরিত্র সংখ্যা — ১০/১৮/২৪/৪৫
(খ) 'নবান্ন' নাটকের মুখ্য পুরুষ চরিত্র — কুঞ্জ/প্রধান/নিরঞ্জন।
(গ) 'নবান্ন' নাটকের মুখ্য নারী চরিত্র — পঞ্চাননী/বিনোদনী/রাধিকা।

২। **নিচে উল্লিখিত চরিত্রগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন :**
রাজীব, দয়াল, মণ্ডল, নির্মলবাবু, বরকত, যুধিষ্ঠির।

৩। "তা ও বেঁচে থাক বাবা ব্ল্যাক মার্কেট, বেঁচে থাক আমার মজুতদার, না হয় চতুর্গুণই পয়সা নেবে, জিনিসটি তো ঠিক ঠিক পাওয়া যাবে।" —বক্তা কে? ব্ল্যাক মার্কেট কী? 'মজুতদার' শব্দটির উৎস কী? কোনো প্রসঙ্গে বক্তা একথা বলেছেন? বক্তার সম্পর্কে আপনার অনুভব সংক্ষেপে লিখুন।

৪। 'নবান্ন' নাটকের নায়ক কে যুক্তিসহ আলোচনা করুন।

৫। "চলে এয়েছে বলেই যে জিনিসটারে চালিয়ে নেবে, ভালমন্দ বিচার পর্যন্ত করবে না, কী রকম ধারা কথা।" —বক্তা কে? কী 'চলে এয়েছে'? বক্তার মনোভাবটি বুঝিয়ে দিন।

৬। 'নবান্ন' নাটকে প্রধান সমাদ্দার / হারু দত্তের নাট্যভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৭। চরিত্র ও পরিবেশ উপযোগী সংলাপ রচনায় নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য অনেকটাই সার্থক। 'নবান্ন' নাটক অবলম্বনে মন্তব্য বিচার করুন।

৮। 'নবান্ন' নাটকের সংলাপের বিশিষ্টতা ও স্বাভাবিকতা উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।

৯। 'নবান্ন' নাটকের সংলাপ 'অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক'—এ মন্তব্যের যাথার্থ বিচার করুন।

১০। 'নবান্ন' নাটকের সঙ্গীতসমূহের নাটকীয় প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১১। "এ পোড়া মাটির দেশে আর থাকব না। চল ফিরে যাই।"—বক্তা কে? কোথায় ফিরে যাওয়ার কথা বলেছে? 'পোড়া মাটির দেশ' বলতে কি বুঝিয়েছেন? এ কথা বলায় বক্তার কী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়?

১২। "তাই ভালো। ভুলে যাও। ভুলে যাও ব্যথার কথা! ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা। ভুলে যাও।" —এই সংলাপ কার? নাটকীয় তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

১৩। "ওরে বাবারে—তা দিতে হবে না। মানুষের মুখের কথায় জানবে চন্দর কোনো মূল্য নেই, একেবারে কিছু দাম নাই—কথা এই বললে, ফুরিয়ে গেল! না কি! করবে যা তা সব কাগজে কলমে। একবার করলে চিরকালের মতো এট্টা ইয়ে হয়ে থাকল!" —কার লেখা, কোন নাটকে, কার উক্তি? প্রসঙ্গটি উল্লেখ করুন। উক্তিটির মধ্যে বক্তার কি চরিত্র-পরিচয় মেলে বুঝিয়ে দিন।

৮৭.১৫ মূলপাঠ ৭ ঃ 'নবান্ন' নাটকের মঞ্চ, আলো, আবহসংগীত ও অন্যান্য নেপথ্য বিধান

মঞ্চ :

এদেশে আধুনিক মঞ্চ বলতে যেটি বোঝায় তা প্রসেনিয়াম মঞ্চ। তার নির্মাণকর্তা লেবেডফ। সেখানে তিনি যে বাংলা নাটকটির অভিনয় করান তার নাম 'কাল্পনিক সংবদল'। এটি এম. জডেল-এর লঘু নাটক 'দি ডিগসাইস্'-এর বঙ্গানুবাদ। তার মঞ্চগঠন পদ্ধতি দেখে আমরা মঞ্চের একটা সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারি। তা হল—তিনদিক ঢাকা সম্মুখ ভাগ খোলা একটি আয়তাকার ক্ষেত্রবিশিষ্ট স্থান যার ওপরটাও ঢাকা এবং মাঝখানটি উঁচু বেদির মতো—তাকে মঞ্চ বলা হয়। এই উঁচু মঞ্চটিকে অভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সাজান হয়। লেবেডফ অভিনয়ে চারুত্ব সম্পাদনের জন্য মঞ্চকলার অভিনবত্ব সৃষ্টিতে আগ্রহী ছিলেন। একাজে তিনি ছিলেন একাধারে স্থপতি, কারুশিল্পী, দৃশপট শিল্পী, সঙ্গীত ও অভিনয় পরিচালক। এক্ষেত্রে তাঁর স্বদেশের মঞ্চ পরিকল্পনা ও মঞ্চশিল্পী ফিয়োডার ভলকভের সম্ভাব্য অনুসরণ ছিল মনে হয়। তথাপি তাঁর দৃশ্যাঙ্কনে বাংলাদেশ ও বাঙালির প্রতিকৃতি প্রাধান্য পেয়েছিল। এর পর বাংলা নাট্যমঞ্চের দৃশ্যসজ্জায় পরিবর্তন আনেন ধর্মদাস সুর। ধর্মদাস ১৮৭২ সালে ৭ই ডিসেম্বরে অভিনীত 'নীলদর্পণ' নাটকের মঞ্চসজ্জার হাতেখড়ি দিয়েছিলেন. এই মঞ্চের পিছনে ছিল কাপড়ের ওপর হাতে আঁকা দৃশ্যপট। এই দৃশ্যপট বা সীনগুলো ওপর থেকে পর পর ঝোলান থাকত। দৃশ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী তোলা নামানো হত সেগুলো। তারপর এই আঁকা সীনগুলির সঙ্গে দুপাশে টরমেন্টার এঁকে তার মধ্যে একটু ডাইমেনসন আনার চেষ্টা হয়েছিল। ক্রমে ওই সব কাপড়ে আঁকা স্থিরচিত্রগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কিছু কিছু আসবাব ব্যবহার করা হত। এরপর ওই স্থির দৃশ্যপটের সঙ্গে যুক্ত করা হল ফ্ল্যাট সীন। কাঠের ফ্রেমের

ওপর টান করে কাপড় লাগিয়ে তার ওপর ছবি আঁকা হত। এর সঙ্গে দুটো ফ্রেম তৈরি করা হত। দুদিক থেকে ঠেলে জুড়ে দিলে একটা দৃশ্যপট হয়ে যেত। একেই বলা হত ঠেলা সীন। আবার দৃশ্য শেষ হয়ে গেলে দুপাশে টেনে নিয়ে যাওয়া হত।

এই অবস্থাকে মেনে নিয়ে মঞ্চে এলো প্যানোরামা পদ্ধতি। কিন্তু ১৮৯৭ সালের আগে নতুন কোনো পদ্ধতি মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে দেখা গেলনা। ১৮৯৭ সালে অমর দত্ত রঙ্গামঞ্চে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন আনলেন। ক্লাসিক থিয়েটারে তাঁর প্রথম প্রযোজনা 'নলদময়ন্তী'। 'নলদময়ন্তী' নাটকের বিজ্ঞাপনের একটুখানি তুলে দিলে আমাদের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে।

"নলদময়ন্তী—Splendid Lotus Scene!

একটি ক্ষুদ্র পদ্মকোরক হইতে দলে দলে অপ্সরীগণ বহির্গত হইয়া পদ্মে পদ্মে দাঁড়াইয়া নৃত্যগীত করিবে।"

এই ক্লাসিক থিয়েটারের আমল থেকে দৃশ্য সজ্জায় কাট আউটের ব্যবহার। সেট সীন, নকল আসবাবপত্রের পরিবর্তে আসল বস্তু দৃশ্যসজ্জায় এসে গেল। যেমন, আসল খাট, আয়না, চেয়াল-টেবিল ইত্যাদি।

মঞ্চ এবং মঞ্চপরিকল্পনায় আমূল পরিবর্তন ঘটালেন শিশির ভাদুড়ী। তিনি নাট্যমঞ্চে দুটি যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটালেন। (১) পাদপ্রদীপ বা ফুটলাইট তুলে দিলেন। (২) উইংস বা পার্শ্বপট নামক কৃত্রিম এবং অস্বাভাবিক প্রবেশ প্রস্থানের পথকে রঙ্গামঞ্চ থেকে চিরকালের জন্য নির্বাসন দিলেন। প্রথমটি সম্পর্কে আমরা নেপথ্যবিধানের অন্যতম অঙ্গ, আলোকসম্পাতের প্রসঙ্গে আলোচনা করব। এখন উইংস বা পার্শ্বপট প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক।

কলকাতায় ইংরেজদের নাট্যাভিনয়ে ব্যবহৃত মঞ্চের অনুসরণে বাংলা রঙ্গামঞ্চে দৃশ্যপট হিসেবে অঙ্কিত পশ্চাৎপট ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। প্রসেনিয়াম মঞ্চে তখন থেকেই উইংসের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। উইংস মঞ্চের দুপাশে থাকত। দুটি উইংস বা পার্শ্বপটের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে শিল্পীরা মঞ্চে আসত এবং প্রস্থান করত। এই ব্যবস্থা যখন দৃশ্য সংস্থাপনায় কাট-আউট দৃশ্য সংবলিত সেট সীনের ব্যবহার চালু হল তখনও প্রচলিত ছিল। কিন্তু শিশিরকুমার ভাদুড়ী দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ বিশিষ্ট ডাইমেনসনাল বা মাত্রাবিশিষ্ট মঞ্চের প্রবর্তন করবার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বপটের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করলেন। তার ফল মঞ্চে শিল্পী পেলেন প্রবেশ প্রস্থানের স্বাভাবিক পথ। মঞ্চ হয়ে উঠল আরো বাস্তব এবং জীবন্ত। বাস্তব এবং জীবন্ত বলা হচ্ছে এই কারণে যে, একটি ঘর দেখান হচ্ছে মঞ্চে নিশ্চয় তার দরজা থাকবে। একটা বাইরের, আর একটা ভেতরে যাওয়ার। শিল্পীরা ডাইমেনশনাল মঞ্চ পেয়ে প্রবেশ ও নিষ্ক্রমনের স্বাভাবিক পথ ব্যবহার করার ফলে মঞ্চ অনেক বেশি বাস্তবঘেঁষা হয়ে উঠল। এছাড়া শিশির ভাদুড়ী মঞ্চে খোলা আকাশ দেখাবার ব্যবস্থাও করেছিলেন, তবে অত্যন্ত জটিল পদ্ধতিতে।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী ডাইমেনশনাল মঞ্চ তৈরি করে মঞ্চ স্থাপত্যে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। তার পূর্ববর্তীকালে প্রচলিত প্রসেনিয়াম মঞ্চকে সাধারণত ফ্লাট মঞ্চ বা সমতল মঞ্চ বলা হয়ে থাকে। এই সমতল চতুষ্কোণ বিশিষ্ট মঞ্চকে একমাত্রিক মঞ্চও বলে যেতে পারে। এই একমাত্রিক বা One dimensional মঞ্চকে

দ্বি-মাত্রিক (two dimensional) বা ত্রি-মাত্রিক (three dimensional) মঞ্চ করা যায়। একসঙ্গে যেখানে দুধরনের বা তিন ধরনের অভিনয় দেখাবার প্রয়োজন সেখানে এইরকম মঞ্চ একান্ত অপরিহার্য। 'নবান্ন' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের যে মঞ্চ পরিকল্পনার নির্দেশ নাট্যকার দিয়েছেন তা দ্বিমাত্রিক মঞ্চ বা two dimensional মঞ্চ পরিকল্পনার ইঙ্গিত দেয়—

> শহরের রাজপথ। পাশেই এক ধনীর আবাসভবন। সামনের ফটক দিয়ে যাচ্ছে সুবেশ পুরুষ ও মহিলারা ঢুকছেন বেরুচ্ছেন। ফটকের ভেতরে ঢুকতে ডাইনে বাঁয়ে সারবন্দী ভেনেস্তা কাঠের চেয়ারগুলোর গা বেয়ে যেন বিজলি বাতির আলো চুঁইয়ে পড়ছে। অন্দরমহল থেকে সানাই-এর সুর কেঁদে কেঁদে উঠছে—আশাবরীর আলাপ চলেছে বিলম্বিত তানে। হাসির লহরী তুলে কলহাস্যমুখর একদল তরুণী যেন এক ঝাঁক প্রজাপতির মতোই উড়ে বেরিয়ে গেল ফটকের ভেতর দিয়ে। ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সপারিষদ বাড়ির বড়োকর্তা। অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করেছেন এই যে আসুন—বসুন।' তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে দশ বারো বৎসরের একটি ফুটফুটে মেয়ে, হাতে তার এককাঁড়ি বেলকুঁড়ির মালা। এই গেল মঞ্চের ডানদিকের ব্যাপার। আর মঞ্চের বাঁ দিকের এক কোণে অর্ধবৃত্তাকারে দেখা যাচ্ছে একটা ডাস্টবিন—অস্পষ্ট। কুঞ্জ ও রাধিকা ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট কলাপাতার স্তূপ ঘেঁটে আহার্য সন্ধান করছে। কিন্তু আলোর অস্পষ্টতার দরুণ ওদের কাউকেই ভালো করে ঠাহর করা যাচ্ছে না।

এই নির্দেশ থেকে two dimensional মঞ্চ স্থাপত্যের ইঙ্গিত বেরিয়ে আসে। শিশিরকুমার ভাদুড়ী 'সীতা' নাটকে প্রথম মঞ্চ স্থাপত্যে এই ধরনের নতুনত্ব সৃজন করেছিলেন। 'সীতা' নাটকের একটি দৃশ্যে দেখাতেন, প্রাসাদ অঙ্গনে উঁচু স্থানে প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা, নিম্নস্থানে জনসাধারণ, সকলের ওপরে অলিন্দে উপস্থিত অন্তঃপুরচারিণীরা, কেউ উপবিষ্ট, কেউ দণ্ডায়মান, কেউ চলমান এবং সকলেই অভিনয়ে রত। কেউ হাবেভাবে, কেউ ভাষায়। স্পষ্টত, ত্রিমাত্রিক মঞ্চ ব্যবস্থার ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 'দিগ্বিজয়ী' নাটকের একটি মঞ্চ পরিকল্পনা এখানে তুলে দেওয়া হল। এই নাটকটি সামগ্রিক প্রয়োগ কুশলতায় বঙ্গারঙ্গামঞ্চে অতুলন। প্রথমে যে তাঁবুর দৃশ্য দেখান হয়েছে তা প্রেক্ষাগৃহকে সচকিত করে তোলে। পুরো মঞ্চ পীঠের আয়তন জোড়া একটি কাঠের ফ্রেমে দরবার, তাঁবুর অনুকরণে ছাপানো কাপড় হুক দিয়ে ঝুলিয়ে অভ্যন্তরভাগ তৈরি করা হয়েছিল। পেছনে প্রবেশপথ এবং তার দুধারে (দর্শনানুপাত) অনুযায়ী অন্যান্য তাঁবুর অংশ তৈরি করা হয়েছিল। তাঁবুর পিছনে মোতায়েন রক্ষীবাহিনী টহল দিচ্ছে। কিংবা, দিল্লীর রাজপথ পিছনে রেখে জুম্মা মসজিদের চত্বরের দৃশ্য—যেখানে সামনে পিছনে অস্থির পদচারণা করতে করতে নাদির শাহ দিল্লী ধ্বংস করেছিলেন। 'কোতল' 'কোতল' বজ্রনিনাদ আর জনতার আর্তকোলাহলের সঙ্গে দিল্লীর অগ্নিদগ্ধ হওয়ার দৃশ্য অবিস্মরণীয়। শ্রীশম্ভু মিত্র বলেছেন, 'দিগ্বিজয়ী' না দেখলে, তিনি 'নবান্ন' নাটকের প্রথম দৃশ্য কল্পনা করতে পারতেন না। এই প্রসঙ্গে 'নবান্ন' নাটকের প্রথম দৃশ্যের মঞ্চ ব্যবস্থায় নাট্যকারের নির্দেশটুকু তুলে দেওয়া হল—

> দিনাবসানে চরাচর আচ্ছন্ন করে দুর্গত পল্লীর বুকে নেমে আসছে রাত্রি। মঞ্চ প্রায়ান্ধকার। সুদূরের পটভূমি রক্তিম। অস্পষ্ট আলোকে কচ্ছপের পিঠের খোলার আকৃতি একটা মালভূমির ওপর ছায়ামূর্তির মতো দু-চারজন লোকের

আনাগোনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই দুটো লোক ত্রস্ত অথচ সন্তর্পণে ঢুকে কী যেন সব ফিসফিসিয়ে বলাবলি করল নিজেদের মধ্যে আবার বেরিয়ে চলে গেল। একটু পরেই আবার এসে ঢুকল যেন আরও কারা। কী সব কথা ফিসফিস করে বলে কয়ে চলে গেল। ছায়ামূর্তিগুলোর হাত-পা নাড়া ও কথা বলার বলিষ্ঠ ধরনে মনে হচ্ছে যেন কী একটা ভীষণ চক্রান্ত চলছে ওদের মধ্যে। হঠাৎ নতুন কোনো কিছুর আহুতি পেয়ে পটভূমিটা আরও রক্তিম হয়ে উঠল; আর ঊর্ধ্বগতি ধূমকুণ্ডলীর সঙ্গে উড়তে লাগল ছাই আর আগুনের ফুলকি। আগুনের আভায় মালভূমির ওপরকার দুটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি এবার সুস্পষ্ট হয়ে উঠল দুচোখের সামনে। কালো চেহারার বলিষ্ঠ দুজন লোক। একজন প্রৌঢ়ত্বের ওপারে পৌঁছেছে : আর একজনের বয়স কম—গোটা ত্রিশ-বত্রিশ। খালি গা, হাঁটু পর্যন্ত কাপড় গোটানো, হাতে গাছলাঠি—শরীরের সমস্ত পেশীগুলো ফুলে উঠেছে উত্তেজনায়।

উপরোক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় শ্রীশম্ভু মিত্র যথার্থ কথা বলেছেন :

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 'সীতা' এবং 'দিগ্বিজয়ী' নাটকে মঞ্চের ওপর যে স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরি হয়েছিল তা আরো বাস্তব আরো সহজ হয়ে এলো ১৯৩৩ সালে। ১৯৩৩ সালে রঙ্গমহলে 'মহানিশা' নাটকে সতু সেন প্রথম রিভলভিং বা ঘূর্ণায়মান মঞ্চ তৈরি করে বক্স-সেটের ব্যবহার করলেন।

এরপর মঞ্চ ব্যবস্থার রীতি আরো সহজ ও সরল হয়ে এলো ১৯৪৪ সালে গণনাট্য সংঘের 'নবান্ন' নাটক প্রয়োজনায়। মঞ্চের ওপর কেবল মাত্র গোটাচারেক চট ঝুলিয়ে দিয়ে তাকেই দৃশ্যানুযায়ী একটু আধটু পরিবর্তন করে ঘর বার দুই দেখান হয়েছিল।

প্রসেনিয়াম দর্শক ও নাট্যাভিনয় ক্ষেত্রে অভিনয়কারী কুশীলবের মধ্যেকার একটা অস্বাভাবিক অবরোধ। সুতরাং এই অবরোধ উঠে গেলে নাটক ও দর্শক এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের স্তরে এসে পৌঁছতে পারবে। এই ব্যবস্থাকে আরো ত্বরান্বিত করেছিল ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। তবে এই কাজে আরো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে আলোকসম্পাতের ব্যবস্থা।

গণনাট্যের যুগে নাট্যকর্মীদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নাটককে জনগণের মধ্যে নিয়ে যাওয়া। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ অত্যাচার নিপীড়ন বঞ্চনার কাহিনী জনসমক্ষে তুলে ধরা এবং যারা তাদের দুঃখ, বেদনা, বঞ্চনার কারণ তাদের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ জানান অর্থাৎ প্রতিবাদের নাটক বা Drama of Protest গড়ে তোলবার ইচ্ছা। শহরাঞ্চলের স্থবির মঞ্চের বাইরে উন্মুক্ত আকাশের তলে, মুক্তাঙ্গনে নাটককে নিয়ে যেতে হবে। তা করতে গেলে আয়েজানবহুল মঞ্চকে হালকা করে ফেলতে হবে। সেই সঙ্গে সমস্ত কিছুকেই সহজ সরলীকরণ করে নিতে হবে। সহজ ও সরলীকৃত হওয়ার প্রবণতা যে রঙ্গমঞ্চের মধ্যে নিহিত আছে, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী তা বুঝেছিলেন, তাই তিনি নাট্যমঞ্চ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে গেছেন। শিশির ভাদুড়ী যে দৃষ্টিভঙ্গিটির আভাস রেখে গিয়েছিলেন, গণনাট্য সংঘের কর্মীরা সেই ইঙ্গিতটুকু অবলম্বন করে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নে সচেষ্ট হলেন। গণনাট্যের নাট্যকর্মীরা চল্লিশের দশকে পেশাদারী নাট্যমঞ্চের বাইরে নাটককে নিয়ে যাওয়ার জন্য গ্রহণ করেছিলেন অগ্রণী ভূমিকা। তার জন্য রঙ্গমঞ্চের প্রচলিত ব্যবস্থাকে ভেঙে সহজ সরল করে নেওয়ার জন্য ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা সুরু করেছিলেন।

গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত 'নবান্ন' নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনার রীতিতেই পরবর্তীকালে বাংলা রঙ্গমঞ্চে

এসেছে 'সাজেসটিভ' মঞ্চ। 'নবান্ন'র হাত ধরে সাজেসটিভ রিয়ালিজমের হাওয়া বাঙলা রঙ্গমঞ্চে এসে বাঙলার পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলিকে নাজেহাল করে তোলবার চেষ্টা চালিয়েছে। আর তার জন্যই মঞ্চ ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে শহরে, গ্রামে যত্রতত্র। এই রীতিতে শুধুমাত্র একটা কালো পর্দার সামনে গুটিকয়েক আসবাব দিয়ে কিংবা তার বদলে কাঠের বাক্স সাজিয়ে সাজেসটিভ সেটে নানা পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে। তার ফলে নাটকের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে, নাটক হয়ে উঠছে মানুষের জীবন সংগ্রামের হাতিয়ার। একাজে অবশ্য আর একটা নেপথ্য বিধান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তার নাম আলোকপাত। পরে সেই আলোকসম্পাতের বিবর্তনের চেহারাটা সুস্পষ্ট করে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে।

মঞ্চ-আলোকসম্পাত—আবহসংগীত :

এখন মঞ্চে আলোকসম্পাত ধ্বনি এবং আবহসংগীত প্রভৃতি নাট্যাভিনয়ের বিশিষ্ট অঙ্গগুলির যথাযথ প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা হয়। 'নবান্ন' নাটকের ক্ষেত্রেও এগুলির ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ধারণার প্রয়োজন আছে। আধুনিক বিচারে এগুলিও নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে গভীরভাবে সম্বন্ধযুক্ত। নাটককে মনোজ্ঞ করে তুলতে, নাটককে রসগ্রাহী করে তুলতে গেলে এদের ভূমিকা অপরিসীম। রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে পশ্চাৎপটে যে আর এক ধরনের অভিনয়, অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে সমান্তরালভাবে চললে নাট্যাভিনয় একটি নিটোল রসরূপ পায়, তার একান্ত ঘনিষ্ট অঙ্গ হল ঐগুলি। 'নবান্ন' নাটককে নিটোলত্ব দান করেছে মঞ্চব্যবস্থা, আলোকসম্পাতের নতুনত্ব এবং আবহসংহীতের অভিনব আয়োজন। অতএব এ সম্পর্কে কিছু জানার দরকার আছে।

নেপথ্যবিধান ও 'নবান্ন' নাটক :

নাট্যাভিনয় বা থিয়েটারের দুটি অংশ : (১) প্রত্যক্ষ অভিনয়, (২) নেপথ্য অভিনয়। নট-নটী অভিনেতা অভিনেত্রীদের সংলাপ ও অঙ্গভঙ্গি সহযোগে অভিনয় মঞ্চে ঘটতে থাকে। আর এই অভিনয়কে মনোজ্ঞ, বাঙ্ময় ব্যঞ্জনাধর্মী এবং অভিনয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে তোলবার জন্য নেপথ্য অভিনয়ের অপরিহার্যতা সর্বজনস্বীকৃত। এই দ্বিতীয় অভিনয় বা নেপথ্য অভিনয়কে নেপথ্যবিধান বলে। নেপথ্যবিধান অভিনয়ের সঙ্গে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ সঙ্গতিসম্পন্ন এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত। উভয়ে সুসঙ্গত সহযোগিতায় নাটকে বাঞ্ছিত রস সৃষ্টি হয়। 'নবান্ন' নাটক শুধু কাহিনীগত গতানুগতিকতার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়নি, মঞ্চ সজ্জায়, আবহসংহীতে এবং আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনয়ন করেছিল, যা গণনাট্য সংঘের এক লক্ষণীয় প্রচেষ্টা। পেশাদার মঞ্চ পরিকল্পনার বাইরে নাটককে গণনাট্যকে রূপান্তরিত করে যে পরিবর্তন সূচিত করেছিল, আজও সেই প্রবাহে পরবর্তী নাট্য আন্দোলন প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

আলোকসম্পাত ও 'নবান্ন' :

ভারতবর্ষ, কি ভারতবর্ষের বাইরে যে সমস্ত নাট্যাভিনয় প্রাচীনকালে করা হত তা বস্তুত হত দিনমানে। তখন মঞ্চে আলোকের উৎস ছিল সূর্য। উন্মুক্ত আকাশের তলে তখন অভিনয়পর্ব চলত, সূর্য নামক একটি আলোক উৎসের অজস্র রশ্মিপুঞ্জ রঙ্গমঞ্চে অপর্যাপ্ত আলো সরবরাহ করত। কিন্তু নাট্যাভিনয় যে দিন থেকে

উন্মুক্ত আকাশ পরিত্যাগ করে প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে এসে পড়ল, সেদিন থেকে স্বাভাবিক আলোক উৎস থেকে রশ্মি সরবরাহ ব্যবস্থায় বাধা পড়ল। তখন থেকেই আলোর অস্বাভাবিক প্রয়োগকৌশলে নাট্যমঞ্চ যেন কথা বলে উঠল, এক নতুনতর প্রাণবন্ত অভিব্যক্তিতে চনমন করে উঠল।

প্রথমে প্রেক্ষাগৃহ বিশিষ্ট রঙ্গামঞ্চে আলো সরবরাহ করত মোমবাতি কিংবা তেলের বাতি। এই মোমবাতি কিংবা ল্যাম্পের আলো সামনে থেকে পড়ত মঞ্চের ওপরে। তারপরে এলো গ্যাসের আলো। গ্যাসের আলোই ফুটলাইট বা পাদপ্রদীপের উৎস। অর্থাৎ ফুটলাইট বা পাদপ্রদীপ ব্যবহার রঙ্গামঞ্চে দেখা গেল গ্যাসের আলো আসবার পর থেকে। তারপর শহরে বৈদ্যুতিক আলো আসবার সঙ্গে সঙ্গে শহুরে সভ্যতায় ঘটে গেল এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। সেইরকম বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটতে দেখা গেল রঙ্গামঞ্চেও। এই আলো সব কিছুই অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই দর্শকের সামনে তুলে ধরল।

বাংলা রঙ্গামঞ্চেও এবম্বিধ পরিবর্তন এলো। গণনাট্যের 'নবান্ন' নাটকে আলোকসম্পাতের একটা দারুণ শিল্পসম্মত সুযোগ আছে। আলোর এই শিল্পসম্মত প্রয়োগ না হলে 'নবান্ন' নাটক অত জীবন্ত হয়ে উঠতে পারত না। ছেঁড়া চটের টুকরো দিয়ে মঞ্চসজ্জা চলে, কিন্তু আলোর প্রয়োগকৌশল আরোপিত না হলে ছেঁড়া চট চটই থেকে যায়। মঞ্চমায়া সৃষ্টি হয়না। এই নাটকের কোনো কোনো স্থানে প্রতীকধর্মী পরিবেশ সৃজনে আলো অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তার ফলে 'নবান্ন' হয়ে উঠেছে বাস্তবের জীবন্ত নাট্যরূপ।

আলো কেমনভাবে নাটকে এত জীবন্ত বাস্তবের প্রতিরূপ গড়ে তোলে তা বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহারের সময় থেকে বাংলা নাটকের প্রয়োগরীতিতে সংযোজিত হয়েছে অভিনব এক অধ্যায়। আদিতে ফুটলাইট বা পাদপ্রদীপের ব্যবহার হত। রঙ্গামঞ্চের সামনের দিকে প্রান্তিক অঞ্চলে একফুট উঁচু করে ফুটলাইট বসানো হত। এর ফলে তার থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মিপুঞ্জ অভিনেতা অভিনেত্রীদের ওপর পড়ে সৃষ্টি করত একটা প্রস্থায়া। সেই ছায়া পশ্চাঝপটের ওপর পড়ে একটা কিম্ভুতকিমাত্রার পরিবেশ তৈরি করত। ফলত দর্শক মনে সামগ্রিক ইম্পেশন সৃষ্টিতে বাধা হত। তাই প্রথমে প্রয়োজন হল পশ্চাৎপটের এই ছায়া দূর করবার। তাই প্রসেনিয়ামের পিছনে টাঙনো দু'ফুট চওড়া ঝালর (যেটি রঙ্গাপীঠের ওপর থাকত)-এর অন্তরালে জ্বালান হত বালবের ছড়ি। এইভাবে চতুর্দিক আলোয় ঝলমল করে ওঠবার ফলে ছায়া স্পষ্ট হয়ে পশ্চাৎপটে পড়তে পারলনা। প্রচ্ছায়া ভুতটা রঙ্গামঞ্চ থেকে বিদায় নিল।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী 'সীতা' নাটক প্রযোজনা কালে ফুটলাইট বা পাদপ্রদীপ তুলে দিলেন। পাদপ্রদীপ তুলে দেওয়ার যুক্তিগ্রাহ্য কারণগুলো এইরকম—দিবাভাগে সূর্য পূর্বাকাশে ওঠে। সারাদিন ভূপ্রদক্ষিণ করে অপরাহ্নবেলায় পশ্চিমাকাশে অস্ত যায়। রাত্রে চাঁদ থেকে শুরু করে ইলেকট্রিকের আলো, গ্যাসের আলো প্রভৃতি সবই ওপর থেকে পড়ে, নয়তো আসপাশ থেকে পড়ে। আলোকরশ্মি প্রক্ষেপণের এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। এই স্বাভাবিক নিয়মে শিশির ভাদুড়ী মঞ্চে আলোক ক্ষেপনের ব্যবস্থা করলেন, তাই তিনি তুলে দিলেন ফুটলাইট, আমদানী করলেন ফ্লাডলাইট, স্পটলাইট। সাধারণভাবে সমস্ত মঞ্চ আলোকিত করবার জন্য ফ্লাডলাইট। পার্শ্বলাইট থেকেও আলো সরবরাহ করা যেতে পারে। আর কোনো বিশেষ স্থান, বিশেষ

মুখ বা অবয়ব বা অভিব্যক্তিকে স্পষ্ট করে তোলবার জন্য তিনি ব্যবহার করলেন স্পটলাইট। স্পটলাইট হল তাই—যা নির্দিষ্ট কোনো অংশ বা স্থানকে আলোকিত করতে পারে। এই ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আলোক নিক্ষেপণ যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হল ডিমার বা ধীরে ধীরে আলো বাড়াবার কমাবার যন্ত্র।

এই ব্যবস্থার গুরুত্ব এই যে হঠাৎ আলো জ্বলল এবং তীব্র আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হল বা হঠাৎ আলো নিভে গেল, এতে মঞ্চের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয় এবং অভিনেতার অভিব্যক্তির ক্রমবিলীয়নাম রূপটা ঠিকভাবে ফুটে উঠে অভিনয়কে ব্যঞ্জনার পর্যায়ে নিয়ে যেতে বাধা প্রদান করে। ধরা যাক 'নবান্ন' নাটকের একটি দৃশ্য, যেখানে কুঞ্জর হাতে কুকুরটা কামড়ে দিয়েছে। সেই রক্তাক্ত কম্পিত হাতটা নিয়ে যে যন্ত্রণাকাতর মুখে রাধিকার দিকে এগিয়ে আসছে। তারপর রাধিকা নিজের পরনের কাপড় ছিঁড়ে তা দিয়ে হাতের ক্ষতস্থানটা বেঁধে দিচ্ছে এবং একসময় দুজনে দুজনার মুখের দিকে গভীর প্রেম ও মমতাঘন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়ে আর আলোটা একটু একটু করে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এই অংশে পাত্রপাত্রীর মুখে কথা নেই, কিন্তু আলো এই অংশে কথা বলছে। বেদনাঘন মুহূর্তটা দর্শক মনের পরতে পরতে গেঁথে দিয়েছে। এখানে স্পটের সঙ্গে ডিমার যদি না থাকত, তাহলে আলোটা দপ করে নিভে যেত। শেষ, মুহূর্ত পর্যন্ত কুঞ্জ রাধিকার উদ্বেল হৃদয়ের রক্তক্ষরণ দেখান সম্ভব হত না, যা তাদের নীরব দৃষ্টির অশ্রুক্ষরণের মধ্যে দিয়ে দর্শক মনের প্রত্যন্ত প্রদেশের নিস্তরঙ্গতায় বেদনার তরঙ্গকে উদ্বেল করে তুলছে। একাজ করেছে ডিমার যুক্ত স্পটলাইট। এতএব স্পটলাইট আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র।

এরপর আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে আরো বহু পরিবর্তন ঘটে গেছে। এই পরিবর্তন ঘটিয়েছেন সতু সেন। সদ্য আমেরিকা থেকে ফিরে তিনি পেশাদার রঙ্গালয়ের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে সতু সেন বিস্ময়কর পরিবর্তন আনলেন, নাট্যনিকেতন মঞ্চে 'ঝড়ের রাতে' নাটকে। বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের সাহায্যে রঙ্গামঞ্চে ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ ইত্যাদি খুব বাস্তব রূপে তিনি ফুটিয়ে তোলেন। রঙমহলে 'স্বামী স্ত্রী' নাটকে কয়লার খনির যে দৃশ্য দেখান হয়েছিল তা দর্শকদের বিশেষ ভাবে চমৎকৃত করে। পরবর্তীকালে তাপস সেনের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

আলোর এই বিস্ময়কর চাতুর্য অবশ্য ঘটেছিল বাঁধা মঞ্চগুলিতে, যা পেশাদার মঞ্চ বলে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু পেশাদার মঞ্চের বাইরে মঞ্চ তৈরি করে সেখানে আলোর খেলা দেখাবার কৃতিত্ব বোধহয় গণনাট্য সংঘের। এখানে 'নবান্ন' নাটকে আলো কি রকম প্রতীকধর্মী অভিনয় করেছে তার একটু পরিচয় নেওয়া যাক। দ্বিমাত্রিক মঞ্চে দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের অভিনয় চলেছে। বিয়ে বাড়ি, ফটকের ভেতর দিয়ে বাড়ির মধ্যে যাওয়ার রাস্তা। দু'পাশে চেয়ার পাতা, সেখান দিয়ে লোকজন ভেতরে যাচ্ছে, ভেতর থেকে আসছে, একপাশে বাড়ির কর্তা এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের কথাবার্তা চলছে। এখানে আলো খুব উজ্জ্বল। অর্থ, বৈভব, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আর উৎসবের উদ্দাম আনন্দের সঙ্গে আলো এখানে যথেষ্ট সঙ্গতিসম্পন্ন। ঠিক এরই একপাশে রাস্তা, একটা ডাস্টবিন, সেখানে কুকুর আর মানুষের সহাবস্থান। উভয়ে ডাস্টবিন ঘেঁটে খাদ্য সংগ্রহে ব্যস্ত। এখানে আলো অল্প। নাট্যকার তারই নির্দেশ রেখেছেন। নাট্যকারের নির্দেশ থেকে একটা তাৎপর্য বেরিয়ে আসে, এই সব গরীব ভিখিরি মানুষগুলোর জীবনে সুখ নেই, স্বাচ্ছন্দ্য নেই, তাই আলোও নেই। নৈরাশ্য

আর অসহায়তার তমিস্রায় তাদের জীবন আচ্ছন্ন। সুতরাং এখানে উজ্জ্বল আলো একান্ত অপ্রয়োজন। স্পটলাইটের স্বল্পালোকে তাদের সামাজিক অবস্থানের প্রতীকধর্মী মঞ্চরূপ গড়ে উঠেছে। এই দৃশ্যে দুই স্তরের মানুষের সামাজিক অবস্থান নির্দেশে আলো এখানে প্রতীকধর্মী ভূমিকা পালন করেছে।

অবশ্য আলো ছাড়া আরো একটি বস্তু নাটকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তা হল আবহসংগীত। যেটি নেপথ্য বিধানের তৃতীয় বস্তু। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে, নাটকের পরিভাষায় আবহসংগীতের অর্থ এইভাবে করা যায় যে, নাট্যাভিনয়কালে দর্শকদের দৃষ্টির অন্তরালে কৃত অভিনয়ের ঘটনার অনুসঙ্গী সংগীত, ইংরাজীতে যাকে background music বলে। আবহসংগীতের আভিধানিক অর্থও তাই। সংগীত নাটকের পাত্রপাত্রীর অভিনয় দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশকে আরো বেশি জীবন্ত, মর্মস্পর্শী করে তোলে, বা অভিনয় করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে যে সংগীত তাকে আবহসংগীত বলা হয়। 'নবান্ন' নাটক থেকে একটা উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য। বিবাহ বাড়ি, মঞ্চসজ্জা, পাত্রপাত্রীর সাজসজ্জা এবং তাদের সংলাপের মধ্যে দিয়ে বোঝবার পক্ষে কোনো অসুবিধা নেই যে দৃশ্যটা বিবাহের। তাহলেও নাট্যকার নির্দেশ দিলেন যে, এখানে সানাই-এ 'আশাবরীর আলাপ চলেছে বিলম্বিত তানে'। এর কারণ এটাই বিবাহের অনুষ্ঠানে সানাই-এর একান্ত অপরিহার্য 'রাগ'। অর্থাৎ কথাটা এই দাঁড়াল যে পরিবেশ সৃষ্টি। উক্ত দৃশ্যকে বাস্তবধর্মী করে তোলবার জন্য এটি একটি স্বাভাবিক প্রয়াস।

কিন্তু প্রশ্ন, যে দৃশ্যে নাট্যকারের নির্দেশ নেই, সেখানে কি তাহলে আবহসংগীত হবে না? যেমন ধরা যাক, কুঞ্জর রক্তাক্ত হাত দেখে রাধিকা চমকে 'ওমা একেবারে কামড়ে খেলে গো' বলে সে সংলাপটা উচ্চারণ করল, এখানে ওই চরিত্রের আতঙ্কিত হওয়া, পরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে, অনুরাগ রঞ্জিত হৃদয়ে 'ভারি পাজি কুকুর তো। কামড়ে দিলে গা।'—সংলাপ-অনুভূতি স্তরগুলিকে আরো হৃদয়গ্রাহী করে তোলবার জন্য আবহসংগীতের কি দরকার নেই? প্রথমে 'ওয়াইলড্‌লি' চিৎকার, তারপর রাধিকা যখন দেখে কুকুর অনেকখানি কামড়ে নিয়েছে তখন ত্রস্তে পরনের কাপড়টা ছিঁড়ে নিয়ে বেঁধে দিতে দিতে অসহায় বোধ নিয়ে বলে, 'ওমা আমার কি হবে গো' বা গভীর মমতায় 'খুব যন্ত্রনা হচ্ছে, না! জল এনে দেব জল? একটু জল খাবে?' প্রভৃতি উচ্চারণ সংবেদনশীল হৃদয়ের অনুভূতিকে গভীরতম তলে পৌঁছে দেয়। এটিকে প্রকাশ করতে নিঃসন্দেহে অভিনেত্রীর অসাধারণ অভিনয় ক্ষমতার দরকার, এর জন্য প্রয়োজন স্বরগ্রামে—এই খেলা অতিসাধারণ অভিনেত্রীর পক্ষে সম্ভব হবে না। এটা যেমন অভিনেত্রীর ক্ষমতার ওপর অনেকটা নির্ভরশীল, ঠিক তেমনই আবহসংগীত অভিনেত্রীকে অনেক বেশি সাহায্য করে দর্শক হৃদয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করার জন্য। আর একটি জায়গা, প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য, প্রতিবেশী দয়াল প্রধানের বাড়ি থেকে চাল চেয়ে নিয়ে গেছে অভুক্ত স্ত্রী রাঙার মাকে খাওয়াবার জন্য। কিন্তু গিয়ে পৌঁছানর পূর্বেই বন্যা অতর্কিতে আক্রমণ করে নিয়ে গেছে সকলকে ভাসিয়ে, বিপর্যস্ত, ক্ষতবিক্ষত সর্বহারা দয়াল এর পর উন্মাদের মতো ছুটে আসছে কুঞ্জর কাছে বাইরে থেকে 'কুঞ্জ কুঞ্জ' ডাক দিতে দিতে।

(নেপথ্যে 'কুঞ্জ কুঞ্জ' ডাক)

কুঞ্জ। (উৎকর্ণ হয়ে) য়্যাঃ ... কুঞ্জ! ... কে!

[উন্মত্ত অবস্থায় দয়ালের প্রবেশ]

দয়াল। কুঞ্জ, কুঞ্জ, কুঞ্জ।

কুঞ্জ। দয়ালদা। কী হয়েছে দয়ালদা?

দয়াল। (কোঁচড়ের চাল হাতে নিয়ে) এই যে কুঞ্জ, তোর, তোর সেই চাল ক'টা। তোর সেই চাল ক'টা।

কুঞ্জ। (বিস্মিতের ভঙ্গিতে) দয়ালদা! দয়ালদা!

দয়াল। (স্বপ্নোত্থিতের মতো) য়্যাঁঃ, কোনো কিছু ছিল নাকি আমার কোনো দিন? ছিল কি কেউ? কোথায় গেল! আমার কি কিছু ছিল না!!

কুঞ্জ। রাঙার মায়ের জন্যে যে তুমি।

দয়াল। রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙা! আমার ঘর, কোথায় গেল আমার ঘর! কুঞ্জ!!

প্রধান। দয়াল!!

দয়াল। প্রধান, সমুদ্দুর, চারদিকে শুধু সমুদ্দুর—জল আর জল, কিছু নেই শুধু জল...সমুদ্দুর উঠে এয়েছে গ্রামে। রাঙার মা, রাঙা, রাঙার মা রাঙার মা!!

ঝড়ের শব্দ—সাঁই সং

দৃশ্যাংশটুকুর অভিনয় পুরোটাই আবহসংগীত নির্ভর। নাট্যকারের নির্দেশ থাক বা না থাক, অভিনেতা যতই ক্ষমতাসম্পন্ন হোন, দর্শক মনে গভীর ভাবে ছাপ ফেলবার জন্য এখানে আবহসংগীতের একান্ত ঘনিষ্ঠ এবং আন্তরিক সহযোগিতার খুব দরকার। কিংবা দ্বিতীয় অংকের তৃতীয় দৃশ্যে যেখানে রাধিকা কুঞ্জর হাত বেঁধে দিচ্ছে আর কাঁদছে—তারপর উভয়ে উভয়ে মুখোন্ন দিকে তাকিয়ে—এই অতি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আবহসংগীত তো এদের অব্যক্ত বক্তব্যকে, নিবিড় প্রেমের নিদারুণ বেদনাকে দর্শকের দরবারে পৌঁছে দেবে।

আবহসংগীত বলতে আমরা বুঝি এ্যাফেক্ট মিউজিক অর্থাৎ প্রভাব বিস্তারকারী সুরলহরীকে আর শব্দ সংযোজনাকেও এই অংশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। 'নীলদর্পণে'র কথা ধরা যাক, যেখানে চারজন রাইয়ত হঠাৎ অফ ভয়েসে মজুমদারের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। সেই মুহূর্তে মনে আতঙ্ক জেগে উঠল। আবহসংগীতের প্রভাব এখানে অনস্বীকার্য। অথবা, ক্ষেত্রমণির প্রতি রোগ সাহেবের অত্যাচার দৃশ্যে—আবহসংগীত ছাড়া এ দৃশ্যের অভিনয় চিন্তা করা যায়না। 'নবান্ন' নাটকের প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যের শেষাংশে—

হারু দত্ত। (কুঞ্জের মুখের ওপর লাঠি ঠুকে) বড় যে লম্বা-চওড়া কথা, উঁ? বড় যে—। (লাঠি ঠুকে) কেন, কারসঙ্গে কী কথা বলিস ঠিক থাকে না? উঁ, মনে থাকে না?

[অপমানহত কুঞ্জ গুমরে কাঁদে শিশুর মত]

প্রধান। মেরে ফেলোনি বাবা ওরে। বাবা, মেরে ফেলোনি। মেরে ফেলোনি।

২য় ব্যক্তি। এই ওপ্। (লাঠি খেয়ে প্রধান বসে পড়ে)

(কুঞ্জর কান্না আরও জোরালো হয়ে ওঠে। রুগণ মাখন তার সমস্ত শক্তি সংহত করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যায় মাটিতে। ছুটে যায় বিনোদিনী, রাধিকা, প্রধান। মরণাহত

মাখনের মুখের ওপর গিয়ে সব হুমড়ি খেয়ে পড়ে।)

রাধিকা। হায় হায় হায় হায়, আমার সব গেল গো, সব গেল। ও মাখন, মাখন—

প্রধান। (বিনোদিনীর প্রতি) এট্টু, জল, জল আন। জল—

রাধিকা। ও মাখন, মাখন রে—

(আর্তকণ্ঠে মাখন গাঁইগুই শব্দ করতে থাকে)

প্রধান। মাখন, মাখন রে ৫-৫ঃ, —কুঞ্জ, দ্যাখ, মাখনরে একবার তুই দ্যাখ্।

(রাধিকা কেঁদে ফেটে পড়ে। ভয়বিহ্বল বিনোদিনীর চোখমুখ ভেঙে নেমে আসে একটা সমূহ বিপৎপাতের কালো ছায়া।)

কুঞ্জ। (মুখ তুলে মাখনের দিকে) য়াঁ, মাখন, মাখন...

প্রধান। মাখন চলে গেলি!

এই অংশে যেখানে সংলাপ আছে সেখানে তো বটেই, যেখানে সংলাপ নেই সেখানেও আবহসংগীত খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন না করলে পুরো ব্যাপারটা মর্মগ্রাহী হয়ে উঠতেই পারবে না।

অতএব নাটকে আবহসংগীত একান্ত অপরিহার্য একটি নেপথ্য বিধান। এই বিশেষ নেপথ্য বিধানটি নাট্যাভিনয়ের প্রথম দিকে বিশেষভাবে অবহেলিত ছিল। এটা নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অঙ্গ হিসেবে দেখা হয়নি। তাই যত্রযত্র যেরকম সেরকম musical instrument ব্যবহার করা হত। তার যুক্তিসংগত কারণও ছিল। তখন পরিচালকরা অভিনয়ের ওপর জোর দিতেন, আর দর্শকরা অভিনয়টাই দেখতে যেতেন। তাই চরিত্রের মুখে নাট্যকাররা জুগিয়ে দিকেন অজস্র কথার বুনানী অর্থাৎ সংলাপ। অভিনেতৃবর্গ কণ্ঠস্বরের উৎক্ষেপণ—কম্পনের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন স্বরগ্রামে নিয়ে গিয়ে দর্শক মনে দাগ টানবার ব্যবস্থা করতেন। তাই আবহসংগীত ব্যাপারটা তখন নেহাতই গৌণ ছিল। সম্ভবত, সেই কারণে 'নীলদর্পণে'র মত নাটকের প্রথম অভিনয়ে চুনাগলির ফিরিঙ্গি কনসার্ট ব্যবহার করা হয়েছিল। তার জন্য সমকালীন সংবাদপত্রে এই বিসদৃশ সংগীত সংযোজনার যথেষ্ট বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছিল। অবশ্য প্রথম দিকে থিয়েটারে ফিরিঙ্গি কনসার্টই ব্যবহার করা হত। লেবেডফ তার নাটকে বিলিতি বাজনদারদের এনেছিলেন। কিন্তু মোট কথা, তখনকার দিনে নাট্যাভিনয়ে ফিরিঙ্গি কনসার্টের নিঃসপত্ন আধিপত্যকে অস্বীকার করা যাবেনা। পরবর্তীকালে নাট্যাভিনয়ে বীর, করুণ ইত্যাদি রস বোঝানোর জন্য, ক্লাইম্যাক্স বোঝানোর জন্য ঝাঝ, বেহালা ইত্যাদি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল। তখন বেহালা, ক্লারিওনেট, বিভিন্ন পর্দার আড়বাঁশী, ছোট বড় নানারকমের ঝাঝই ছিল আবহসংগীতের উপকরণ।

নাট্যাভিনয়ে সুসংহত, সুপ্রযোজিত আবহসংগীতের প্রয়োগ করলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তার 'সীতা' নাট্যাভিনয় থেকেই প্রথম আরম্ভ হয় নাট্যক্রিয়াকে তীব্রতর এবং অভিনয়ের রস ঘনীভূত করে তোলবার জন্য আবহসংগীতের সুসংহত ব্যবহার। এই কাজ করবার জন্য তিনি তখনকার ব্রডকাস্টিং কপপোরেশনের বাংলা কর্মসূচীর অধ্যক্ষ অদ্বিতীয় ক্লারিওনেট বাদক নৃপেন মজুমদারকে ডেকে আনেন। 'স্বর্ণসীতা গড়বার প্রয়োজনে যখন ভারবাহীরা সোনার তাল বহন করছে নীরবে, তখনকার তীব্র বিরহ বেদনাসূচক আবহসংগীত আজও

আমার কানে বাজছে'—একথা বলেছিলেন পশুপতি চট্টোপাধ্যায়।

পরবর্তীকালে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে আবহসংগীত একটা আলাদা মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নাট্যাভিনয়ে নেপথ্য বিধানের এই অঙ্গাটির অনুপস্থিতি আজ আর কল্পনা করা যায় না। বাচিক অভিনয় হোক, মুকাভিনয় হোক কিংবা অঙ্গাভিনয় হোক, আবহসংগীত সমান তালে চলতে থাকে। অভিনেতার বিভিন্ন মুডকে ব্যঞ্জনাময় করে তোলে। বিভিন্ন ভাষাহীন অভিব্যক্তির ভাষা প্রদান করে আবহসংগীত নাটকের একটা সামগ্রিক রসরূপ, শিল্পরূপ গড়ে তোলে। যা উপরিস্তরে ভাসমান থাকে, তাকে গভীর থেকে গভীর স্তরে নিয়ে গিয়ে একটা দাগ কেটে দেয়। অর্থাৎ কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে মনপ্রাণ আকুল করে তোলে। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে আজ আবহসংগীতের নিঃসপত্ন আধিপত্য।

নাট্যসাহিত্যে সাধারণ নাট্যশালায় প্রথম শতকের ন্যূধিক শেষ দু'দশক নাট্যজগতের গৌরবজনক অধ্যায় বলে চিহ্নিত হতে পারে ঠিক, কিন্তু নেপথ্য বিধান সম্পর্কে অর্থাৎ মঞ্চ, আলো ও আবহসংহীত সম্পর্কে পথিকৃৎ হচ্ছে দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাগত অপেশাদার গোষ্ঠী। তার মধ্যে প্রধান হল গণনাট্য সংঘ। 'নবান্ন' নাটকে 'গণনাট্য সংঘ' প্রত্যক্ষ ও নেপথ্য জগতের সুসংহত মেলবন্ধন ঘটিয়ে টীমওয়ার্ক ধর্মী নাট্য পরিবেশন রীতির প্রবর্তন করে—এ সম্পর্কে কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করতে পারেন বটে তবে কালের বিচারে তা গ্রাহ্য হবেনা। 'নবান্ন' নাটকেই প্রথম দেখা গিয়েছিল বস্তুনিষ্ঠ কাহিনী অতি প্রচলিত ভাষার রথে চেপে ধ্বনি, আলোক ও মঞ্চকৌশল সমন্বিত বাস্তবানুগ পরিবেষ্টনীর মাঝে খুবই বিশ্বাসগ্রাহ্যভাবে যাত্রা শুরু করে অতি সহজেই দর্শক হৃদয় জয় করে ফেলেছিল। সেদিনই পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ বুঝেছিল অভিনয় জগতে একাধিপত্যের দাপট আর খাটবে না। তাকে টেক্কা দেবার মতো শিশু জন্মগ্রহণ করে গেছে। এখানেই গণনাট্য সংঘের আন্দোলন, এখানেই বিজন ভট্টাচার্যের নাটকের বিশেষত্ব। এখানে একান্ত বাস্তবধর্মী 'নবান্ন' নাটকের নেতৃত্ব। তাই বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস 'নবান্ন' নাটকটিকে একটি বিশেষ দৃষ্টিতে দেখা হয়। দেখা হয় এইজন্যে যে, এই নাটকের মধ্যে দিয়ে সূচিত হয়েছিল নাট্য আন্দোলন। জীবন ও গভীর জীবন প্রত্যয় যার বিষয়, জীবনের বাস্তবানুগ উপস্থাপনা যার লক্ষ্য। বক্তব্য মানুষের পক্ষে—খেটে খাওয়া মানুষের পক্ষে—শোষণ নিপীড়ন-এর বিরুদ্ধে।

৮৭.১৬ মূলপাঠ ৮ : 'নবান্ন'-এর শেষ দৃশ্যের তাৎপর্য

চতুর্থ অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যের পর নাটকের 'যবনিকা' পাত ঘটেছে। এটিই শেষ দৃশ্য। এ দৃশ্যের পটভূমিকা 'মরা গঙ্গার ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সুদূর দিগন্তের পশ্চিমাকাশে অস্তমিত সূর্যের রক্তিমাভা। পরিবেশ কলহাস্যমুখর। নবান্ন উৎসব চলছে। মোরগের লড়াই, লাঠিখেলা ও কৃষাণীদের গানে মুখরিত সমগ্র অঞ্চল।' ইতোমধ্যে এই অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে শহর থেকে ফেরা নিরঞ্জন-বিনোদিনীর নতুন করে গুছিয়ে নেয়া সংসারে কুঞ্জ-রাধিকার প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। তৃতীয় ও শেষ দৃশ্যে অকস্মাৎ 'আবর্জনার কাঁড়ি বগলে নিয়ে' প্রধান সমাদ্দার 'মাথা নাড়তে' প্রবেশ করে। এমনাড়তেভাবে প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে যে দুর্যোগের ঘনঘটনার সূচনা, পরে বিস্তার, সমাদ্দার পরিবারের বিপর্যয় ও বিচ্ছেদ, শেষ দৃশ্যে অপ্রত্যাশিত ভাবে পরিবারের সব স্বজনের পুনর্মিলন এবং সেই সঙ্গে দয়ালের বক্তব্য 'অসুরের দাপট গিয়েছে, তবু মরিনি...আমরা', 'এবার আর

আকাল এসে আত্মীয় পরিজন ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না', 'জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার! জোর প্রতিরোধ। জোর প্রতিরোধ'—প্রভৃতি আপ্তবাক্য সুলভ সংলাপের অতিনাটকীয়তা ও পূর্বাপর রহিত অপ্রত্যাশিত ঘটনার আতিশয্যের জন্যই, নাটকাভিনয় দেখে, সে দিন এই দৃশ্যটি সম্পর্কে কিছু প্রতিকূল সমালোচনা হয়েছিল।

শ্রীরঙ্গাম মঞ্চে একাদিক্রমে সাত রাত্রি অভিনয়ের পর 'নবান্ন' নাট্যামোদী, বুদ্ধিজীবী মহলে প্রবল সাড়া এনে দিয়েছিল। নাটক ও প্রযোজনার অন্যতর চিন্তা-ভাবনার অভিব্যক্তি এক নতুন দিগন্তের আভাস এনে দেয়। গণনাট্যের জয়যাত্রার শুরু এখান থেকে।

নতুন ভাবনা ও প্রযোজনার দিক থেকে 'নবান্ন' যতটা অভিনন্দিত হয়েছে, সাহিত্য হিসাবে নাটকটি ততটা ত্রুটিমুক্ত ছিল না। এর ঘটনা পরম্পরা একটি অখণ্ড কাহিনীর ক্রমবিকশিত রূপকে তুলে ধরার চেয়ে, নাটকীয় আবেগকে একমুখী করে তোলার চেয়ে, ঘটনার বহুধা ব্যাপ্তি ও আবেগ বৈচিত্র্যের প্রতি বেশি মনোযোগী। সাধারণ কৃষক ও নিম্নবিত্ত কতকগুলি মানুষ ও তাদের সমাজজীবনের অবলম্বন হলেও তাকে নাট্যরসাশ্রিত করার জন্য যে প্রতিভার প্রয়োজন, সে পরিচয় নাটকটিতে পরিস্ফুট হয়নি। তাই নবান্নের কোনো কোনো দৃশ্য পরিকল্পনা ও উপস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এঁদের কেউ কেউ শেষ দৃশ্যটিকে নবান্নের দুর্বলতম অংশ বলে মনে করেন। "'নবান্ন' অক্ষম শুধু এই কারণে যে এর শেষ অংশ পূর্ববর্তী অংশগুলি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ওই অংশগুলিতে ঘটনা বিবর্তনের যে সূত্র পাওয়া যায় শেষ দৃশ্যে এসে তা একেবারে তালগোল পাকিয়ে গেছে, ফলে নাটকটির স্বাভাবিক পরিণতি হয়েছে একেবারে পণ্ড।" "এই দৃশ্যে গ্রন্থাকার যেভাবে তার উদ্ভাবিত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন, তা শুধু রোমান্টিক ও অবাস্তব নয়, নাটকটির পূর্বাংশের সঙ্গে একেবারে সঙ্গতিবিহীন।" ('নবান্ন'—হিরণকুমার সান্যাল, পরিচয়, চৈত্র ১৩৫১)।

সমালোচকের বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, নাটকটির প্রথমাংশে গ্রাম বাঙলার জনজীবনের অনুপুঙ্খ বর্ণনার মধ্য দিয়ে নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি ও তৎসহ নাট্য কাহিনীতে একটি গতিবেগ আনবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, তা অনেকটা স্বাভাবিক ও বাস্তবানুগ।

দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি—রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ঘটনার টানাপোড়েন, দুর্ভিক্ষ মহামারী—বন্যায় বিপন্ন মানুষের স্বপক্ষে বক্তব্য উপস্থাপনার দায় নিয়ে সেদিন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বাঙলা শাখার ওপর কিছু দায়িত্ব বর্তে ছিল। প্রয়োজন ছিল সাধারণ মানুষকে আর্ত জনসাধারণ সম্পর্কে সচেতন এবং ত্রাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ নবান্ন নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে সে দায় ও দায়িত্ব সম্যকভাবে পালন করেছে।

চার অঙ্কে বিন্যস্ত 'নবান্ন' নাটক বঙ্গদেশের অনাদৃত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রথম আলেখ্য। প্রথম বাংলার চাষী মজুরের 'দুর্ভোগ-দুর্দশার নৈরাশ্য-সংকল্পের চমৎকার বাস্তবসম্মত চিত্র'। এর পটভূমিতে আছে তৎকালের বাংলাদেশের তিন বৎসরের ঘটনা। ১৯৪২-৪৪ সালের গ্রাম বাঙলার জনজীবনের পক্ষে উল্লেখযোগ্য নানা রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক ঘটনাকে নাট্যকার অতি স্বচ্ছন্দভাবে এ নাটকে তুলে ধরেছেন। উদ্দেশ্য গণজীবনের বিস্তৃত পরিসরটি তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পোড় খাওয়া মানুষের মাধ্যমে নতুন এক বলিষ্ঠ সংগ্রামশীল জীবন দর্শনকে প্রকাশ করা, যার প্রতিপাদ্য 'সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের

বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ' চেতনা সঞ্চার করা। গণনাট্য আন্দোলনের কর্মী নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য তাঁর এই প্রতিপাদ্যটি তুলে ধরবার জন্য প্রাথমিকভাবে দুর্গত পল্লী ও পল্লীবাসীর সঙ্কটের স্বরূপ তুলে ধরেছেন প্রথম অঙ্কের দৃশ্য পরম্পরায়। প্রথম দৃশ্যের পটভূমি : বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ আর এখানে '৪২-এর আগস্ট আন্দোলন দেশব্যাপী অগণিত মানুষের সংগ্রাম ও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের রক্তাক্ত সন্ত্রাস সৃষ্টির ঘটনাকে নাট্যকার বর্ণনা করেছেন—"সুদূরের পটভূমি রক্তিম। ... হঠাৎ নতুন কোনো কিছুর আহুতি পেয়ে পটভূমিটা আরও রক্তিম হয়ে উঠল; আর ঊর্ধ্বগতি ধূমকুণ্ডলীর সঙ্গে উড়তে লাগল ছাই আর আগুনের ফুলকি।"—এ থেকে বোঝা যায় বাঙলার রাজনৈতিক পটভূমি তখন অগ্নিগর্ভ। এ হেন পরিস্থিতিতে আমিনপুরের কৃষক প্রধান সমাদ্দার তিন গোলা ধান নষ্ট করে, নৌকা আটকে রাখে, আবার দুই ছেলেকে নিয়ে আগস্ট আন্দোলনেও যোগ দেয়। তার স্ত্রী পঞ্চাননী পুলিশী সন্ত্রাস অত্যাচারের ভয়ে ভীত 'মেয়েমানুষের লজ্জা শরম খুইয়ে বনেজঙ্গালে গিয়ে' পহরের পর পহর বসে গ্লানির প্রতিবাদ করেও যখন কোনো সুরাহা হয় না দেখে তখন নিজেই বিদ্রোহের মশাল হাতে জনতার নেতৃত্ব দেয়, অবিচল দৃঢ়তায়; উদ্বুদ্ধ করে এগিয়ে যেতে। পক্ষান্তরে, কুঞ্জ মনে করে দেশের মানুষের প্রস্তুতিবিহীন সংগ্রাম আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র। আর যুধিষ্ঠিরের সংলাপ নেহাৎই প্ররোচনাকারীর বক্তব্য। সব মিলিয়ে দৃশ্যটিতে বিশ্বযুদ্ধ ও আগস্ট আন্দোলনের উত্তেজনার দিনগুলোর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। বাঙলাদেশের মানুষ সেদিন যুবাবৃদ্ধ নির্বিশেষে নানাভাবে আন্দোলিত হয়েছিল তা বোঝা যায়। এ তো নেপথ্যভূমি।

দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ দৃশ্য প্রধানের ছন্নছাড়া গৃহস্থালীর বিস্তৃত বর্ণনায় সমৃদ্ধ। অভাবের তাড়নায় সমাদ্দার পরিবার বীজধানের শেষে ঘরের থালা বাসন বিক্রি করে মুখের গ্রাস সংগ্রহ করছে, তৎসত্ত্বেও সহৃদয়তা হারায়নি। প্রতিবেশী দয়ালকে সংগৃহীত সামান্য খুদকুঁড়ো থেকে মুঠোকখানেক দিতে দ্বিধা করেনা। নিরঞ্জন এ কষ্ট সহ্য করতে না পেরে বেরিয়ে পড়ে কাজের সন্ধানে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। দুর্দৈব এতক্ষণ বোধ করি প্রতীক্ষা করছিল। আকস্মিক দমকা বাতাসকে সঙ্গে নিয়ে সাত-আট হাত উঁচু হয়ে আসা বান আর প্রবল ঝড়ের তাণ্ডবলীলা চলতে থাকে। প্রধানের দোচালা ভেঙে 'ঘর বার' সব একাকার হয়ে যায়। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে মহামড়ক উজাড় করতে থাকে গ্রামের পর গ্রাম। তবু এরই মধ্যে বাঁচবার সংগ্রাম চলে, সমাদ্দার পরিবারের। এ হেন বিপর্যয়ে, সঙ্কটে হায়েনারা স্থির থাকতে পারেনা। তাদের লোভী দৃষ্টি মানুষের শেষ সম্বলটুকুতেও হাত বাড়ায়। হারু দত্ত গ্রামের মহাজন, সমাদ্দারদের অভাবের সুযোগ নিয়ে জমি কাড়তে উদ্যত হলে, কুঞ্জ বাধা দেয়। পরিণামে হারুর লাঠিয়ালের আঘাতে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়-তৃতীয় অঙ্ক সমাদ্দার পরিবারের শহরবাসের ইতিকথা। ভিন্নতর পরিবেশে অনভ্যস্ত জীবনচারণে প্রতিপদে আত্মাবমাননা সহ্য করতে না পেরে প্রধান, গ্রাম বাঙলার পিতৃপুরুষ, কেমন যেন পাগলের মতো হয়ে যায়। কুঞ্জ, রাধার নগরজীবনের সীমাহীন হৃদয়হীনতায় স্বগ্রামে ফিরে যাবার সংকল্প নেয়। কালীধন সেবাশ্রমে (?) বিনোদিনীর সঙ্গে নিরঞ্জনের পুনর্মিলন ও ধাড়ার সমস্ত হীন ব্যবসার পুলিশ সংবাদ দিয়ে, সচক্র ধরিয়ে দেয় এবং পরিশেষে তারা ঘরে ফেরে।

বস্তুত প্রথম অঙ্কের পাঁচটি দৃশ্যে ৪২-৪৩ সালের আমিনপুর তথা গ্রামবাঙলার যে ছবি তুলে ধরা হয়েছে,

তা যেমন ব্যাপক ও বাস্তবানুগ, তেমনি নাটকীয়। এই সমস্ত ঘটনা পরম্পরার তালিকাকে ক্ষুধা মারী মন্বন্তরে পীড়াগ্রস্ত আর্ত বাঙলাদেশের ইতিহাস বলা যায়। কিন্তু ইতিহাস তো কোথাও থেমে থাকে না। আর তাই শুধু ধ্বংসের বিপর্যয়ের চিত্র উপস্থাপনাতেই সমাজ সচেতন শিল্পীর দায়িত্ব শেষ হয়না। কেননা ধ্বংস যতই বড় হোক, প্রাণের অঙ্কুরোদগমের সেখানেই শুরু। শত হতাশা ও সহস্র বিপর্যয়ের মধ্যেও মানুষের বাঁচবার আশা সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা, সে তো চিরন্তন! মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলো অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও নিঃশেষে মরে না, 'নবান্ন' সেই বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছে। দয়াল বলেছে—"মন্বন্তরের দাপটও তো গিয়েছে এই মাথার ওপর দিয়ে, ... আমরা তো বেঁচেই আছি। কই মরিনি তো আমরা সবাই মন্বন্তরে।" কিন্তু কি সেই সঞ্জীবনী মন্ত্র যা মানুষের বুকে বল, মনে শক্তি জোগায়—ভয় থেকে অভয়ে পৌঁছে দেয়? 'নবান্ন' সেই সংবাদ বাঙলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে—"জোর জোর প্রতিরোধ! জোর প্রতিরোধ!" এভাবেই তো মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ রচনা করে। এখানেই বলিষ্ঠ সংগ্রামশীল জীবনচেতনার পরিচয়। 'নবান্ন' নাটকের এই উপসংহারে পৌঁছুবার জন্য মানস প্রস্তুতি ঘটেছে চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে, গাতায় খাটার প্রতিশ্রুতিতে। সংঘশক্তির এখানেই প্রতিষ্ঠা। তারপর "জমির অর্ধেক ফসল গেরামের দুঃখী গেরস্থ ভাইদের জন্য দিয়ে" 'ধর্মগোলা' স্থাপনের সঙ্কল্পে তার প্রাণসঞ্চার। তৃতীয় দৃশ্যের প্রতিরোধ তো তারই পরিণত রূপ। দয়াল আমিনপুরে নানান বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে যে পাথেয় সংগ্রহ করেছে, সেখানে থেকে গড়ে উঠেছে এই বলিষ্ঠ জীবনদর্শন। 'নবান্ন'-এর শেষ দৃশ্যটা তাই নাটকের প্রথমাংশ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ফলে নাটকটির স্বাভাবিক পরিণতি পণ্ড হয়েছে, তা বলা যায়না। নিরঞ্জন বিনোদিনী, কুঞ্জ রাধা এবং প্রধানের শেষ অঙ্কে পর্যায়ক্রমে ঘরে ফেলা একাট উপলক্ষ্য মাত্র।

পরিশেষে আর একটি কথা। নাটকের শেষ দৃশ্যটি নিয়ে কিছু বিতর্ক থাকলেও কোনো কোনো সমালোচকের মতে এ দৃশ্যটিই সব চাইতে ভালো। কেন না এই দৃশ্যে রঙ্গামঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে পুরো একটি জনতা। তৎসত্ত্বেও দৃশ্যটির পরিচালনায় ও পরিকল্পনায় নাট্যকারের অসামান্য দক্ষতার পরিচয় রয়েছে। গণনাট্য সংঘ, তার অনন্য সংঘশক্তি ও অভিনয় নৈপুণ্যে এই দৃশ্যটি সম্পর্কে জনমানসে একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাই সামগ্রিক বিচারে এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, নবান্নে আপাতঃ কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হলেও, একটি সফল নাট্যপ্রয়াস।

৮৭.১৭ সারাংশ

আধুনিক নাট্যাভিনয়ে আলো, ধ্বনি, আবহসংহীত প্রভৃতি গভীরভাবে সম্বন্ধযুক্ত। এগুলিকে নাট্যাভিনয়ে বা থিয়েটারের পরিভাষায়য় বলে নেপথ্য বিধান। থিয়েটারের দুটি অংশ—(১) প্রত্যক্ষ অভিনয়, (২) নেপথ্য অভিনয়। প্রথমটির পরিচয় পাওয়া যায়। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সংলাপ বা বাচিক ও অঙ্গাভঙ্গি সহযোগে মঞ্চে প্রত্যক্ষ অভিনয়ে। এই অভিনয়কে মনোজ্ঞ, বাগ্ময় ব্যঞ্জনাধর্মী এবং অভিনয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করবার জন্য নেপত্য বিধানের অপরিহার্যতা সর্বজন স্বীকৃত। এতদুভয়ের সুসঙ্গাত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে নাটক বাঞ্ছিত রস জারণ করতে পারে। নবানের কাহিনী শুধু গতানুগতিকতা বর্জিত হয়, এর

মঞ্চসজ্জা, আবহসংগীত, আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রেও অভিনবত্ব ছিল, যা গণনাট্য সংঘের উল্লেখযোগ্য অবদান। 'নবনাট্য' পর্বে যে আলো-ধ্বনি-আবহসংগীত বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তার প্রাথমিক সূচনা 'নবান্ন' নাটকের মঞ্চাভিনয়ে দেখা গিয়েছিল।

উন্মুক্ত আকাশ বা ধূসর প্রান্তরে জনতার মাঝখানে রঙ্গামঞ্চের সূচনা। গ্রীক মঞ্চ পরিকল্পনা ও তার বিবর্তনে 'কোরাস' ও 'অর্কেস্ট্রা'র বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গাকে বলা হত থিয়াট্রন। এই থিয়াট্রন থেকে থিয়েটার শব্দটি এসেছে।

এদেশে লোকনাট্যের অভিনয়ের জন্য মঞ্চের প্রয়োজন হতনা। পরবর্তীকালে সংস্কৃত ও ইউরোপীয় মঞ্চপ্রভাবে মঞ্চ ক্রমশ জটিলতর হয়েছে। নানা বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী কৃৎ-কৌশল যুক্ত হয়ে আধুনিক মঞ্চভাবনা ক্রমান্বয়েই নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে।

বাংলা নাট্যাভিনয়ের জন্য এখন যে মঞ্চকে বোঝায় তা হল প্রসেনিয়ম মঞ্চ। এর সূচনা করেছেন লেবেডফ, জড্রেলের লঘুনাটক 'দি ডিসগাইজ' এর বঙ্গানুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল' অভিনয় কালে। মঞ্চটির তিন পাশ ওপর দিক ঢাকা, সামনেটা খোলা, আয়তাকার, একধারে উঁচু বেদীর ওপরে, প্রয়োজন অনুযায়ী সাজিয়ে সেখানে অভিনেতারা তাদের সংলাপ উচ্চারণ করেন। পেছনে দৃশ্যপট এঁকে পর পর ঝোলান থাকত। প্রয়োজনমত এর ব্যবহার করা হত। ১৮৭২-এ জাতীয় নাট্যশালা বা সাধারণ রঙ্গামঞ্চে ধর্মদাস সুর 'নীলদর্পণ' নাটকের জন্য এধরনের একটি মঞ্চ গড়েছিলেন। পরে অমর দত্ত ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ক্লাসিক থিয়েটারে দৃশ্যপট ও আসবাবপত্রে আরও বাস্তবতা আনেন। কিন্তু এর আমূল পরিবর্তন ঘটান শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তিনি দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বেধ বিশিষ্ট মঞ্চ পরিকল্পনা করেন, সেইসঙ্গে পার্শ্বপট ও পাদপ্রদীপ তুলে দেন। ফলে শিল্পীরা স্বাভাবিক প্রবেশ প্রস্থানের পথ পান। ফলত মঞ্চ অনেক বেশি বাস্তব ঘেঁষা হয়ে ওঠে।

চতুষ্কোনপ্রসেনিয়ম মঞ্চকে প্রয়োজনানুযায়ী এক, দুই বা ত্রিস্তরীয় মঞ্চ করা যায়। 'নবান্ন' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য মূলত দ্বিস্তরীয় মঞ্চ। "শহরের রাজপথ। পাশে ধনীর বাসভবন" প্রভৃতি মঞ্চের ডানদিকের বর্ণনা। "আর মঞ্চের বাঁদিকে এক কোণে অর্ধবৃত্তাকারে দেখা যাচ্ছে ডাস্টবিন.....কুঞ্জ রাধিকা ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট.....ইত্যাদি।" শিশিরকুমার তাঁর 'সীতা' ও 'দিগ্বিজয়ী' তে এর ব্যবহার করেছিলেন। 'নবান্ন' নাটকের প্রথম দৃশ্য কল্পনায় শিশিরকুমারের প্রত্যক্ষ প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। গণনাট্যের যুগে নাট্যকর্মীদের উদ্দেশ্য ছিল নাটককে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া, তাই স্বল্পতম আয়োজনে মঞ্জ পরিকল্পনা করা হোত। তাই এ মঞ্চ বস্তুভারের পরিবর্তে ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে উঠল। আলোধ্বনি ও আবহসংগীত এ ব্যাপারে অনেকটা সহায়ক হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য প্রধানের বাড়ি থেকে দয়াল-এর চাল নিয়ে যাওয়ার পরবর্তী ঘটনা, বা দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে রাধিকা কুঞ্জকে কুকুরে কামড়ানো হাত বেঁধে দিচ্ছে ও কাঁদছে—দৃশ্যে আবহসংগীত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'নবান্ন' নাটকের বাস্তবধর্মী বিষয়বস্তুর সঙ্গে বাস্তবধর্মী দৃশ্য রচনা, জীবনের বাস্তবানুগ নাট্যাভিনয়ের সাফল্য বস্তুত গণনাট্য আন্দোলনের সাফল্য।

'মরা গঙ্গার ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তর', চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য— এখানে নবান্ন উৎসবের আয়োজন হয়েছে—এটি নাটকেরও শেষ দৃশ্য। অস্তায়মান সূর্যের গোধূলি আলোয় চরাচর উদ্ভাসিত। অফুরন্ত প্রাণস্ফূর্তিতে মেতে উঠেছে কৃষাণ-কৃষাণীরা। এদিকে ইতোমধ্যে শহর থেকে আমিনপুরে ফিরেছে নিরঞ্জন-বিনোদিনী, তাদের নতুন করে গুছিয়ে নেওয়া সংসারে কুঞ্জ-রাধিকাও ফিরে এলো। অবশেষে শেষ দৃশ্যে 'আবর্জনার কাঁড়ি বগলে নিয়ে' প্রধান সমাদ্দার ফেরে। প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের দুর্যোগ, সমাদ্দার পরিবারের বিপর্যয় ও বিচ্ছেদের পর শেষ দৃশ্যেই সমাদ্দার পরিবারের সব স্বজনের পুনর্মিলন ঘটে। সর্বস্ব হারানো দয়াল সব সঙ্কটকে তুচ্ছ করে বলেছে, মন্বন্তরে মরিনি আমরা, আবার আকাল আমাদের আত্মীয় পরিজনকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তার উদ্দীপক ভাষণ, "জোর, জোর প্রতিরোধ এবার প্রধান।" দয়ালের এ ভাষণ যতই আকস্মিক ও আতিশয্যপূর্ণ হোক না কেন, এর সফল অভিনয় নাট্যামোদী মহলে নতুন দিগন্তের আভাস এনে দিয়েছিল।

নবান্নের অভিনয় সাফল্য, নতুন ভাবনা ও প্রযোজনার জন্য অভিনন্দিত হয়েছে। নবান্ন জটিল নাটকীয় দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলার চেয়ে, ঘটনার বহুধা ব্যাপ্তি আবেগ সৃষ্টির প্রতি বেশি মনোযোগ দিয়েছে। নবান্ন নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি উপস্থাপনার মাধ্যমে আর্ত জনসাধারণ সম্পর্কে সচেতন ও ত্রাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার যে দায় ও দায়িত্ব গণনাট্য সংঘ গ্রহণ করেছিল, তা যথার্থভাবে পালন করেছে।

নাটকের তিনটি অঙ্ক পরম্পরায় বিশ্বযুদ্ধ, ৪২-এর আন্দোলন, ঝড়ঝঞ্ঝা, বন্যা, মারী-মন্বন্তরের যে দৃশ্যপট রচনা করেছে, ইতিহাস সেখানে থেমে থাকেনি। তাই ধ্বংস বিপর্যয়ের চিত্র উপস্থাপনাতেই সমাজ-সচেতন শিল্পীর দায়িত্ব শেষ হয়না। কেননা ধ্বংসের মধ্যেই থাকে প্রাণের অঙ্কুরোদগমের সম্ভাবনা। তাই শত হতাশা ও সহস্র বিপর্যয়ের মধ্যেও মানুষ বাঁচতে চায়। নবান্নের শেষ দৃশ্য সেই বার্তাই বয়ে এনেছে। দয়ালের কথায়, "মন্বন্তরের দাপট গিয়েছে.....কই মরিনি তো আমরা"। সেই সঞ্জীবনী মন্ত্রই উচ্চারিত হয়েছে শেষ দৃশ্যে। গাঁতায় খাটা (৪/১), ধর্মগোলা স্থাপনের সঙ্কল্প শেষ দৃশ্যে প্রতিরোধ রচনার প্রতিজ্ঞা আমিনপুরের মানুষকে সঙ্কট উত্তরণ শেষে নতুন করে বাঁচার পথ দেখিয়েছে। নবান্নের শেষ দৃশ্য তাই বিশেষ তাৎপর্যবহ। নবান্নের উৎসবমুখর পরিবেশ গঠনের লোকায়ত উৎসবের আয়োজন প্রভৃতির দৃশ্য পরিকল্পনা ও পরিচালনায় নাট্যকার যথার্থ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

৮৭.১৮ অনুশীলনী ৪

১। "সাদা কথায় বলতে গেলে ব্যাপরডা দাঁড়ায় এই যে, এখনই, এই মুহূর্তে আমরা যদি ফসল রক্ষে করার একটা ব্যবস্থা না করে উঠতে পারি, তা হলে মিত্যু ছাড়া আমাদের কোনো গত্যন্তর থাকবে না।"—কে, কোথায়, কি প্রসঙ্গে এ কথা বলেছেন? 'মিত্যু' থেকে 'গত্যন্তরে'র কি উপায় স্থির হয়েছিল লিখুন।

২। 'নবান্ন' নাটকের বিষয়বস্তু, চরিত্র ও লক্ষ্য প্রমাণ করে নাটকটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদের নাটক। নাটকের অভিনয় গঠনরীতিতে তার আভাস আছে। —আলোচনা করুন।

৩। "নবান্ন' বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল"—সমালোচকের এই মন্তব্য সম্পর্কে আপনার অভিমত দিন।

৪। "ডর আছে, কিন্তু প্রধান, মন্বন্তরের দাপটও তো গিয়েছে এই মাথার ওপর দিয়ে, মরিনি তো সবাই আমরা! আমরা তো বেঁচেই আছি।"—কার লেখা, কোন নাটকের অংশ? কে এই কথা কখন বলেছে? বক্তব্যটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

৫। "নবান্ন'কে একই সঙ্গে দুর্গতি ও প্রতিরোধের নাটক বলা হয়।"—নাটকটিতে দুর্গতি প্রতিরোধের যে চিত্র পাওয়া যায় তা বর্ণনা করুন।

৬। 'নবান্ন' নাটকের সামগ্রিক পরিকল্পনায় বিশেষত মঞ্চ ও দৃশ্যসজ্জা ও আবহসংগীত একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেছে। —মন্তব্যটির যাথার্থ্য নিরুপণ করুন।

৮৭.১৯ উত্তর-সংকেত

অনুশীলনী ১ :

১। (ক) অভিনবত্ব নাটকের বিষয়বস্তুতে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মন্বন্তর, মারী ও মড়কে বিপর্যস্ত সর্বস্বান্ত গ্রাম বাংলার দরিদ্র কৃষক ও মধ্যবিত্ত পরিবার ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহের জন্য কোলকাতা শহরের পার্কে জমায়েত হচ্ছে লঙ্গরখানায় সামান্য খাদ্যের জন্য। এ বিষয় বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রথম।

(খ) নাটকে কোন নায়ক চরিত্র নেই। নাটকের চরিত্রগুলির সামগ্রিক অভিনয়েই নাটকের সাফল্য নির্ভরশীল।

(গ) নাটকের সংলাপ, বাস্তবমুখী ও জীবনানুগ।

(ঘ) এ নাটকের মঞ্চ, দৃশ্য, আলো ও ধ্বনির ব্যবহারে অভিনবত্ব উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত বিষয়গুলির যে কোন দুটির উল্লেখ করুন।

২। প্রথম প্রকাশ 'অরণি' পত্রিকায় ১৯৪৩-খ্রিস্টাব্দে, গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯৪৪-এ, প্রথম অভিনয় শ্রীরঙ্গম মঞ্চে, ২৪শে অক্টোবর, ১৯৪৪।

৩। কৃষকের জীবন নিয়ে রচিত তিনটি নাটক হল—
নীলদর্পণ—দীনবন্ধু মিত্র।
জমিদার দর্পণ—মীর মশাররফ্ হোসেন।
নবান্ন—বিজন ভট্টাচার্য।

৪। ৭.৩ অংশের 'দেশকাল' পর্যায়টি পাঠ করে আপনার উত্তর তৈরি করুন।

৫। ৭.৩ অংশের 'নামকরণ' অংশ অবলম্বনে উত্তর লিখুন।

অনুশীলনী ২ :

১। (ক) যুদ্ধ, দুর্যোগ, মন্বন্তরে আমিনপুর গ্রামের মানুষ যখন বিপন্ন, সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ যখন সকলকে পীড়িত করছে, তখন বন্ধু দয়ালকে সম্বোধন করে প্রধান সমাদ্দার একথা বলেছে। সে শুনেছে বিত্তবান মানুষেরা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দরিদ্র মানুষের জন্য লঙ্গরখানা খুলে খাবার বিতরণ করছে। এই সংবাদে তার আশা শহরে গেলে প্রাণধারণের জন্য অন্তত দুমুঠো অন্ন জুটবে।

'অন্নকুট' শব্দের বাচ্যার্থ হল অন্নের পাহাড়তুল্য অন্নরাশি বা খাদ্যস্তুপ। বিশেষ তিথিতে দেবার্চনার উদ্দেশ্যে নিবেদিত 'অন্ন' প্রসাদ হিসেবে সাধারণে বিতরণ করা হয় যে উৎসবে তা অন্নকুট নামে পরিচিত। এখানে ব্যঞ্জনার্থে শহরের লঙ্গরখানা থেকে রান্না করা খাদ্য বিতরণের আয়োজনকে 'অন্নকূট' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(খ) দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে চাল ব্যবসায়ী কালীধন ধাড়ার 'সরকার' রাজীব বলেছে। কালীধন চালের মজুতদার। কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করবার জন্য চাল গোপনে গুদামজাত করে, বাজারে দাম বাড়িয়ে দেয়। সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় চাল সহজভাবে না পেলে বেশি দাম দিয়ে চাল কিনতে বাধ্য হয়। এ ক্ষেত্রে জনৈক ভদ্রলোক চাল কিনতে এসে কোথাও না পেয়ে চাল-ব্যবসায়ী কালীধন ধাড়ার দোকানে হাজির হয়ে করজোড়ে একটা ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। কালীধন অন্য জায়গা থেকে পঞ্চাশ টাকা দামে সংগ্রহ করে দেবার প্রস্তাব দিলে ভদ্রলোক বিস্ময় প্রকাশ করেন। তারই প্রতিক্রিয়ায় কালীধনেরই যোগ্য কর্মচারী রাজীব এই উক্তি করে।

এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে অহসায় ছাপোষা সাধারণ ক্রেতা ভদ্রলোকের প্রতি বক্তা রাজীবের তাচ্ছিল্যের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। হীন চরিত্র কালীধনের সাহচর্যে রাজীব তার প্রভুরই মত কুরুচির পরিচয় দিয়েছে।

(গ) বক্তা প্রধান সমাদ্দার। তাঁর দুটি পুত্র শ্রীপতি ভূপতি দেশের ৪২-এর স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ হয়েছে। পুত্রহারা পিতার এই বিলাপ তাঁর অন্তর বেদনাকে প্রকাশ করেছে। কুঞ্জ প্রধানের ভ্রাতুষ্পুত্র, সেও শ্রীপতি-ভূপতির জন্য বেদনাবোধ করে বলেছে—"শ্রীপতি-ভূপতির ব্যাথা বড় কম বাজে নি এই বুকে জানলে জেঠা"—কুঞ্জ এজন্য ভেতরে ভেতরে দগ্ধে মরে। তাই বৃদ্ধ জেঠাকে স্বান্ত্বনা দেয়।

(ঘ) উক্তিটি প্রধান সমাদ্দারের স্ত্রী পঞ্চাননীর। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রবল ঢেউ-এ যখন ইংরেজ সরকার বিব্রত শুধু নয়, বিপন্ন, তখন সংগ্রামীদের ওপর প্রবল বিক্রমে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে।

গ্রামের বিপ্লবীদের সন্ধানে পুলিশ সাধারণ মানুষের ওপর নানা ধরনের পীড়ন শুরু করে। পুলিশের পীড়নের ভয়ে অনেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ ছেড়ে পালিয়ে আসছে দেখে পঞ্চাননী তাদের এগিয়ে যেতে পরামর্শ দিয়েছেন. সংগ্রাম ছেড়ে সংকটকালে যারা পিছিয়ে আসে তারা জাতীয় জীবনে কলঙ্ক স্বরুপ সন্দেহ নেই। নাটকে পঞ্চাননী চরিত্রটি বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী মাতঙ্গিনী হাজরার আদলে রচিত। অকুতোভয় পঞ্চাননীর দেশপ্রেম, দৃঢ় চরিত্রবল, সংকটে যথার্থ নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা ছিল—এই সংলাপ থেকে তা বোঝা যায়।

২। এই এককের ৭.৯ অংশের 'নবান্ন' নাটকের গান, অংশটি এবং সারাংশের প্রাসঙ্গিক অংশটি ভাল করে পড়ে উত্তর তৈরি করুন।

৩। 'নবান্ন' নাটকের নামকরণ ও প্রাসঙ্কি আলোচনা পড়ে প্রশ্নের উত্তর তৈরি করুন।

৪। 'প্রাসঙ্কি আলোচনা' পর্যায় অবলম্বনে উত্তর লিখুন।

৫। গণনাট্য হিসেব 'নবান্ন'র অবদান ও গণনাট্য আন্দোলনে নবান্নের ভূমিকা অংশ পাঠ করে উত্তর লিখুন।

অনুশীলনী ৩ :

১। (ক) ৪৫ (খ) প্রধান (গ) রাধিকা

২। পরিচয়ের জন্য চরিত্রলিপি এবং ৭.১১ অংশের উল্লিখিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে 'প্রাসঙ্গিক আলোচনা'র সাহায্য নিন।

৩। বক্তা দ্বিতীয় ভদ্রলোক।

ব্ল্যাক মার্কেট-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'কালোবাজার'। খোলা বাজারে কৃত্রিম অভাব তৈরি করে গোপনে অতিরিক্ত মুনাফায় বেশি দাম দিয়ে বিক্রি করা। এভাবে অর্জিত হিসাব বহির্ভূত অর্থই কালো টাকার (Black Money) উৎস।

মজুতদার শব্দটি আরবী 'মৌজদ' + দার (ফরাসী প্রত্যয়) গড়ে উঠেছে।

উদ্ধৃত উক্তির মূল প্রসঙ্গ হল দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য, শহরের রাজপথ সংলগ্ন ধনীর আবাস। সেখানে বিবাহোৎসব। গৃহকর্তা-বড়োকর্তার হাজার খানেক নিমন্ত্রিত। নির্মলবাবু প্রসঙ্গত বলেছেন। জিনিসপত্তর জোগাড় করতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো? বড়োকর্তা জানান যদ্দিন চোরাবাজার আছে, ততদিন—কথা অসম্পূর্ণ থাকতেই দ্বিতীয় ভদ্রলোক চোরাবাজারের প্রশংসার ভঙ্গিতে বলেন, চোরাবাজার আছে বলেই কিছু আটকাচ্ছে না। তাই, তিনি প্রকাশ্যে চোরাবাজার বা ব্ল্যাকমার্কেট ও মজুতদারদের সমর্থন জানান। নির্মলবাবু অবশ্য বলেছেন পয়সা যাদের আছে, তারা একথা বলতে পারেন।

(প্রশ্নটির পরীক্ষার্থী তার নিজস্ব মনোভাব ব্যক্ত করবেন।)

৪। ৭.১১ অংশটি পাঠ করে উত্তর তৈরি করুন। গ্রীক বা সেক্সপীয়রীয় অর্থে যাকে নাটক বলা হয়, সে অর্থে এখানে নায়ক নেই, তবে প্রধান বা কুঞ্জকে জীবনসংগ্রাম ও তা থেকে উত্তরণসূত্রে মুখ্য চরিত্র হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

৫। বক্তা সুজন, সাধারণ গ্রামবাসীদের একজন। এঁরা কুড়ি-পঁচিশ জন প্রধান সমাদ্দার বাড়ির স্বল্প পরিসর উঠোনে বসে পারস্পরিক আলোচনায় মত্ত।

সালাপচারিতার মধ্যে ফকির বলেছে, বাংলা দেশের গ্রামীণ সন্তানরা বাবার দেনা ঘাড়ে জন্মায় এবং তারা শেষ জীবনে নিজের দেনা ছেলের ঘাড়ে চাপিয়ে চলে যায়, এমনটাই চিরকালটায় ঘটছে। এর মধ্যে কোনো স্বতন্ত্র বিশেষত্ব নেই।

এই কথার উত্তরে সুজন বলেছে, এতদিন ধরে এমনটি ঘটেছে বলেই, তা মেনে নিতে হবে তা কেন? কেন এর ভালমন্দ বিচার করা হবে না? এই কথার মধ্য দিয়ে সুজনকে অনেকটা বাস্তববাদী ও সংস্কারমুক্ত, যুক্তিবাদী এবং প্রগতিশীল ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী বলে মনে হয়।

৬। ৭.১১ চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। ভাল করে এটি পড়ে নিয়ে উত্তর দিন।

৭। ৮। ৯। — ৭.১২ অংশটি ভাল করে পড়ে প্রাসঙ্গিক উত্তর লিখুন।

১০। ৭.১২ ও ৭.১৩ অংশের শেষ পর্যায়ে নাটক সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে, তার সাহায্য নিয়ে উত্তর তৈরি করুন।

১১। শহরে বাসকালীন অসহায়, বিপন্ন কুঞ্জ, রাধিকাকে বলেছে। হৃদয়হীন, শহর জীবনের চেয়ে তার নিজের গ্রামে কুঞ্জ অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে, এই ধারণা থেকে কথাগুলি বলেছে।

হৃদয়হীন শুষ্ক শহর জীবনে কোনোভাবেই স্বাভাবিক হতে পারছে না, তার স্বগ্রামে স্ব-ভূমিতে সে সুস্থ বোধ করবে, এই প্রত্যয় থেকে সে কথাটি বলেছে।

বক্তার এই মন্তব্য থেকে তার মাটির প্রতি চিরন্তন মমত্ব ও আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়।

১২। এই সংলাপটি তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে প্রধান সমাদ্দার উচ্চারণ করেছে। সংলাপটি বিশ্লেষণ করে তাৎপর্য বুঝতে হবে।

১৩। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের আমিনপুরের স্থানীয় পোদ্দার তথা চোরাচালানকারী হারু দত্তের। গ্রামের বৃদ্ধা মহিলা দুঃস্থ পরিবারের মেয়েদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে হারু দত্তের হাতে তুলে দেয় শহরে পাচার করবার জন্য।

চন্দরের অল্পবয়সী মেয়ে। তিন বছর বয়সে তার মা মারা গেলে, অনেক যত্নে সে মা-মরা মেয়েটিকে লালন করে বড় করেছে। খুকীর মা মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে চন্দরের মেয়েকে হারু দত্তের হাতে তুলে দেয়। হারু দত্ত চন্দরকে দিয়ে একটি কাগজে টিপ-ঠাপ দিইয়ে নেয়।

এখানে বক্তা হারু দত্তের চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা হল এই যে, সে শুধু মজুতদারই নয়, একজন হীন মেয়ে পাচারকারী। ধুর্ত ব্যবসায়ী এই অন্যায় কাজটি অত্যন্ত সতর্কভাবে করে। পাকাপোক্ত করবার জন্য নিরক্ষর মানুষগুলোকে দিয়ে নিজের ইচ্ছেমত কথা লিখিয়ে নেয়।

অনুশীলনী ৪ :

১। 'নবান্ন' নাটকে দয়াল, চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে একথা বলেছেন। প্রসঙ্গটি হল ফসল কাটা, ঝাড়া, তোলা তারপর সেই ফসল রক্ষে করার সমস্যা।

অল্প সময়ে এ কাজ সম্পন্ন করা খুবই দুরুহ। তারই একটা উপায় সকলে মিলে আলোচনা করে ঠিক করতে হবে। ঘরে খাদ্যাভাবের পরিণতি কি দয়াল তার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে দয়াল এ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করে বলেছেন ফসল রক্ষে করতে না পারলে 'মিত্যু ছাড়া গত্যন্তর' থাকবে না।

'মিত্যু' থেকে গত্যন্তরে'র উপায় অনুসন্ধান করতে গিয়ে নানা জনে নানা কথার অবতারণা করলেও কোনো ইতিবাচক মতে পৌঁছানো যখন যাচ্ছে না, অথচ বড়োকর্তা এটা বুঝেছে "দুইচার দিনের ভেতর ফসল কাটা হল তো হল, নয় তো বিলকুল পয়মাল হবে।" অবশেষে দয়াল 'সকলে মিলে গাঁতায়' খাটার প্রস্তাব দিয়ে বলে, "অতিকম পঁচিশ ঘর গেরস্তের সাহায্যও যদি পাওয়া যায়, সকলে মিলে গাঁতায় খাটার পিতিজ্ঞে করে, তা হলে একদানা ফসলও জমির নষ্ট হতে পারবে না। দশ হাতে ফসল গোলায় তুলে ফেলা সম্ভব।" তাই ফসল যাতে নষ্ট না হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে সব্বার আগে। আমিনপুরবাসী এ ভাবেই মিত্যু থেকে রেহাই পেয়েছে।

২। 'নবান্ন'-এর গঠনরীতি (৭.৮ অংশের মূলাঠ ৪) সংক্রান্ত আলোচনা পড়ে উত্তর তৈরি করুন।

৩। বক্তা মূলাপাঠ ৭(দ্রষ্টব্য ৭.১৫) অংশটি পড়ে উত্তর লিখুন।

৪। চতুর্থ অঙ্কে তৃতীয় দৃশ্যে উদ্ধৃত কথাগুলি আংশিক মানসিক ভারসাম্য হারানো প্রধান সমাদ্দারের কথার উত্তরে বলেছে দয়াল মণ্ডল। অন্য সকলের মত দয়ালের ওপর দিয়েও জলোচ্ছ্বাসের দাপট গিয়েছে। তা সত্ত্বেও যখন তারা অনেকেই বেঁচে আছে, তখন এমনটি করতে হবে যাতে আকাল আর আচম্বিতে এসে কোনো স্বজনকে ছিনিয়ে নিতে না পারে। দয়ালের এই উক্তির মধ্য দিয়ে একটি আশাবাদী মানুষের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

৫। মূলপাঠ ৩ (দ্রষ্টব্য ৭.৭) অংশের শেষের দিকে এ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনা আছে। সেটি অনুসরণ করে উত্তর দিন।

৬। ৭.১৩ অংশের মূলপাঠ ৭ ভালো করে পড়ে উত্তর তৈরি করুন।

৮৭.২০ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

১। বিজন ভট্টাচার্য—*নবান্ন*।
২। ড. দিলীপকুমার নন্দী ও ড. নবকুমার মণ্ডল— *প্রসঙ্গ : নবান্ন*।
৩। ড. দর্শন চৌধুরী — *গণনাট্য আন্দোলন*।
৪। ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদিত) — *মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক (১ম-৩ য় খণ্ড)*।
৫। ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদিত) — *বস্তুবাদী সাহিত্য বিচার ও অন্যমত*।
৬। বহুরুপী — *'নবান্ন' স্মারক সংখ্যা ১. অক্টোবর ১৯৬৯ এবং স্মারক সংখ্যা-২, অক্টোবর ১৯৭০*।

৮৭.২১ অতিরিক্ত পাঠ

পরিশিষ্ট—১

'নবান্ন' নাটক প্রকাশিত ও মঞ্চস্থ হওয়ার পর সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন লেখক ও সমালোচক যে মতামত প্রকাশ করেন তার কয়েকটির নির্বাচিত অংশ উপস্থাপিত হল :

১৯৪৪ সালের ২৭ শে অক্টোবর আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করা হল—

'জবানবন্দী' বাংলা নাট্যধারাকে নতুন পথে শুধু চালনা করার ইঙ্গিত দিয়াছিল। 'নবান্ন'র সেই ধারা আরো অগ্রসর হইয়াছে, গণনাট্য সংঘের নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, আমাদের দেশের উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত জনজীবনকে ইহারা নাট্যরুপ দিতেছেন। গত তিন বৎসর ধরিয়া বাংলার কৃষক সাধারণের ওপর দিয়া যে ঝড়-ঝাপটা যাইতেছে 'নবান্ন' তাহারই আলেখ্য। অতি পরিচিত উচ্চশ্রেণীর মধ্যবিত্তের পরিবর্তে এই স্তরের জনগণ সম্বন্ধে নাটক লেখা ও অভিনয় করা যে কি দুঃসাধ্য তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বহু চরিত্র সমন্বিত এই সুদীর্ঘ নাটকটি যেরূপ কুশলতার সহিত অভিনীত হইয়াছে তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। বড় হইতে ছোট প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্র অভিনয় সমান তালে চলিয়াছে। পেশাদার অভিনেতা অভিনেত্রীদের তুলনায় ইহাদের অভিনয় কোন অংশে ন্যূন মনে হয়না; বরং নতুন দৃষ্টি ও মননের গুণে কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।"

ঐ একই তারিখে যুগান্তর পত্রিকা লিখল, "এতকাল আমরা রঙ্গামঞ্চে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বা সামাজিক নাটকের পেশাদারী অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছি। কিন্তু গণনাট্য সংঘ এক নতুন জিনিসের আমদানী করিয়াছেন, তাহারা কেহই পেশাদার অভিনেতা অভিনেত্রী নহেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, যুগের রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন তরুণ তরুণীরা এই অভিনয় করিয়াছেন। আগস্ট আন্দোলন, বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর পটভূমিকায় এই নাটকের গল্পাংশ রচিত এবং সমাজের যাহারা একেবারে নীচের তলায়

বাংলার সেই দুঃস্থ কৃষকের জীবন ইহার মধ্যে প্রতিফলিত। ইহা সত্যসত্যই গণজীবনের প্রতিচ্ছবি। যতদূর সম্ভব গণনাট্য সংঘ 'নবান্ন'কে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীগ্রস্ত বাঙ্গালার যে দৃশ্য ইহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা দেখিয়াঅশ্রু সংবরণ করা কঠিন। এই ধরনের নাটক কেবল নতুনতর আর্ট হিসাবেই প্রশংসনীয় নহে দুঃস্থ ও নিপীড়িত মনুষ্যত্বের প্রতি ইহা যে বেদনা জাগ্রত করে তাহার মূল্য অনেক।"

ওই সালেই ('পরিচয়' চৈত্র, ১৩৫১) **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়** 'নবান্ন'কে ভারতের মর্মবাণী ঘোষণা করে লিখলেন, 'এদের এই অপূর্ব অভিনয়নৈপুণ্য কোথা থেকে এল? কি এদের অভিনয় সাফল্যের মর্মকথা? এর একটি মাত্র জবাব জানি—এঁরা শুধু শিল্প-প্রাণ নন, দেশপ্রাণও বটে। আর্টের জন্য আর্টের ধোঁয়ায় এঁদের চোখ কটকট করেনা, শিল্পীর কর্তব্য সম্বন্ধে এঁদের দ্বিধাও নেই, দুর্বলতাও নেই এই প্রসঙ্গে গণনাট্য সংঘের বাংলা শাখার এমনি অল্পবয়সী এ্যামেচার অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রদর্শিত 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন'র কথা স্মরণীয়। এ দুটি নাটক নাট্যজগতে কি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে কারো তা অজানা নয়। 'নবান্ন' অভিনয়ের জন্য আজ চেষ্টা করেও স্টেজ ভাড়া পাওয়া যায়না। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের কর্তারা ভয় পেয়ে গেছেন। অথচ এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার কোন ইচ্ছাই গণনাট্যের নেই।'

ওই সংখ্যায় (পরিচয়ে) তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, "বাংলা সাহিত্যে নাটকের ক্ষেত্রে নূতন আবেগ এবং নূতন সুর যোজনা করেছেন বিজন ভট্টাচার্য। এই মন্বন্তরকে অবলম্বন করে সে সুর, সে আবেগ পরিপূর্ণ বিকাশলাভ করেছে।'

হিরণ সান্যাল (পরিচয়, পৌষ ১৩৫১) বলেছেন, 'সংলাপ, বিষয়বস্তুতে, ঘটনা-সমাবেশে, বিজনবাবুর কলম এতদূর এগিয়েছে যে বাংলা রঙ্গমঞ্চে ও বাংলা সাহিত্যে তিনি নতুন হাওয়া এনেছেন, এই কথা না বললে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে।"

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিগুলি থেকে একটা সাধারণ সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, 'নবান্ন' নাটকে একটা আলোড়ন সৃষ্টিকারী নতুনত্বের বার্তাবহ। 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন'-র আগে নাটক ছিলনা, একথা বলা যাবে না কিন্তু তা থেকে কোন নাট্যকার তেমন প্রেরণা পাননি, কোন গ্রুপ থিয়েটারেরও জন্ম হয় নি, কোন আন্দোলনও সৃষ্টি করতে পারেনি। তাই একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে 'নবান্ন' ক্রান্তিকাল-সৃষ্টিকারী এক অপূর্ব শিল্পকর্ম, ঐতিহাসিক দিক থেকে সবিশেষ তাৎপর্যবহ।

'নবান্ন' নাটকের কিছু অন্যতর সমালোচনা।

'নবান্ন' নাটকে যে কৃষককে আমরা দেখি, দুর্ভিক্ষপীড়িত সে কৃষক মরে কিন্তু লড়ে না, লড়াইয়ের চিন্তাও করেনা। 'নবান্ন' নাটক কাঁদায়, কিন্তু দুর্ভিক্ষ সৃষ্টকারীদের বিরুদ্ধে ক্রোধ উদ্দীপ্ত করেনা। কি করে করবে? দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী প্রধান আসামী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই যে সেখানে অনুপস্থিত। যাদের দেখি

—মজুতদার, নারী-ব্যবসায়ী— তারা ঘৃণ্য বটে কিন্তু তারা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি মাত্র, কোন শ্রেণীর প্রতিভূ নয়। আর বাঁচার পথ?—(যা নাটকের শেষে জোর করে জুড়ে দেওয়া একটা ক্রোড়দৃশ্য) সব জমি এক করে চাষ করো তাহলেই সব দুঃখ-কষ্ট মিটে যাবে। অর্থাৎ, কোন লড়াইয়ের দরকার নেই, শ্রেণী-সংগ্রাম মিছে কথা। অল্প কথায়, এই হল 'নবান্ন' নাটকের বিষয়বস্তু। এর মধ্যে বিপ্লবটা কোথায়? কৃষক পাত্রপাত্রী 'নবান্ন' পাদপ্রদীপের সামনে এসেছেন তা সত্যি, তাঁরা কৃষকের ভাষায় কথা বলেছেন এটাও ঠিক, কিন্তু তবু কি তাঁরা কৃষকের কথা বলেছেন? শ্রমিক-কৃষক নিয়ে নাটক রচনাই কি গণনাট্যের শেষ কথা? তাহলে 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'-কে গণসাহিত্য বলতে দোষ কি? আসলে জনতাকে নিয়ে লিখলেই বিপ্লবী নাটক বা বিপ্লবী উপন্যাস হয়না। জনতাকে নিয়ে কি লেখা হল, সে জনতার শ্রেণীচরিত্র যথার্থভাবে ফুটেছে কিনা, শত্রুর বিরুদ্ধে সে নাটক হাতিয়ার হয়ে ওঠে কিনা— এটাই বিপ্লবী নাটকের মূল কথা। এইভাবে বিচার করলে, 'নবান্ন'কে কি বিপ্লবী নাটক বলা যায়? না তা নিয়ে গর্ব করা শোভা পায়? তার ওপর আঙ্গিকের দিক থেকেও নাটকটি এমনভাবে রচিত যে নাট্যমঞ্চের বাইরে তার অভিনয় এক প্রকার অসম্ভব।

বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা। রচনা : প্রকাশ রায় (প্রদ্যোৎ গুহ)। দ্রষ্টব্য : মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক (১ম খণ্ড) — সম্পাদনা : ধনঞ্জয় দাশ, ১৯৭৯, পৃঃ ৬৫।

পরিশিষ্ট — ২

'নবান্ন' নাটক প্রকাশ ও গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে সফল অভিনয়ের পর সমকালীন কয়েকটি প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকায় যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল তার কিছু অংশ শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে নিচে মুদ্রিত হল :

(ক)

নবান্ন/সুশীল জানা

শ্রীরঙ্গমে 'নবান্ন'র অভিনয় দেখলাম। এর আখ্যানভাগ শুরু হয়েছে ১৯৪২ সালের উচ্ছৃঙ্খল রাজনীতির পটভূমিকায়। শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রাচীন পাশব-নীতি প্রজামণ্ডলের মাঝখানে ধনপ্রাণের বিনিময়ে একটা তথাকথিত শৃঙ্খলা নিয়ে এলো—এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম-বাংলার বাসিন্দা যারা—যারা কৃষাণ, কৃষি, মজুর, যারা শুধু এতদিন পরিচয় পেয়ে এসেছিল তাদের নিকটতম প্রভু জমিদার-মহাজনের, তাদের সুমুখে আর একটা নির্মম পরিচয় উদঘাটিত হল।

এই এর শুরু। তারপর এলো ঝড়—এলো প্লাবন, চারিদিক জুড়ে নামল দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর কালো ছায়া। ১৯৪৩-৪৪ সাল জুড়ে চললো এক নিরবচ্ছিন্ন নিরুপায় অবস্থার ধারা। ধান নেই, চাল নেই, ওষুধ নেই, সহায় নেই, গ্রাম-বাঙলা ছারখার হতে চল্‌লো। জীবনের বলিষ্ঠ সংগ্রামকে যারা রূপ

দিয়ে নিজের করে নিতে পারে—তারাই বাঁচে, বাঁচার চেতনায় জর্জরিত হয়, আর দুর্জয় হয়ে ওঠে। যারা পারে না—তারা মরে। এমনি করে মরে গিয়েছে অনেকে। তবু নিঃশব্দ এই শ্মশানভূমি থেকে জীবনের ঝঙ্কার ওঠে। এই ঝঙ্কারই 'নবান্ন'র কাহিনী। রাজনীতি, মহাজনী-নীতি আর ধনতন্ত্রের কূটিল অর্থনীতি—এই তিন নীতির ঘূর্ণিতে পড়ে গ্রাম গ্রাম-বাঙলার জনগণ চললো ভেসে, আর দূর্যোগের অন্ধকারে চরম অসহায়তার মাঝখানে পরিচয় লাভ করল একটা সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধমূলক অমর জীবনের—বিরাট সংগ্রামশীল জীবনের। এই হলো 'নবান্ন' নাটকের আবহাওয়া।

প্রচলিত নাট্যকাহিনীগুলির মতো এর গল্পাংশ কোনো নায়ক-নায়িকাকে কেন্দ্র করে ক্রমোন্নত একটা চরম আবহাওয়ায় এসে শেষ হয়নি। এবং কাহিনী গোটা আমিনপুর নিয়ে—বাঙলার সমস্ত গ্রামকে নিয়ে। দুর্দিনতাড়িত প্রধান সমাদ্দারের পরিবারের আশেপাশে অসংখ্য পরিবার এসে মিশেছে পথের প্রান্তে। নায়ক-নায়িকার বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করে সবগুলি চরিত্রই তাদের জীবনের নির্মম বক্তব্যকে ভাষা দিয়ে গিয়েছে। আগাগোড়া একটা জীবনের বাস্তববোধকে বলিষ্ঠ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠতে শোনা যায় প্রত্যেকটি চরিত্রে—সেখানে কেউ কারুর চেয়ে খাটো নয়, কেউ কারুর চেয়ে বড় নয়। একজনের দুঃখ নাটকের পরিণতির খাতিরে আর সকলের মর্মবেদনাকে ম্লান করে দেয়নি। জীবনের এই বাস্তববোধ আর সামঞ্জস্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা দুর্লভ গুণ। নাটকের গতির সঙ্গে সঙ্গে একটা জিনিস মনে আঘাত করে। মনে হয় এর প্রত্যেকটি দৃশ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রত্যেকটি দৃশ্য শেষ হচ্ছে একটা চরম আবহাওয়ায় এসে। তাতে নাট্যকাহিনীর ক্রমপরিণতি ব্যাহত হচ্ছে। ১৯৪২ সাল থেকে ৪৪ সাল পর্যন্ত যে বিভিন্ন বিপর্যয় নেমে এসেছে গ্রাম-বাঙলার গণজীবনে—তার প্রত্যেকটিতে দেখানো হয়েছে যেন বিচ্ছিন্ন করে। গণজীবনের বিরাট এক গোষ্ঠী নিয়ে এর পরিকল্পনা, তাতে কিন্তু এইটে আসাই স্বাভাবিক। এবং গত তিন বছরের বিভিন্ন বিপর্যয়—তারা কেউ কারুর চেয়ে খাটো নয়। প্রত্যেকটি নাট্যস্রষ্টার গভীর অন্তদৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। যার ফলে বিভিন্ন বিপর্যয়-সমন্বিত দৃশ্যগুলি সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

'নবান্ন'কে ভোলা যায়না। এই তিন বছরের আবহাওয়া দেশী-বিদেশী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বহু কারণে যেমন নাটকীয় হয়ে উঠেছে—তেমনি একটা বিরাট ও অমর জীবনদর্শনের পরিচয় হয়েছে—যা ছাড়া আমরা বাঁচতে পারিনা, আমাদের জাতীয় জীবন—আমাদের গণজীবন বাঁচতে পারেনা। সে হচ্ছে সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, বলিষ্ঠ সংগ্রামশীল জীবনের আত্মচেতনা। এই আত্মচেতনা এসেছে ধীরে ধীরে—আমাদের গণজীবন অর্জন করেছে একে বীর্য দিয়ে, মূল্য শোধ করেছে নির্মমভাবে। গোটা নাটকটি জুড়ে এই চেতনা ধীরে ধীরে পরিবর্ধিত হয়েছে। নানান বিপর্যয়ের মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে আমিনপুরের সমাদ্দার-পরিবার আর আশেপাশের বহু পরিবার পরিচয় পেয়েছে তার চারপাশের। পথের জীবনের পরিচয় পেয়েছে পথের। এইরকম একটা সমগ্রতার সঙ্গে পরিচয়ের পরই একটা বলিষ্ঠ জীবনদর্শন গড়ে উঠতে পারে। তাই নাট্যকাহিনীর ক্রমপরিণতির যে ত্রুটিটা বিচ্ছিন্ন

দৃশ্য বলে মনে হয়—সেই ত্রুটির অন্তরালে গত তিন বছরের আবহাওয়ার একটা ক্রমপরিণতির ধারা নাট্যসংঘাতের চড়াই-উৎরাই ভেঙে সুষ্ঠুভাবে এগিয়েছে। খোলা মনে শিথিল দেহে নাটক-দেখতে গিয়ে ফিরে আসতে হবে প্রতিজ্ঞা-কঠোর মন নিয়ে, দৃঢ় মুষ্ঠিতে বলিষ্ঠ এই প্রাণশক্তির উদ্বোধন 'নবান্ন'র প্রাণবস্তু। সমাদ্দার-পরিবারের পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ—গ্রামবাঙলার পিতৃপুরুষ প্রধান সমাদ্দার উন্মাদ নয়, সে একটা প্রাণপ্রাচুর্যের দুর্জয় উন্মাদনা। বাঙলার গণজীবনের এই প্রাণস্পন্দন কোথাও দেখিনি, 'নীলদর্পণে'ও না। এতদিন শুধু দেখেছি নিরুপায় মর্মান্তিক মৃত্যু, আর সকাতর আর্তনাদ। সেইটেই শুধু সত্য নয়—তারও আড়ালে জীবনের একটা সুগভীর আর্তনাদ আছে, যেটা সাহিত্যকে বিরাটত্ব দান করে—সার্থক সৃষ্টির পথে এগিয়ে দেয়। সাহিত্যের সেইটেই বড় বাস্তব—বড় সত্য। সেই সাফল্যের পথযাত্রী রূপে আমরা 'নবান্ন'র রচয়িতা শ্রীযুক্ত বিজন ভট্টাচার্যকে অভিনন্দন জানাই।

তারপর 'নবান্ন'র অভিনয়নৈপুণ্য। প্রত্যেকটি চরিত্রের পেছনে সমসাময়িক আবহাওয়ার এমন একটা মর্মান্তিক প্রেরণা আছে, যার ফলে তারা কমবেশি নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে সার্থক ও সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেমন বৃদ্ধ ভিখিরির চরিত্রে অধ্যাপক গোপাল হালদার, পঞ্চাননীর ভূমিকায় শ্রীযুক্তা মণিকুন্তলা সেন প্রভৃতি। বড় চরিত্রগুলির তো কথাই নেই। এই নৈপুণ্যের মস্ত বড় একটা প্রেরণা যেমন অভিনেতাদের গণজীবনের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংযোগের ফলে, তেমনি ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কর্মীদের বিরাট আশাবাদী অবিচলিত দেশপ্রেমের জন্যও বটে।

বাঙলার নাট্যশালাগুলি মাকড়সার মতো জাল বুনে চলছিল ঘরের কোণের অন্ধকারে—হৃদয় দেওয়া-নেওয়ার সহস্র কাহিনীকে অবলম্বন করে। দর্শকসাধারণ এই নিয়ে ছিল অন্ধ। কোনো রাজনৈতিক দলে না ভিড়ে বৃহত্তর জাতীয় জীবনের সঙ্গে কোনো পরিচয় ছিল না নগরবাসীদের তথা জাতীয় জীবনের শিক্ষিত অংশের। নানা বিরোধী ভাবধারার মধ্যে তারা বিভ্রান্ত হয়েছে, বিচলিত হয়েছে। এবং মাঝখানে জাতীয় সংস্কৃতির উদ্‌যাপনকল্পে একদল তরুণ-তরুণীর আর্বিভাব ও গণনাট্য সংঘের সৃষ্টি বাংলার নাট্যসাহিত্য ও মঞ্চশিল্পকে এক নতুন সৃষ্টির পথে অগ্রসর করে দিয়েছে। সুমুখে বিপদ আছে অনেক তবু আমরা আশা করব—বাংলা নাট্যসাহিত্যের, জাতীয় সংস্কৃতির, গণজীবনের সম্ভাবনাময় বিরাট সংগঠনের। গত তিন বছর নিশ্চয়ই নিঃশেষে হারিয়ে যাবেনা। জাতীয় জীবনকে যে নির্মম মূল্য দিতে হয়েছে তা ব্যর্থ হবেনা। বাস্তবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই মানুষকে বাঁচবার প্রেরণা জোগায়, তাকে মহান করে—বিরাট করে; তাকে পথ দেখায়।

'নবান্ন'র মঞ্চ-ব্যবস্থাপনায় শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্য যে সাফল্য ও কলানৈপুণ্য দেখিয়েছেন—তা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

(২)

নবান্ন / মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

যাঁরা 'জবানবন্দী' দেখেছেন, তাঁরা 'নবান্ন' থেকে নূতনত্বের চমক পাবেন না। কিন্তু পাবেন আর এক ধরনের চমক। বিস্তৃতি ও বলিষ্ঠতায় গণনাট্য সংঘের দ্রুত উন্নতি সত্যই চমকপ্রদ।

'নবান্ন' পড়ে মনেই হয়না এর মঞ্চোপযোগিতা থাকতে পারে। এ নাটককে রূপ দেবার সাহস ও সফলতা গণনাট্য সংঘের পক্ষেই সম্ভব। কারণ, এমন আদর্শবাদী রূপতপস্বী সমবায় কোনো ব্যবসাদারী থিয়েটারের পক্ষে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ছোট বড় বহু সংখ্যক ভূমিকা সমানভাবে প্রাণ দিয়ে অভিনয় করতে পারেন তাঁরাই, যাঁরা জানেন মাত্র জনসেবাই এর লক্ষ্য—নিজেদের প্রতিষ্ঠা নয়।

'নবান্ন' নাটকত্বের বিচার অন্য নাটকের সূত্রে চলবে না। এ এক নতুন সৃষ্টি। এদের কানুন তৈরি হবে পরে। এদের পাঠক-দর্শক-সমালোচক কারো মুখাপেক্ষী হয়ে চলতে হয়না। গোড়া থেকেই বাঙালি এদের নিজের বলে চিনে নিয়েছে। সেইখানেই তো গণনাট্য সংঘের সাহস ও শক্তি, আর নতুন নিয়ে পরীক্ষা করবার সুযোগ। গণনাট্য সংঘের দায়িত্বও সেইখানে। 'জবানবন্দী'র পরে 'নবান্নে' সে দায়িত্ববোধের পরিচয় দর্শক যথেষ্ট পেয়েছেন।

রস পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজমনকে সাময়িক সমস্যার প্রতি মনোযোগী করে তোলবার শিক্ষা পরিবেশন গণনাট্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। নিকটতম উদ্দেশ্য পিপল্‌স রিলিফ কমিটির প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহ। বাংলায় অনাহার মৃত্যু চোখের ওপর ঘটেছে না বলে বন্ধ হয়নি। এখন আবার মহামারীর পালা। রিলিফের কাজ বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হবার সময় এখনো অনিশ্চিত ভবিষ্যতে। গণনাট্য সংঘের অভিনয় এখনো তাই ক্ষুধার্ত পীড়াগ্রস্ত বাংলার আর্তনাদ। সংঘ দেশবাসীর কাছ থেকে কামনা করেন, ধনীর কাছ থেকে ধন, শিল্পীর কাছ থেকে শিল্পজ্ঞান, সমালোচকের কাছ থেকে উপদেশ। আশার কথা, সাধারণভাবে সংঘ তা পাচ্ছেন।

বিজন ভট্টাচার্য নাট্যকার-অভিমানে নাটক লেখেননি। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নমুনা নিয়ে এক একটি চরিত্রের মুখে তাদের কথা সহজভাবে বলিয়েছেন। প্রতিকূল সমাজব্যবস্থার অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ভয়ে কারো মনে স্বস্তি নেই, যে যার কোলে ঝোল টানবার জন্যে ব্যস্ত। মূলধনীর ধনবৃদ্ধির লোভ, মধ্যবর্তী দালালের আত্মরক্ষায় হিতাহিত জ্ঞানলোপ, নিম্নমধ্যবিত্তের অসহায় অবস্থার ফলে হৃদয়হীনতা, আর সকলের চাপে নিষ্পেষিত ভূমিজ চাষী। এই অব্যবস্থিত সমাজ বাইরের সামান্য আঘাতে টালমাটাল তো হবেই।

কিন্তু ধ্বংস যত বড়ই হোক প্রাণের অঙ্কুর তার ফাটলের মাঝখান দিয়ে আবার গজিয়ে ওঠে. মানুষের আত্মপ্রত্যয় আর দাম্পত্যজীবনের মাধুর্য সহস্র ঘা খেয়েও যায়না, 'নবান্ন' শেষ পর্যন্ত এই আশার বাণী শুনিয়ে যায়। সমাজের কাঠামোকে শক্ত করতে গেলে জ্ঞাতসারে সমবেত চেষ্টার যে প্রয়োজন, নিরক্ষর চাষীর কাছেও তা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে চাষীরা 'গাঁতায় খাটতে' লেগে যায়।

অভিনয়শক্তি সকলের সমান থাকেনা, শিক্ষার সুযোগও সকলের সমান হয়নি, কাজেই ব্যক্তি নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা এঁদের করবনা। সকলেই সমান আন্তরিকতার সঙ্গে, উদ্দেশ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করে যে অভিনয় করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। একটি অনাড়ম্বর অথচ সুষ্ঠু পৃষ্ঠপটের সম্মুখে অভিনয় এঁদের তাই এত প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। এতগুলি ছোট বড় ভূমিকাকে এরূপ নিপুণভাবে একসূত্রে গেঁথে তোলা উচ্চশ্রেণীর পরিচালনাশক্তির পরিচয় দেয় এবং আবহধ্বনি ও সুর তার অঙ্গ।

(গ)

নবান্ন প্রসঙ্গে/স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

'পরিচয়' সরাসরি রায় দিয়েছেন : 'নাটক হিসেবে 'নবান্ন'-কে মোটেই সক্ষম রচনা বলা চলে না।" তবু ঐ নাটকের অভিনয় 'পরিচয়'-এর সম্পাদকেরও খুব ভাল লেগেছে। তার কারণ " 'নবান্ন' নাটকের গুরুতর ত্রুটিগুলি অভিনয়ের গুণে অধিকাংশ ঢাকা পড়েছে।"

আমার মতে 'নবান্ন' রীতিমত সক্ষম রচনা, তার একাধিক দোষ ত্রুটি আছে। তা বড় কথা নয়। প্রথম কথা 'নবান্নে' কি পেলাম। এতদিন যাকে আমরা পাবার আশায় ছিলাম তার সবটা না পেলেও যদি তার অনেকটা বা কিছুটাও পেয়ে থাকি, সেই কি কম? 'নবান্নে' পেয়েছি এতকালের অনাদৃত বৃহত্তর বঙ্গদেশকে। বাংলার চাষীর সুখ-দুঃখের দুর্ভোগ-দুর্দশার নৈরাশ্য-সঙ্কল্পের চমৎকার আলেখ্য 'নবান্ন'। কেবল বিষয়বস্তুর জোরেই 'নবান্ন' সার্থক নয়। এ বইয়ের সাহিত্যিক সাফল্যও যথেষ্ট। 'নীলদর্পণ'-এর বহুকাল পরে বাংলার অপাংক্তেয় কৃষক বাংলা রঙ্গমঞ্চের নিষিদ্ধ রাজ্যে প্রবেশাধিকার আদায় করে নিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার নিজের কথা নিজের মতো করেই অনায়াসে বলেছে, কেঁদেছে, কোঁদল করেছে। হাসিয়েছে, নাড়া দিয়ে চলে গেছে। এক কথায় নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। এ কি অক্ষমতার পরিচয়? অনভ্যস্ত মাঝে মাঝে কখনো আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে কিংবা দু-এক স্থানে একটু-আধটু বাড়াবাড়ি হয়তো করে ফেলেছে। সেই কি একমাত্র বিচার্য বিষয়।

'নবান্ন'-র ত্রুটিগুলির অধিকাংশ তার Birthmarks, নতুন ভুঁইফোঁড় নয়। পুরাতনের জঠর থেকে আসে সে। যে দু-চারটে গতানুগতিক বা মঞ্চঘেঁষা ত্রুটি আছে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পরবর্তী নাটকগুলিতে সে-সব গৌণ বিষয় এক এক করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বলে আমরা আশা রাখি। 'নবান্ন' নবাঙ্কুর বলেই তার অবশিষ্ট ত্রুটিগুলিও আর এক অর্থে ত্রুটি নয়—সেগুলিকে প্রচলিত নাট্যকলা বিচারের অভ্যস্ত চশমা চোখে এঁটে বিচার করলে চলবে না। যেমন, কেউ কেউ বলেছেন, একখানি নাটকে এতটা ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের ভিড়ে ঠাস বুনটের গলদ রয়ে গেছে। এ অভিযোগ সত্যি হলেও তাকে অসাফল্য বলা চলেনা। নতুন সর্বত্র বা প্রধানত পুরাতনের বিধিবিধান না মেনে নির্ভুল পথে পা বাড়িয়েছে কিনা সেই কথাই বিচার্য। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের অভিমত উল্লেখযোগ্য মনে করি, "নবান্ন নতুন নাটক। এর কানুন রচিত হবে পরে।" 'পরিচয়' বলেছেন, "ঘটনা-পরম্পরায় এই প্রকাণ্ড তালিকা

যাকে গত দু-বছরের বাংলাদেশের ইতিহাস ও সমালোচনা বলা যায় একে সুদৃঢ় গল্পের ভিত্তিতে নাট্যরসাশ্রিত করে তোলা যুগান্তকারী প্রতিভার অপেক্ষা রাখে।" যুগান্তকারী প্রতিভা কি স্বয়ম্ভু? তা যদি না হয় তবে একদিন যুগান্তকারী প্রতিভা 'নবান্ন' প্রভৃতির কল্যাণে অনেকখানি তৈরি পথ পাবেন। সেই পথ পরিষ্কারের কাজকে কি মোটেই সক্ষম রচনা নয় বলব? 'পরিচয়' সম্পাদকের অভিমতের ন্যায় আমার এই মতামতও চূড়ান্ত বলে গৃহীত হতে পারেনা। সমঝদার মহলের কাছ থেকে সমালোচনা আমরা প্রত্যাশা করি। ছোট বড় ত্রটিবিচ্যুতিগুলি নিয়েও 'নবান্ন' এমন এক বহুপ্রত্যাশিত ফললাভ—যার সম্পর্কে এক কথায় বায় দেওয়া সম্ভবও নয়, সমীচীনও নয়।

(ঘ)

নবান্ন/কালিদাস রায়

'নবান্নে'র অভিনয় এতই চমৎকার হইয়াছে যে, আমি যে নগরের রঙ্গালয়ে বসিয়া অভিনয় দেখিতেছি তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। হাবভাব, চালচলন, বাগ্‌বিন্যাস, উচ্চারণভঙ্গি এমন কি আকৃতি প্রকৃতিতে এমন যথাযথতা, কোনো, অভিনয়ে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়না। আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক। আমরা কাঙাল চাষীদেরই প্রতিবেশী। কাজেই যথাযথ হইল কি না বলিবার অধিকার আমাদেরই আছে—চিরনগরবাসীদের নাই।

এই অভিনয় দেখিতে গিয়া আর একটা কথা মনে হইয়াছে। নগরের শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা নাগরিক বেশ ত্যাগ করিয়া চাষা-চাষীদের বেশ ধারণ করিয়াছিল। মনে হয় নাই তাহারা চাষা-চাষাণীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে মনে হইয়াছে—গরীব, দুঃখী, চাষা-চাষাণী ও নগরের যুবক-যুবতী একই জাতির লোক—অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকৃতি প্রকৃতিতে কোনো বৈষম্য নাই। কেবল জামা জুতা চশমা ঘড়ি চুরুট সিগারেট ইত্যাদিই পল্লী ও নগরের মধ্যে একটা কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে—দর্জ্জি ও ধোবা একই জাতির লোককে এতটা পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। এই পুরাতন সত্যকেই সেদিন হারাধনের মতো যেন ফিরিয়া পাইলাম।

বহু কাব্য-উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বাংলার দুঃস্থ দুর্গত পল্লীজীবনের চিত্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছি ; কিন্তু তাহাতে আমার তটস্থ উদাসীন সাহিত্যিক মন বিচলিত হইয়া আমার নেত্রযুগলে বাষ্পের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। 'নবান্নে'র অভিনয় দেখিতে গিয়া আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। এই অশ্রু অলস বাষ্প মাত্র নয়—সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে একটা অকপট কল্যাণ বুদ্ধির উন্মেষ হইয়াছে। মনে হইয়াছে, এই দুঃস্থ দুর্গতদের জন্য আমার যতটুকু করিবার ছিল তাহা করাহয় নাই। এজন্য অনুতাপ জন্মিয়াছে—নিজের আরাম বিলাসের হৃদয়হীন জীবনযাত্রার প্রতি ধিক্কার জন্মিয়াছে—ভবিষ্যতে আমার যতটুকু সাধ্য ততটুকু কবিবার জন্য সংকল্পও জাগিয়াছে। তাহাছাড়া দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, ধর্ম, কৃষিশিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা চিন্তার উদ্ভব হইয়াছে। *মোটের* উপর 'নবান্ন' আমার হৃদয় ও মস্তিষ্ককে আমূল আলোড়িত

করিয়াছে। এই সমস্তই সাময়িক সন্দেহ নাই—কিন্তু মনের উপর একেবারে কোনো ছাপ রাখিয়া যায় নাই তাহা মনে হয়না। আজ একমাস অতীত হইল এখনো আমার মন হইতে 'নবান্নে'র ছায়া অপসারিত হয় নাই।

'নবান্ন' অভিনয় দেখিয়া সুখী হইয়াছি। 'নবান্ন'কে একটি পরিপূর্ণাঙ্গ নাটক না বলিয়া ইহাকে একখানি দৃশ্যকাব্য বলিতে চাই। ইহাতে গীতধর্ম অপেক্ষা চিত্রধর্মই অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহা কতগুলি জীবন্ত জ্বলন্ত প্রাণস্পর্শী দৃশ্যের একত্র গ্রন্থন, খাঁটি বাংলার জীবনসূত্রে, পঞ্চাশের মন্বন্তরের আবহাওয়ায়।

মাটির যাহারা খাঁটি মালিক—আসল বাংলাদেশ যাহাদের সুখদুঃখের মধ্যে অবিরাম স্পন্দিত হইতেছে তাহাদের উপেক্ষিত জীবনযাত্রা লইয়া রচিত নাটক বাংলা সাহিত্যে এই বোধহয় প্রথম। এই নাটক পূর্ববর্তী কোনো নাটকের অনুকৃতি নয়। ইহার বিষয়বস্তুতে মৌলিকতার দাবি অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নবযুগে নাট্যসাহিত্যের ইহা অগ্রদূত।

আমরা নানা প্রবন্ধে, সংবাদপত্রে, কবিতায় ও উপন্যাসে দেশের মর্মস্থলের কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু সে পরিচয় একটা কোনো না কোনো পর্দার মধ্য দিয়া। 'নবান্ন' রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া আমাদের সম্মুখে দেশের মর্মস্থলকে প্রত্যক্ষভাবে উদঘাটিত করিয়াছে।

(ঙ)

নাট্যকলা : নবান্ন/হিরণকুমার সান্যাল

(১)

সম্প্রতি ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বাংলা শাখা কর্তৃক কলকাতার 'শ্রীরঙ্গম' রঙ্গালয়ে শ্রীযুক্ত বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকটি একাধিকবার অভিনীত হয়েছে। এ নাটকখানা ও গণনাট্য সংঘের এ সার্থক অভিনয় বিশেষ আলোচনার যোগ্য। বারান্তরে আমরা তা করব আশা করি।

নাটক হিসাবে 'নবান্ন'কে মোটেই সক্ষম রচনা বলা চলেনা। এতে গল্পের অখণ্ডতার চেয়ে ঘটনার ব্যাপ্তি এবং নাটকীয় আবেগের একাগ্রতার চেয়ে বৈচিত্র্যই বেশি লক্ষণীয়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট বিশৃঙ্খলার পর থেকে বাংলার চাষী ও গ্রাম্যজীবনের আওতায় দুর্ভিক্ষ, মহামারী থেকে শুরু করে যতগুলি মর্মান্তিক বিপ্লব ঘটে গেছে, সেগুলি, আর সেই সঙ্গে মধ্যবিত্ত-জীবনের সংবাদপত্রীয় মন্বন্তরবিলাস, ব্যবসাদারী চাল ও নারী রপ্তানির হৃদয়হীনতা, কিংবা সরকারী চিকিৎসা, রিলিফের অক্ষম প্রহসন—এতগুলি ব্যাপার এই একটি নাটকে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনা-পরম্পরার এই প্রকাণ্ড তালিকা, যাকে গত দু'বছরের বাংলাদেশের ইতিহাস ও সমালোচনা বলা যায়, একে সুদৃঢ় গল্পের ভিত্তিতে নাট্যরসাশ্রিত করে তোলা যুগান্তকারী প্রতিভার অপেক্ষা রাখে। সেই প্রতিভার পরিচয় আজও পাওয়া যায়নি। তবে, বিজনবাবু নতুন ধরনের নাটক রচনার চেষ্টা করে বাংলা সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে এক নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন, এ কথা স্বীকার করতে হবে।

'নবান্ন' নাটকের গুরুতর ত্রুটিগুলি অভিনয়ের গুণে অধিকাংশ ঢাকা পড়েছে। এই অভিনয়ের বিশেষত্ব এই যে, এর সার্থকতার মূলে রয়েছে ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিভা নয়, সমগ্র মণ্ডলীর উৎসাহিত উদ্যম। বাংলাদেশের অনেক লেখক ও শিল্পীদের মধ্যে আজ যে নতুন প্রেরণার পরিচয় পাওয়া যায়, গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে আজই সেই প্রেরণা সঞ্চারিত হয়েছে বাংলা রঙ্গমঞ্চে—তাই সাহিত্যের মতো সেখানেও অনেক বেশি মূল্যবান বর্তমানের সামান্য সার্থকতার চেয়ে ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনার আশাপ্রদ ইঙ্গিত।

(পরিচয় : আশ্বিন, ১৩৫১)

(২)

'নবান্ন' বই আমি পড়িনি, কিন্তু অভিনয় দেখে যতদূর মনে হয় বহু উৎকর্ষ সত্ত্বেও নাটকীয় রচনা হিসাবে এর ত্রুটি এত গুরুতর যে 'নবান্ন' শেষ পর্যন্ত যথার্থ নাটকীয় সার্থকতা অর্জন করতে পারেনি।

অভিনয় দেখার এতদিন পরে এই নাটকটির সবগুলি ত্রুটির উল্লেখ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার সহজসাধ্য নয়। যে ত্রুটিগুলি বিশেষভাবে মনে পড়ে তারই উল্লেখ করছি। একেবারে প্রথম দৃশ্যে বিশেষ একটি গ্রামের ও সেই সঙ্গে সমগ্র দেশের যে অবস্থা উদঘাটিত হয় পরবর্তী দৃশ্যগুলির সঙ্গে তার সংযোগের সূত্র অতি ক্ষীণ। এ ক্ষেত্রে ত্রুটি শুধু নাট্যকারের নয়, পরিচালকেরও। আচমকা কতকগুলো লোমহর্ষক ব্যাপার ঘটন, পরের ঘটনাপ্রবাহে থাকল তার অস্পষ্ট রেশমাত্র। অর্থাৎ নাটকটির সূত্রপাতে এমন একটি রহস্য থেকে গেল যার সমাধান শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

কিন্তু তবু অভিনয় জমল, লেখকের মর্মস্পর্শী আলেখ্য অবলম্বন করে, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নৈপুণ্য ও পরিচালক-প্রযোজকের শক্তিশালী পরিকল্পনার ফলে। মাঝে মাঝে স্খলন হয়েছে, যদিও গুরুতর নয়, যথা :

ছোট বৌর গায়ে হাত তোলার অপবাদ দিয়ে বড় ভাই নিরপরাধ ছোট ভাই-এর ওপর যে-ভাবে গগনভেদী মারণ ও তাড়ন লীলা প্রকট করলেন তাতে বৌর মুখ বুঁজে থাকা ভাসুর-ভাদ্র বৌর সলজ্জ্ সম্পর্কের দোহাই দিয়েও অত্যন্ত অস্বাভাবিক, বিশেষত চাষীর ঘরে। 'তোরা যা, আমি যাবনা'। বেসুরো গলায় এই সুরোৎপাদন প্রচেষ্টা খুব শোভন হয়নি; ততোধিক অশোভন এই সঙ্গে নট ও নটীর তথা ভিক্ষুক ও ভিখারিণীর তালে তালে পা ফেলে নিষ্ক্রমণ। এই দৃশ্যে অশোভনতার চরম করুণ বংশী-বিলাপ। খেলো সিনেমা আঙ্গিকের এই অনুকরণ 'নবান্ন'র আসরে একেবারেই অপাংক্তেয়।

রিলিফ হাসপাতালের পরিবেশে ডাক্তারটির ছিমছাম পোশাক ও চাঁচাছোলা মুখস্থ-করা কেতাবী বয়েৎ সমান বেমানান। এক সত্যিকারের ডাক্তার নাকি এই ভূমিকায় নেমেছিলেন। একথা সত্য হলে তাঁর পোশাক ও বুলি দুই-ই কিঞ্চিৎ অভিনয়দুরস্ত করে নেওয়া উচিত ছিল।

এই জাতীয় ত্রুটি হয়তো আরো দু-একটি আছে। এখন তার সঠিক বর্ণনা আমার অসাধ্য। যাই হোক, এগুলি গৌণ ত্রুটি—অত্যন্ত গৌণ। 'নবান্নে'র নাটকীয় সম্পূর্ণতাকে এরা অতি সামান্যই ক্ষুন্ন

করেছে। 'নবান্নে'র দুর্বলতম অংশ শেষ দৃশ্য। এই দৃশ্যে গ্রন্থকার যেভাবে তাঁর উদ্ভাবিত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন তা শুধু রোমান্টিক ও অবাস্তব নয়, নাটকটির পূর্বাংশের সঙ্গে একেবারে সঙ্গতিহীন। মারী ও দুর্ভিক্ষে যে গ্রাম ছারখার হয়েছে ও এই প্রচণ্ড দ্বৈতবিভীষিকা যথেষ্ট নয় মনে করে গ্রন্থকার যে গ্রামকে বন্যা দিয়ে বিধ্বস্ত না করে খুশি হননি, ঠিক সেই গ্রামে সেই প্রধানের কুটির-প্রাঙ্গণে অক্ষত দেহে ফিরে এল একটির পর একটি গ্রামত্যাগী দুঃস্থ, যারা দু'দিন আগে শহরের পথের ডাস্টবিন হাতড়ে খুঁজেছে জীবনধারণের শেষ সম্বল। বৃদ্ধ প্রধান পর্যন্ত এই মিলনান্ত দৃশ্য থেকে বাদ পড়লেন না, তাঁর মাথা গেল বিগড়ে কিন্তু আশি বছরের প্রাচীন দেহ কায়কল্প চিকিৎসা না করেও শেষ পর্যন্ত রইল সক্ষম। মাঝখান থেকে মারা গেল একটি অসহায় শিশু, তাও গ্রাম ত্যাগের আগেই। লেখকের এই শিশুহত্যার প্রবৃত্তি—পূর্ব নাটক 'জবানবন্দী' স্মরণীয়—তাঁর কলমের পক্ষে মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। এর ফলে সাময়িকভাবে যে করুণ রসের সৃষ্টি হয় নাটকের ঘটনা বিরচনে তা প্রায় অবান্তর।

কিন্তু নাটক হিসাবে 'নবান্নে'র এই গুরুতর ত্রুটি সত্ত্বেও অভিনয় ও পরিচালনায় অসাধারণ উৎকর্ষের ফলে 'নবান্ন' দেখে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারিনি, যেমন আরো বহু দর্শক হয়েছেন। এর ফলেই কথা ওঠে—স্বর্ণকমলবাবু যার উল্লেখ করেছেন—একটি অক্ষম নাটককে অবলম্বন করে অভিনয় ও প্রযোজনার এতখানি কৃতিত্ব কি সম্ভব? এর উত্তরে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, তা যদি না সম্ভব হতো তাহলে বাংলাদেশের শিশির ভাদুড়ীর মতন অভিনেতার অভ্যুদয় হলো কি উপায়ে? 'সীতা' বা 'আলমগীর'কে যদি সক্ষম নাটক বলতে হয় তাহলে অক্ষম নাটক কাকে বলে জানিনা। আরো দৃষ্টান্ত দিতে পারি, কিন্তু দরকার বোধ করছি না।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, 'নবান্ন' নাটক হিসাবে—'নাটক' কথাটির ওপর বিশেষ জোর দিয়ে বলছি—অক্ষম হলেও 'সীতা' বা 'আলমগীর'-এর মতন নিম্নশ্রেণীর রচনা নিশ্চয়ই নয়। 'নবান্ন' অক্ষম শুধু এই কারণে যে এর শেষ অংশ পূর্ববর্তী অংশগুলি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, ঐ অংশগুলিতে ঘটনা-বিবর্তনের যে সূত্র পাওয়া যায় সে, দৃশ্যে এসে তা একেবারে তালগোল পাকিয়ে গেছে, ফলে নাটকটির স্বাভাবিক পরিণতি হয়েছে একেবারে পণ্ড। কিন্তু শেষ দৃশ্যটি বাদ দিলে যা বাকি থাকে তাকে যদিও সম্পূর্ণ নাটক বলা চলেনা তবু একাধিক কারণে তা নিঃসন্দেহে অসাধারণ রচনা। কেন অসাধারণ সে কথা স্বর্ণকমলবাবু ও কালিদাসবাবু দুজনেই বলেছেন ও এ বিষয়ে আমি তাঁদের সঙ্গে একমত; তাঁদের সঙ্গে বিরোধ এই যে আমি 'নবান্ন' দেখেছি শুধু সমঝদারের দৃষ্টিতে নয়, সমালোচকেরও, তাই শেষ দৃশ্যের অসংগতি আমার চোখ এড়ায়নি।

কিন্তু এই শেষ দৃশ্যই আবার অন্যান্য পাঁচজনের মতন আমারও চোখে বোধ হয় সব চাইতে ভালো লেগেছে। এই দৃশ্যে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে পুরো একটি জনতা। এতগুলি লোককে স্টেজে নামালে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক, বহুক্ষেত্রে হয়েও থাকে তাই। এক্ষেত্রে কিন্তু এতগুলি লোককে যেভাবে বাগ মানানো হয়েছে তাতে এই দৃশ্যটির পরিচালনায় ও পরিকল্পনায় অসাধারণ বাহাদুরির তারিফ না

করে পারা যায়না। এই বাহাদুরির ভাগীদার হিসাবে অন্যতম পরিচালক বিজনবাবুকে তাঁর প্রাপ্য দিতে আমি একটুমাত্র কুণ্ঠিত হবনা, যেমন হবনা অভিনেতা হিসাবে তাঁর প্রশংসা করতে। জায়গায় জায়গায় মনে হয়েছে যে বিজনবাবুর অভিনয়ে একটু যেন আতিশয্য এসেছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার মনে যথেষ্ট দ্বিধা আছে।

মোটকথা এই যে, যদিও বিজনবাবু একটি সক্ষম নাটক লিখে উঠতে পারলেন না, অর্থাৎ যে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল নাটকটির প্রথম দিকে শেষ পর্যন্ত তা গেল ভেস্তে, তবু এমন একটি নাটক রচনার চেষ্টা তিনি করেছেন যা শুধু চেষ্টার গুণেই স্মরণীয়। অবশ্য গুণ শুধু চেষ্টার নয়। সংলাপে, বিষয়বস্তুতে, ঘটনা-সমাবেশে, বিজনবাবুর কলম ও কল্পনা এতদুর এগিয়েছে যে বাংলা রঙ্গামঞ্চে ও বাংলা সাহিত্যে তিনি নতুন হাওয়া এনেছেন, এই কথা না বললে তাঁর প্রতি অবিচার হবে। কিন্তু এই নতুন আবহাওয়ার স্রষ্টা একা বিজনবাবু নন, তাঁর সঙ্গে ও তাঁর পেছনে রয়েছে গণনাট্য সংঘ। এই সংঘের প্রেরণা ও উদ্যম ছাড়া বাংলার রঙ্গমঞ্চে 'নবান্নে'র অভ্যুদয় ছিল অসম্ভব। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় কুশলতার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, কেন না তা অবিসংবাদিত।

(পরিচয় : কার্তিক, ১৩৫১)

(চ)

মন্বন্তর ও সাহিত্য/তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে নাটকের ক্ষেত্রে নূতন আবেগ এবং নূতন সুর যোজনা করেছেন বিজন ভট্টাচার্য। এই মন্বন্তরকে অবলম্বন করেই সে সুর, সে আবেগ পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে। বিজন ভট্টাচার্যের নাটক ব্যাকরণ অনুযায়ী হয়তো এখনও আদর্শ নাটক হয় নাই, কিন্তু তাঁর রচনার মধ্যে যে প্রচণ্ড অবরুদ্ধ আবেগ সে সত্যই অতুলনীয়। এই সঙ্গে তার অদ্ভুত অভিনয়-প্রতিভার কথাও প্রসঙ্গক্রমে আমি উল্লেখ করছি। নাটকের ক্ষেত্রে বিজন ভট্টাচার্যের আগমন বিপুল প্রত্যাশার সঞ্চার করেছে।

(ছ)

ভারতের মর্মবাণী/মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃতির কোনো বিশিষ্ট রূপ ও ধারাকে সংস্কারের মতো রূপান্তরহীন করে রাখলে তার কোনো ভবিষ্যৎ থাকে না, তার মৃত্যু অনিবার্য। লোক-কলাকে বাঁচাবার ও লোকশিক্ষার বাহন হিসাবে তাকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্য তখনই সফল হতে পারে, যদি জনগণের জীবনের বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করা যায়, তাদেরই জীবন্ত আনন্দ-বেদনা আশা-নিরাশা সঙ্কট ও সমস্যা রূপায়িত হয়। গণনাট্য সংঘ এটা উপলব্ধি করেছেন। তাঁরা তাই শুধু দেশের সামনে লোক-কলার কতগুলি নমুনা ধরে দেশবাসীর কাছে আবেদন জানাননি—জাতির এই সম্পদকে রক্ষা করা চাই। জানালে সেটা

অরণ্যরোদন হতো মাত্র। নিজেরাই তাঁরা কাজটা আরম্ভ করেছেন—দেশের সামনে শুধু আদর্শটা নয়, উপায়টাও ধরে দিয়েছেন। সকলের মন তাই নাড়া খেয়েছে, সাড়া মিলেছে।

এই কার্যে ব্রতী তরুণ ও অ্যামেচার অভিনেতা ও অভিনেত্রী নিয়ে গড়া এই বাহিনীটির বয়স এক বছরও পূর্ণ হয়নি। এদের এই অপূর্ব অভিনয়নৈপুণ্য কোথা থেকে এল? কি এঁদের অভিনয় সাফল্যের মর্মকথা? এর একটি মাত্র জবাব জানি—এঁরা শুধু শিল্প-প্রাণ নন, দেশপ্রাণও বটে। আর্টের জন্য আর্টের ধোঁয়ায় ওঁদের চোখ কটকট করে না, শিল্পীর কর্তব্য সম্বন্ধে এঁদের দ্বিধাও নেই, দুর্বলতাও নেই। এই প্রসঙ্গে গণনাট্য সংঘের বাংলা শাখার এমনি অল্পবয়সী এ্যামেচার অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রদর্শিত 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন'র কথা স্মরণীয়। এ দুটি নাটক নাট্যজগতে কি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে কারো তা অজানা নয়। 'নবান্ন' অভিনয়ের জন্য আজ চেষ্টা করেও স্টেজ ভাড়া পাওয়া যায়না। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের কর্তারা ভয় পেয়ে গেছেন। অথচ এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার কোন ইচ্ছাই গণনাট্যের নেই—এঁরা ব্যবসায়ী নন, লাভের টাকা শিল্পী বা পরিচালক কারো পকেটে যায়না। বাংলার দুর্ভিক্ষের জন্য বাংলা শাখা বোম্বাই ও পাঞ্জাবে সফর দিয়ে লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করেছিল, 'নবান্ন' অভিনয়ের কয়েক হাজার টাকা বাংলার মহামারীর চিকিৎসায় লেগেছে।

কথাশিল্পী হিসাবে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কাছে একটি ব্যক্তিগত ঋণের কথা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে। নতুন প্রেরণা ও উদ্দীপনা ঋণ নয়, ওটা শুধু আমাকে নয় সকলকেই ওঁরা পরিবেশন করেছেন, সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবার প্রয়োজন ছিল। সাহিত্যিক হিসাবে আমার একটি ভীরুতা সম্বন্ধে এঁরা আমাকে সচেতন করেছেন। পাঠক-সাধারণকে একটু বেশিরকম ভোঁতা ও একগুঁয়ে মনে করার প্রতিক্রিয়া অনেক লেখকের রচনাতেই কতগুলি অনাবশ্যক সতর্কতা হয়ে দেখা দেয় নানা ভাবে, সমস্ত রচনাটিকে প্রভাবান্বিত করে। লেখকের ভীরুতাই এজন্য দায়ী। সংঘের অভিনব প্রচেষ্টাকে সাধারণ দর্শক যেরকম উদারতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন তাতে আমি উপলব্ধি করেছি যে আমরাই, লেখক ও শিল্পীরাই, পাঠক ও দর্শক-সাধারণের ঘাড়ে অযথা দোষ চাপাই, তাঁদের কতগুলি সঙ্কীর্ণতা ও বিরোধিতা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিই। আসলে তাঁরা আমাদের সব রকম সুযোগ ও স্বাধীনতা দিতে সর্বদাই প্রস্তুত, আমরাই তাঁদের এই উদারতা স্বীকার করতে ভয় পাই। আমি বিশ্বাস করি নিজের এই দুর্বলতা চেনার ফলে আমার লেখার উন্নতি হবে।

(উদ্ধৃতিসূত্র : ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক (৩য় খণ্ড)

একক ৮৮ ❑ নাট্যমঞ্চ ঃ দেশী ও বিদেশী

গঠন

৮৮.১ উদ্দেশ্য

৮৮.২ প্রস্তাবনা

৮৮.৩ মূলপাঠ (প্রথম অংশ) দেশী নাট্যমঞ্চ পরিকল্পনা ঃ সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের গঠন ও তাৎপর্য আলোচনা

৮৮.৪ সারাংশ

৮৮.৫ অনুশীলনী ১

৮৮.৬ মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) লোকায়ত যাত্রাভিনয়ের মঞ্চ পরিকল্পনা, গঠন ও তাৎপর্য আলোচনা

৮৮.৭ সারাংশ

৮৮.৮ অনুশীলনী ২

৮৮.৯ মূলপাঠ (তৃতীয় অংশ) বিদেশী মঞ্চ পরিকল্পনা ঃ মিশর, চীন, গ্রীস

৮৮.১০ সারাংশ

৮৮.১১ অনুশীলনী ৩

৮৮.১২ মূলপাঠ (চতুর্থ অংশ) বিদেশী মঞ্চ ঃ ইংরেজি মঞ্চ ও অন্যান্য

৮৮.১৩ সারাংশ

৮৮.১৪ অনুশীলনী ৪

৮৮.১৫ উত্তর-সংকেত

৮৮.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

৮৮.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে আপনি—

- প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত পৃথিবীর নানা দেশের নাটক, নাট্যাভিনয় এবং রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- নাট্যাভিনয় দেখতে আসা দর্শক কিভাবে অভিনেতাদের ভাবভঙ্গি দেখতে পাবে, তাদর কথা শুনতে পাবে তা জানতে পারবেন।

- মঞ্চ কিভাবে দর্শককে নাটকের প্রতি আকৃষ্ট করে তা জানতে পারবেন।
- দর্শকের আসন থেকে নাটককে বিচার করতে শিখবেন।
- সামগ্রিকভাবে নাট্যসাহিত্য ও নাট্যধারা সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে তুলতে পারবেন।

৮৮.২ প্রস্তাবনা

বিশ্বের সর্বত্র আদিম নৃত্যানুষ্ঠান থেকে নাটকের উদ্ভব। বেদের যুগ থেকে সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের সূচনা। ভারতবর্ষে ধর্মকেন্দ্রিক নৃত্যগীতানুষ্ঠান থেকেই উদ্ভব হয়েছে নাটকের। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত লোকধর্মী অভিনয় পদ্ধতির কথা বলেছেন। নন্দিকেশ্বর সরাসরি নাটকের উল্লেখ না করলেও ভাবপ্রকাশে নানারকম মুদ্রা উল্লেখ করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার বছর ধরে সভ্যতার অন্যতম নিদর্শন নাটক নানাকালে নানারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। জন্মলগ্ন থেকেই নাটক সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার। নাটকের সঙ্গে সমাজজীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এর মধ্য দিয়ে সামাজিক বিভিন্ন কুপ্রথা, অর্থনৈতিক শোষণ, বলবানের অত্যাচার প্রকাশ পায়। রঙ্গামঞ্চে নাটক দেখে জনগণ এসব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। ফলে সমাজজীবনের ওপর নাটকের প্রভাব অপরিসীম। সমকালীন জীবন, তাদের বিশ্বাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জনরুচি, জীবন ভাবনা ও লক্ষ্য—এসবই রূপায়িত হয় নাটকে।

নাটক রঙ্গামঞ্চ ও অভিনয় কৌশলের একটি সম্মিলিত রূপ হল থিয়েটার। নাটক অভিনয়ের প্রথম অবস্থায় অভিনেতারা মঞ্চের পরিবর্তে মাটিতে দাঁড়িয়ে অভিনয় করত, সেটাই ছিল তাদের কাছে মঞ্চ। নাটকের প্রয়োজনেই মঞ্চ গড়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে অবশ্য মঞ্চ নাটককে প্রভাবিত করেছে। নাটককে দৃশ্যরূপ দেওয়ার জন্য রঙ্গালয়ের উৎপত্তি। নাটকের নানা ধরনের ক্রমবিকাশ রঙ্গামঞ্চকে জটিল করে তুলেছে। অভিনীত নাটকের ওপর রঙ্গামঞ্চের একটা বিশেষ প্রভাব থাকে। প্রত্যেক দেশে নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে রঙ্গামঞ্চ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। নাটক অভিনয়ের জন্য মঞ্চের উপযোগিতা অপরিসীম। দর্শক ও শ্রোতা অভিনেতার অভিনয় ভালোভাবে দেখবে ও শুনবে—এই আন্তরিক আগ্রহ ও তাগিদ থেকেই মূলত মঞ্চের সৃষ্টি।

৮৮.৩ মুলপাঠ (প্রথম অংশ) দেশী নাট্যমঞ্চ পরিকল্পনা ঃ সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের গঠন ও তাৎপর্য আলোচনা

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে নাট্যচর্চা প্রচলিত ছিল। আর্য সভ্যতার প্রথম পর্বে আর্যদের মধ্যে যে নাট্যচর্চার ধারা ছিল তা ঋক্‌বেদ থেকে জানা যায়। আর্যদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ উপলক্ষে আহুতি দেওয়া, সোমরস পান, বেদমন্ত্র গান, দেবদেবীর স্তব এসবই এমনভাবে ঘটত যাতে নাটকীয় উপাদান পাওয়া

যায়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব। ভারতীয় নাট্যারম্ভের কাল নির্ণয় করা দুষ্কর। তবে বেদের যুগে সঙ্গীত, নৃত্য ও কথোপকথনের উপাদান পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে পাণিনির রচনায় শিলালিন এবং কৃশাশ্ব এই দুই নাট্যকারের সন্ধান পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব ১৪০ অব্দ পাতঞ্জলির মহাভাষ্যে নাট্যানুষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ভরতমুনি, কোহল, নন্দিকেশ্বর, মাতঙ্গ প্রমুখ আচার্যগণ নাট্যশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই সমস্ত নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে 'ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র' সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। ভরতের আলোচিত অভিনয় পদ্ধতি বাস্তবানুগ। ভিন্ন অভিনয় পদ্ধতির প্রবর্তক হিসেবে নন্দিকেশ্বরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ। তাঁর "অভিনয় দর্পণ" যথেষ্ট প্রামাণ্য গ্রন্থ। কোহল ও মাতঙ্গকে ভরতের শিষ্য বলা হয়। তবে নাট্যসম্পর্কিত যে সমস্ত বিষয় ভরত আলোচনা করেন নি কোহল তা নির্ধারণ করেছেন। মহাভারতে নট-নটীদের উল্লেখ আছে। সেখানে দেখা যায় রাজপ্রাসাদে আলাদা নাট্যশালা থাকত। রামায়ণ ও মহাভারতের আবির্ভাবের পর নাটকে রাজচরিত্রই প্রধান হয়ে ওঠে।

নাট্যকাহিনী বা নাট্যাভিনয়ের উদ্ভব সম্পর্কে বলা হয় ব্রহ্মা নৃত্য, গীত, বাদ্য, বাক্য সমন্বিত পঞ্চমবেদ অর্থাৎ নাট্যবেদ রচনা করেন এবং ভরতমুনিকে তা প্রয়োগ করতে আদেশ করেন। অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তাঁর "বাংলা নাট্য বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র" গ্রন্থেও এমন ধারণা পোষণ করেছেন। এই সময় থেকেই জানা যায় নাটক সর্বসাধারণের আচার-আচরণের এবং ভাল-মন্দের অনুকৃতি। শিল্পের নানান রকম কৌশল নাটকের মধ্যে পাওয়া যায়। ভরতমুনি নাট্যারম্ভে 'নান্দীপাঠ' প্রয়োগ করেন। তাঁর নাট্যশাস্ত্রে নাটক সম্পর্কিত সবরকম রীতি এবং নাট্যমঞ্চের ধারণাও পাওয়া যায়। তবে সংস্কৃত ভাষা যেহেতু সর্বসাধারণের ভাষা ছিল না, তাই সংস্কৃত নাটক সকলের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়নি। বৌদ্ধ যুগে পালি ভাষায়ও কিছু নাটক লেখা হয়েছিল, তবে সেগুলোও প্রচারধর্মী। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে নাটকের বিভিন্ন দিক, কলাকৌশল, তার প্রয়োগ ইত্যাদির উল্লেখ করতে গিয়ে রঙ্গালয়ের উল্লেখ করেছেন।

ভারতীয় ধ্রুপদী রঙ্গালয় সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা ধারণার অভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে জানা যায় ভারতবর্ষের প্রাচীন হিন্দুস্থাপত্য শিল্পের রীতি অনুসারে রঙ্গালয় গড়ে ওঠে এবং কাঠ ও মাটির সাহায্যে তা তৈরি হয়। ভরতমুনির বর্ণনাতেও এমন কথার উল্লেখ আছে। নাট্যশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রঙ্গালয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে তার বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগও দেখানো হয়েছে। ভরত বলেছেন রঙ্গালয় তিন প্রকার —বিকৃষ্ট, চতুরস্র এবং ত্র্যস্র। এর মধ্যে চতুরস্র-মধ্যই হল আদর্শ রঙ্গালয়। আবার এই মধ্যম রঙ্গালয়কে তিনি রঙ্গশীর্ষ, রঙ্গপীঠ, নেপথ্য, মত্তবারণী প্রভৃতি ভাগে ভাগ করে তার অবস্থান সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। এই শ্রেণীবিভাগের পর শাস্ত্র অনুযায়ী ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রঙ্গালয়ের দেওয়াল, দরজা, জানালা, মঞ্চ ইত্যাদি তৈরি করা হত। মঞ্চের ভিত্তি হত মাটি দিয়ে তৈরি। মেঝে হত মসৃণ ও সমতল। রঙ্গমঞ্চের বিভিন্ন জায়গায় মণিমুক্তা পুঁতে রাখার ব্যবস্থা থাকত। দর্শকদের

যাতায়াতের সুবিধার জন্য দরজাগুলি মুখোমুখি বসানো হত। দর্শকদের বসার জন্য কাঠের বা পাথরের বেঞ্চের ব্যবস্থা ছিল। নানারকম শিল্পসম্ভার, হাতের কাজ ইত্যাদির মাধ্যমে মঞ্চকে সুসজ্জিত করে রাখা হত। যা হোক মঞ্চের রঙ্গাশীর্ষ, রঙ্গাপীঠ, নেপথ্য ও মত্তবারণীর নানা বিভাগ, পরিমাপ ইত্যাদি যেমন সুচারুরূপে দেখানো আছে, তেমনি তা নিয়ে সংশয় দেখা দিলে ভরত, অভিনব গুপ্ত প্রমুখ নাট্যশাস্ত্রকারদের সুচিন্তিত পন্থায় তার বাস্তবসম্মত সমাধানের কথাও বলা আছে। সংশয়, মতবিরোধ থাকলেও এগুলোর অস্তিত্ব নিয়ে কোনো সংশয় নেই।

প্রাচীন ভারতে নাট্যমঞ্চে বস্তুলোক প্রাণীলোকের ব্যবহার দেখা যেত। মঞ্চে শৈল, যান, বিমান, চর্মবর্ম, ধ্বজ প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। বিভিন্ন অলংকারের উপাদান; কেশচর্চা, চন্দন ইত্যাদি জাতীয় রূপসজ্জা; মৃগ, হস্তী জাতীয় সজীব প্রাণীর ব্যবহার ছিল। শকুন্তলা নাটকে হরিণের উপস্থিতি, মৃচ্ছকটিক নাটকে মাটির 'খেলনা গাড়ির' ব্যবহার দেখা যায়। হিন্দু রঙ্গামঞ্চে মঞ্চোপকরণ ছিল অল্প, দৃশ্যসজ্জার বিশেষ বাহুল্য ছিল না, দর্শক-শ্রোতাদের কল্পনা শক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হত। রঙ্গামঞ্চে নাটকের গতির সঙ্গে স্থান ও দৃশ্য পরিবর্তনের নাট্যপ্রথা প্রচলিত ছিল। সমপর্যায়ের চরিত্র হলে পাশাপাশি এবং নিম্নস্তরের চরিত্রের সঙ্গে হলে পারিষদ পরিবৃত হওয়ার প্রথা ছিল। 'যবনিকা' অর্থাৎ পর্দা তখনকার দিনে মঞ্চে ব্যবহৃত হত। নাট্যাভিনয় আরম্ভ হওয়ার আগে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকত। যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী আসবেন, স্তোত্র পাঠ হবে, গলা ঠিক করা হবে, 'নান্দী' পাঠ হবে, মঞ্চের বিঘ্ননাশের জন্য দুজন পারিপার্শ্বিক সহ-সূত্রধার পুষ্প নিয়ে মঞ্চের দশদিক পরিক্রমা করবেন। এরপর প্রস্তাবনা বা মুখবন্ধ অর্থাৎ নাটকের বিষয়বস্তু উপস্থিত সকলকে জানিয়ে দেওয়ার রীতি ছিল। প্রথমদিকে নাট্যানুষ্ঠান হত বাগানের মধ্যে গৃহ নির্মাণ করে অথবা রাজপ্রাসাদ ও মন্দির সংলগ্ন কোনো ঘরে। এই সময় রঙ্গালয় ছিল ত্রিভুজ-আকৃতির, তারপরে হয়েছে চতুর্ভুজ এবং সবশেষে আয়তাকার। দ্বাদশ শতকের প্রারম্ভে সারদাতনয় তাঁর "ভাব প্রকাশনম্" নামক অলঙ্কার গ্রন্থে তিনপ্রকার নাটমণ্ডপের মধ্যে বৃত্তাকার নাটমণ্ডপের উল্লেখ করেছেন। উদাহরণ হিসেবে খাজুরাহোর 'লক্ষ্মণ-মন্দির', পৌণ্ড্রবর্ধনে কার্তিকেয়র মন্দিরের উল্লেখ করা যায়। দক্ষিণ ভারতে ভগ্নদশাগ্রস্ত কয়েকটি মন্দির-নাট্যশালার সন্ধান পাওয়া যায়। এখানকার রঙ্গালয়ে প্রবেশ-প্রস্থান, বেদি, নেপথ্য, যবনিকা সবকিছুর সন্ধান মেলে।

ভাস, কালিদাস, ভবভূতি প্রমুখ নাট্যকারদের সময়ে সংস্কৃত ভাষায় নাটক প্রচলিত ছিল। ভরত থেকে শুরু করে বিশ্বনাথ পর্যন্ত নাট্যশাস্ত্রকারদের রচনা থেকে জানা যায় এই সময়ের রচিত নাটকগুলি রঙ্গামঞ্চে অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল। জনগণের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে জনরুচিকর নাট্যরীতির উদ্ভব হয়েছিল। তবে মুসলমান আক্রমণের পর থেকে নাটক, নাট্যাভিনয় ও নাট্যমঞ্চে পালাবদল শুরু হয়।

৮৮.৪ সারাংশ

প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে নাট্যচর্চা প্রচলিত ছিল। আর্যদের যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ঘটনায় নাটকীয়তা থাকত। ভারতীয় নাট্যারম্ভের কাল নির্ণয় দুস্কর হলেও পাণিনির রচনায় নাট্যকারদের নাম পাওয়া যায়। ভরতমুনি, কোহল এ জাতীয় অনেকে নাট্যশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভরতের আলোচনায় বাস্তবতা, নন্দিকেশ্বরে ভিন্ন অভিনয় পদ্ধতি আলোচিত। রামায়ণ মহাভারতের সময় থেকে রাজচরিত্র প্রধান হয়ে উঠেছে। ব্রহ্মা নাট্যবেদ রচনা করেন। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে নাটকের রীতি ও নাট্যমঞ্চের ধারণা পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগেও প্রচারধর্মী কিছু নাটক লেখা হয়েছিল।

প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যশিল্পের রীতি অনুসারে ভারতবর্ষে রঙ্গালয় গড়ে ওঠে। রঙ্গালয়কে বিকৃষ্ট, চতুরস্র এবং ত্র্যস্র এই তিনভাগে ভাগ করে চতুরস্র-র অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রঙ্গালয়ের ভিত্তি, সংস্কার, দর্শকদের যাতায়াত ও বসার ব্যবস্থা, মঞ্চকে সুসজ্জিত করার নানা পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে ভরত, অভিনব গুপ্তদের মত অনুসারে। প্রাচীন ভারতে রঙ্গামঞ্চে বস্তুলোক ও প্রাণীলোকের ব্যবহার ছিল। মঞ্চোপকরণ কম থাকলেও দর্শকদের কল্পনা শক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হত। নাটকে স্থান ও দৃশ্যের পরিবর্তন, যবনিকার ব্যবহার, নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিষয় জানিয়ে দেওয়ার পদ্ধতির প্রচলন ছিল। প্রথমদিকে নাট্যানুষ্ঠান হত বাগানের মধ্যে, রাজপ্রাসাদে বা কোনো মন্দিরে। পরে অভিনয়ের জন্য নাট্যমন্দির তৈরি হয়। এই সমস্ত নাটমন্দিরে প্রবেশ-প্রস্থান বেদি, নেপথ্য, যবনিকা সবই ছিল। মূলত জনগণের চাহিদা অনুযায়ী জনরুচিকর নাটক রঙ্গামঞ্চে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হত।

৮৮.৫ অনুশীলনী ১

১। **নিচের দেওয়া বিবৃতিগুলি ঠিক কিম্বা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘরগুলিতে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন ঃ**

	ঠিক	ভুল
(ক) ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব।	☐	☐
(খ) কোহলের নাট্যশাস্ত্র সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।	☐	☐
(গ) চতুরস্র-মধ্যই হল আদর্শ রঙ্গালয়।	☐	☐
(ঘ) শকুন্তলা নাটকে হরিণের উপস্থিতি দেখা যায়।	☐	☐
(ঙ) 'ভাব প্রকাশনম্' একটি ছন্দের গ্রন্থ।	☐	☐

২। নিচের বিবৃতিগুলির নিচে দেওয়া উত্তরগুলির মধ্যে যেটি সঠির তার ডানপাশের ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন ঃ

(ক) পাণিনি কত খ্রিস্টাব্দের লোক?

(১) খ্রিস্টপূর্ব ১৪০ ☐

(২) খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ ☐

(৩) খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ ☐

(খ) অভিনয় দর্পণ-এর লেখক—

(১) কোহল ☐

(২) মাতঙ্গ ☐

(৩) নন্দিকেশ্বর ☐

(গ) পঞ্চমবেদ রচনা করেন —

(১) ব্রহ্মা ☐

(২) ভরত ☐

(৩) অহীন্দ্র চৌধুরী ☐

৮৮.৬ মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) লোকায়ত যাত্রাভিনয়ের মঞ্চ পরিকল্পনা, গঠন ও তাৎপর্য আলোচনা

যাত্রা এই শব্দটা বাংলা ও বাঙালিত্বের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও গোটা বিশ্বের লোকাভিনয়ের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগ। সর্বসাধারণের মধ্যে খোলা আসরে গ্রামের মাটিতে বহুলোকের মাঝখানে যাত্রা অভিনীত হত। যাত্রা শোনার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হত বেশি। আমাদের দেশে যাত্রার উদ্ভব হয়েছে দেবতার পূজা উপলক্ষ্যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গমন বা যাত্রা থেকে। যাত্রা অর্থাৎ গমন। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে যাত্রা বলতে দেবোৎসব বোঝাত। যেমন স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, দোলযাত্রা, রাসযাত্রা, গোষ্ঠযাত্রা, শিবযাত্রা ইত্যাদি। দেববিগ্রহ নিয়ে পূজারী এবং ভক্তগণ শোভাযাত্রা করে ভক্তিরসের সঙ্গে মানবপ্রসঙ্গের সংযোগ স্থাপন করেছিল। বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে নৃত্য এবং গীত অনুষ্ঠিত হত। এই নৃত্য-গীত অর্থাৎ নাটগীতকেই যাত্রা বলে। ধর্মীয় শোভাযাত্রা, নৃত্যগীত, ভাবপ্রকাশক অঙ্গভঙ্গি, হাস্যরসাত্মক সংলাপ দেবমহিমার প্রকাশ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যাত্রার উদ্ভব।

প্রাচীনকালে মিশরে Passion Play উপলক্ষ্যে নৌযাত্রা গ্রীসে 'কমাস' উৎসব উপলক্ষ্যে লিঙ্গামূর্তি

যাত্রা, চীন ও জাপানেও ধর্মীয় লোক-উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন শোভাযাত্রা থেকে নাটকের জন্ম। ভারতবর্ষেও প্রাচীনকালে যাত্রা কথাটি পাওয়া যায়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে, ভবভূতির মালতী মাধবে যাত্রার উল্লেখ আছে। দর্শকেরা মুক্ত অঙ্গনে বহুলোকের নাট্যক্রিয়া একসঙ্গে দেখতে চাওয়ার কারণে বর্তমানে যাত্রার এত জনপ্রিয়তা। চারদিক খোলা অভিনয়ের আসরে অভিনেতারা মুখোশ ব্যবহার করত। এটা শুধু আদিম মানুষেরা নয়, প্রাচীন গ্রীস, রোম, যবদ্বীপ, বালি প্রভৃতি দেশের অভিনেতারা মুখোশ ব্যবহার করে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করতে পারত। বর্তমানে ছৌ নৃত্যে মুখোশের ব্যবহার লক্ষণীয়। তবে বাংলা যাত্রাভিনয়ে মুখোশের ব্যবহার খুব একটা নেই। বরং রঙে, রেখায়, পোশাকে, প্রসাধনে চরিত্রকে বর্ণময় ও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। যাত্রার দর্শকরা প্রথমদিকে মূলত শ্রোতা ছিল। তারা যাত্রাগানের কথা ও সুরের মাধুর্যেই নিজেদের আবিষ্ট করে রাখত। শ্রোতারা ভক্তিরস আস্বাদন করে চরিতার্থ হত। লক্ষ করলে দেখা যাবে তখনকার দিনে রামায়ণ মহাভারতের বহু কাহিনী নিয়ে যাত্রা পালা রচিত হয়েছে।

যাত্রাভিনয়ের অভিনেতাকে দর্শকেরা মঞ্চের চারপাশ থেকে দেখে। তাকে অনেক দূর থেকেও দেখতে হয়। ফলে অভিনেতাকে বলিষ্ঠ, দীর্ঘদেহী, ব্যক্তিত্ববান হতে হয়। বহু দূরবর্তী শ্রোতাকে শোনানোর জন্য তাকে গম্ভীর কণ্ঠের হতে হয়। যাত্রার অভিনেতা সাজঘর থেকে বেরিয়ে দর্শকের মাঝখানের একটি সরু পথ দিয়ে মঞ্চে বা আসরে আসেন। হেঁটে আসার পথে অভিনেতার উক্তি দর্শকদের মুগ্ধ করে। যাত্রার বিবেকজাতীয় গানও অনেক সময় এই হেঁটে আসার পথেই গীত হয়। যাত্রাভিনয়ে অভিনেতাদের অনবরত ঘুরে ফিরে চারিদিকের দর্শকদের দিকে তাকিয়ে অভিনয় করতে হয়। অভিনেতা মঞ্চের অপর অভিনেতা ছাড়াও অধিকারী, বাদ্যযন্ত্রী, দর্শক-শ্রোতা সকলের সঙ্গে কথা বলেন। অভিনেতারা শারীরিক কসরত, রণচাতুর্য ও ক্রীড়াকৌশল দেখিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে। চমকপ্রদ ভঙ্গি ও কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্যের দ্বারাও তারা দর্শক-শ্রোতাদের আনন্দদান করে।

তবে যাত্রা এখন থিয়েটারী মঞ্চে প্রবেশ করেছে। ফলে যাত্রার অভিনয় থিয়েটারী অভিনয়ের মত নকলপনায় ভরপুর। যাত্রা এখন আর সেই গ্রাম্য ধূলিমলিন অবজ্ঞার বিষয়রূপে গণ্য হয় না। থিয়েটারের মত মঞ্চমায়ার সুযোগ নিয়েছে যাত্রা। ব্যয়বহুল নাগরিক মঞ্চ, আলোকসম্পাত, কণ্ঠস্বরের সংযত ভাব, ঘটনার প্রকৃত রূপ মঞ্চে দেখিয়ে যাত্রাভিনয়ে কৌলিন্য এসেছে। দেশকালের পটভূমি অনুযায়ী যাত্রার চরিত্রের পোশাক, রূপসজ্জার দিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া হচ্ছে। একক অভিনয়ের পরিবর্তে দলগত অভিনয়ের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন পরিচালক। আধুনিক যাত্রার উদ্দেশ্যই হল দর্শক-শ্রোতাদের পরিতৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করা।

৮৮.৭ সারাংশ

যাত্রা গোটা বিশ্বের লোকাভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু যাত্রা শব্দটাতে একটা বাঙালিয়ানা আছে। দেবতার পূজা উপলক্ষ্যে যাত্রার উদ্ভব। গ্রামের মাটিতে খোলা আসরে বহুলোকের মাঝখানে যাত্রা অভিনীত হত। উৎসব নৃত্য-গীত এর অঙ্গ। ভারতবর্ষের মত মিশর, গ্রীস প্রভৃতি দেশে 'যাত্রা' গমন, শোভাযাত্রা ইত্যাদি শব্দও ঘটনা কেন্দ্রিক। প্রাচীনকালে যাত্রায় মুখোশের ব্যবহার ছিল। বাংলা যাত্রাভিনয়ে মুখোশের ব্যবহার খুব একটা চোখে পড়ে না। তবে রঙে, রেখায়, পোশাকে, প্রসাধনে যাত্রাকে বর্ণময় করে তোলা হয়। যাত্রার অভিনেতাকে দীর্ঘদেহী, গম্ভীর কণ্ঠের এবং ব্যক্তিত্ববান হতে হয়। তার উক্তি দর্শকদের মুগ্ধ করে। যাত্রার বিবেক জাতীয় গান থাকে। মঞ্চে অভিনেতা, বাদ্যযন্ত্রী থাকে। অভিনেতারা শারীরিক কসরত দেখিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। তবে যাত্রা এখন আর গ্রাম্য পরিবেশে অনুষ্ঠিত বিষয়রূপে গণ্য হয় না। থিয়েটারী মঞ্চে প্রবেশ করে যাত্রায় এখন কৌলিন্য এসেছে।

৮৮.৮ অনুশীলনী ২

১। নিচের প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তরে টিক (✓) দিন ঃ

(ক) নৌযাত্রা প্রচলিত ছিল—
১। মিশর
২। চীন
৩। জাপান

(খ) যাত্রার দর্শকরা প্রথমদিকে ছিল—
১। শ্রোতা
২। দর্শক
৩। পূজারী

(গ) যাত্রায় থাকে—
১। বিবেক জাতীয় গান
২। আধুনিক গান
৩। রাগপ্রধান গান।

২। নিচের বক্তব্যগুলি ঠিক বা ভুল তা নির্দিষ্ট করে টিক (✓) দিন।

	ঠিক	ভুল
(ক) আমাদের দেশে যাত্রার উদ্ভব হয়েছে দেবতার পূজা উপলক্ষ্যে।	☐	☐

(খ) ছৌ নৃত্যে মুখোশ আছে। ☐ ☐
(গ) যাত্রায় অভিনেতারা শারীরিক কসরত করেন না। ☐ ☐
(ঘ) তখনকার দিনে যাত্রায় রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী ছিল। ☐ ☐

৮৮.৯ মূলপাঠ (তৃতীয় অংশ) বিদেশী মঞ্চ পরিকল্পনা ঃ মিশর, চীন, গ্রীস

মিশর ঃ মিশরের অতীত কাহিনীর লিপিবদ্ধ রূপ 'পিরামিড টেক্সট্‌স' থেকে সেদেশের নাট্য প্রচেষ্টা সম্বন্ধে জানা যায়। প্রাচীন মিশরে চার পাঁচ শ্রেণীর নাটক ছিল। সেখানকার অভিজাতদের কবরভূমিতে পাওয়া বেশ কিছু নাটকের নাট্যকাহিনীর সঙ্গে মঞ্চ নির্দেশের কথা উল্লেখ করা আছে। কখনও অভিজাত ব্যক্তির স্বর্গারোহণ ও পুনর্জীবন লাভের কাহিনী, কখনও রাজ্যাভিষেক উৎসব, কখনও রোগ সারানো ও ভূত তাড়ানো, আবার কখনও বা প্যাশান প্লে—এই জাতীয় নাট্যকাহিনী মিশরীয় নাটকের ক্রমবিবর্তনে লক্ষ্য করা যায়। পিরামিড টেক্সটের গায়ে লিপিকৃত হয়ে আছে প্যাশান প্লের মঞ্চ নির্দেশকদের নাম। আই-খার্-নেফার্ট প্যাশান প্লের প্রথম নাট্য পরিচালক। তিনি নাটকে নৌকার ব্যবহার, জমকালো সুদৃশ্য পোশাক ও অলংকারের ব্যবহার দক্ষতার সঙ্গে করেছিলেন। এই সময়ে অনুষ্ঠিত নাটকগুলো বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ঘুরে হত এবং কিংবদন্তী স্থানগুলো মঞ্চের নাম পেত।[১] প্রকৃত রাজপ্রাসাদ, রাজপথ, মন্দির, গ্রাম ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এ সবই অকৃত্রিমভাবে রঙ্গামঞ্চরূপে ব্যবহার হতে থাকে। মূলত ধর্মীয় অনুষ্ঠান, শোভাযাত্রা, মৃত্যুযাত্রা এ জাতীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে নাটক এগিয়ে চলতে থাকে। সে সময় অভিনয় করার জন্য স্থায়ী কোনো রঙ্গামঞ্চ ছিল না।

চীন ঃ পৃথিবীর অনেক দেশে নৃত্য, গীত ও পূজানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নাটকের উৎপত্তি। চীনদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। চীনদেশীয় নাটকের প্রধানতম উৎস হল নৃত্য। নৃত্যের মধ্যে জটিলতা দেখা দিলে অভিনেতার সৃষ্টি হয়। 'চাও' রাজত্ব থেকে শুরু করে নানান সময়ে নৃত্য-নাট্যের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। কৌতুক শিল্পী, ক্লাউন, পাখা নিয়ে নৃত্য, দেবতা বা পশুর পোশাক ও মুখোশ পরে নৃত্য—এ সবের পরিচয় বিভিন্ন নাট্যানুষ্ঠানে থেকে জানা যায়। 'থং' রাজত্বে নাট্যশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল। জানা যায় থং সম্রাট 'মিং হুয়াং' এক কল্পকাহিনীর দ্বারা আবেগতাড়িত হয়ে একটি নাটকের দল সৃষ্টি করেন এবং অভিনয়ের জন্য ন্যাসপাতি কুঞ্জে একটি রঙ্গামঞ্চও তৈরি করেন। মধ্যযুগের শেষ ভাগে 'ইয়াং' রাজত্বে ক্লাসিকাল ধারার নাটক চীনা রঙ্গামঞ্চে আধিপত্য বিস্তার করে। দেবতার পাশাপাশি বীরগাথা, পুরাণকাহিনী, কমেডি এসবও নাটকের বিষয় হয়ে উঠতে শুরু করে। এই সময় থেকে নাটকে

১. এর ফলে বেশিরভাগ জায়গায় স্থান অনুসঙ্গে প্রকৃতিক দৃশ্যাবলীও নাটকে এসে গেছে।

প্রচুর চরিত্রের আগমন ঘটে এবং জনপ্রিয়তা বাড়ে। 'মাঞ্চু' রাজত্বে রঙ্গামঞ্চে অভিনেত্রীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। চীনদেশের নাটকের গঠন অনেকক্ষেত্রে চরিত্রনির্ভর ছিল। সাজ-সজ্জা, রূপ-সজ্জা, বিভিন্ন ধরনের চরিত্রের অভিনয় চীনা রঙ্গামঞ্চে জনপ্রিয়তা পায়। বিশেষ করে ক্লাউন চরিত্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করত। চীনা নাটকে টাইপ চরিত্রের প্রাধান্য ছিল।

চীনদেশীয় মঞ্চ ও মঞ্চোপকরণ অনেকের কাছে কৌতুহলের। এখানকার নাট্যশিল্প ছিল ক্লাসিক, তা রূপকথার রাজ্যের মত এবং প্রথানির্ভর। চীনদেশের রঙ্গামঞ্চকে চারভাগে ভাগ করা হয়— (১) অস্থায়ী মঞ্চ, (২) ক্লাসিকাল রঙ্গালয়, (৩) পশ্চিমী ধরনের মঞ্চ এবং (৪) ইয়াংকো থিয়েটার। এ দেশের প্রাথমিক মঞ্চ ছিল দেবমন্দিরের অঙ্গান। এখানে থেকেই তা হাটে, মাঠে মুক্তাঞ্চলে ছাড়িয়ে পড়ে। এইসব জায়গায় বাঁশ, মাদুর দিয়ে মঞ্চ করে পাটাতন তৈরি করে নাট্যাভিনয় চলত। মঞ্চের সম্মুখ অংশ থাকত উন্মুক্ত। যবনিকা, উইংস, যান্ত্রিক কলাকৌশল কিছুই থাকত না। তবে মঞ্চের পিছনে দুটো দরজা থাকত প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য। সঙ্গীত,আবৃত্তি, উজ্জ্বল পোশাক— এ জাঁকজমক থাকত মঞ্চে। চা-খানাকে কেন্দ্র করেও স্থায়ী রঙ্গালয় গড়ে ওঠে। চীনের পেপিং শহরকে থিয়েটারের পীঠস্থান বলা হয়ে থাকে। মন্দির, রেস্টুরেন্ট-এ নাট্যাভিনয়ের পাশাপাশি ইউরোপীয় ধারায় সংহাই, ক্যানটন প্রভৃতি বড় বড় শহরে রঙ্গালয় গড়ে ওঠে। স্থায়ী অস্থায়ী অসংখ্য রঙ্গালয়ের সন্ধান সে দেশে পাওয়া যায়।

চীনা রঙ্গালয়ে কর্তালের ঝঙ্কার, বেহালার বিলম্বিত সুর, কাষ্ঠখণ্ডের ক্লাপ শব্দ শোনা যেত। মঞ্চের প্রবেশদ্বার ছিল আকর্ষণীয়। মঞ্চের সামনে মেঝে এবং গ্যালারীতে দর্শক বসত। বর্ণসম্ভারে সুসজ্জিত থাকত মঞ্চ। মঞ্চে টানা আলো ব্যবহার করা হত, স্পটলাইট থাকত না। অভিজাত স্বল্পবিত্ত দর্শকদের আলাদা আলাদা ব্যবস্থা থাকত। মঞ্চের অভিনেতাদের চরিত্র অনুযায়ী (ধনী, দরিদ্র) পোশাক, বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করা হত। মঞ্চের বাঁদিকে অরকেস্ট্রার দল ঝাঁঝর, কর্তাল, ড্রাম, গং, ট্রাম্পেট, ফ্লুট, বেহালা ইত্যাদি নানারকম বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসত। নারী চরিত্রে দক্ষ পুরুষ অভিনেতারা অভিনয় করতেন। চীনদেশে মঞ্চের জন্য বহুরকম উপকরণ ছিল। মঞ্চের পিছনে থাকত গ্রীনরুম। কয়েকখানা মূল্যবান সিল্কের পর্দা, মেঝেতে পাতার জন্য (চিত্রিত রাগ) গালিচা, কয়েকটা চেয়ার-টেবিল, বাঁশের ফ্রেম এই জাতীয় মঞ্চোপকরণ ব্যবহার করা হত। মঞ্চের এই উপকরণগুলি সাধারণ মানের হলেও অভিনেতাদের পোশাক ও অভিনব কৌশল যথেষ্ট উন্নতমানের ছিল। চীনদেশের অভিনয় শিল্পীদের অল্প বয়স থেকে সুদীর্ঘকাল মঞ্চে শিক্ষানবিশি করতে হত। অভিনয় করার জন্য শারীরিক কসরত করাও তাদের প্রয়োজন হত।

চীনে সাধারণ রঙ্গালয় ছাড়াও রাজপ্রাসাদে এবং কোথাও কোথাও দোতলা, তিনতলা পর্যন্ত উন্নত শ্রেণীর মঞ্চ-স্থাপত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানকার ক্লাসিকাল রঙ্গামঞ্চে ব্যক্তিচরিত্র ছিল অনাদৃত। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার চিত্র, দার্শনিক জীবনাদর্শ, ধর্মীয় বিশ্বাস চীনা নাট্যশিল্পের অন্যতম বিষয় ছিল। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে চীনের সমাজজীবনবোধের পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে গড়ে উঠেছে

'ইয়াংকো' ধারার নাটক ও নাট্যমঞ্চ। শৌখিন নাট্যগোষ্ঠী ইউরোপীয় কায়দায় আধুনিক ধরনের রঙ্গামঞ্চ গড়ে তুলল। লৌকিক ধর্মের ক্রিয়াকলাপ, সামাজিক অনুষ্ঠান, জনপ্রিয় সঙ্গীত ও নৃত্য, কোরাস, প্রেম-প্রশস্তি— এ সবই ইয়ংকোর অঙ্গ ছিল। ক্রমে ক্রমে ইয়াংকো লোকশিল্পের মর্যাদা পায়। ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে-গঞ্জে। হয়ে ওঠে মুক্তাঙ্গন নৃত্যানুষ্ঠান। বসে যায় ইয়াংকোর মাঠে আনন্দের হাট। নৃত্য, কোরাস, বাজনা, সঙ্গীত, সুরের মূর্চ্ছনায় চীনা নাটক ও নাট্যমঞ্চ জীবনের গতি নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

গ্রীস ঃ গ্রীস দেশে ব্যালাড্ ডান্সের বহু বৈচিত্র্যের মাঝে যে ধারাটি পরিপুষ্টি লাভ করে তার নাম নাটক। ব্যালাড ডান্সের একটি পরিব্যাপ্ত রূপ কোরাস (chorus)। সঙ্গীতের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে এটি অন্যতম। এই কোরাস সঙ্গীত পাওয়ার সময় শিল্পীরা যে দেববেদী ব্যবহার করত তার থেকেই মঞ্চের ধারণা বা পরিকল্পনা গড়ে ওঠে। গ্রীস দেশে একজন প্রতিভাধর ব্যক্তি থ্রেস্পিস্ যিনি লিপিক ট্র্যাজেডিকে নাট্য-ট্রাজেডিতে রূপ দিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম নাটকের মাধ্যমে গ্রীক নাট্যভূমিতে মঞ্চের ব্যবহারকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিলেন। তবে এই রঙ্গামঞ্চের আকৃতি সম্পর্কে ভিন্ন মত আছে। কেউ বলেন— নাট্য-অভিনেতা থেস্পিস্ ঠেলা গাড়ির মত একটা উঁচু আসনে দাঁড়াতেন, কেউ বলেন— তিনি কাষ্ঠপীঠের মত একটা টেবিলের ওপর দাঁড়াতেন। এটাও শোনা যায় যে থেস্পিস্ গ্রামান্তরে গোরুর গাড়ি করে ঘুরতেন ও অভিনয় করতেন। তবে এ সমস্ত ধারণা সম্ভবত হোরেসের রচনা থেকে পাওয়া। কারণ হোরেসের রচনায় প্রথম রঙ্গামঞ্চ রূপে ঘোড়া ও গোরুর গাড়ির উল্লেখ আছে। যা হোক থেস্পিস্ নাটকে অভিনয় করার সময় দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও তাদের ভালো করে দেখা ও শোনার জন্য যে উঁচু জায়গার কথা ভাবতেন তা থেকেই মঞ্চের উৎপত্তি।[২] গ্রীক নাট্যশিল্পকে থেস্পিস্ নানাভাবে ক্রমোন্নতির পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করেছেন। নাটকের প্রয়োগ শিল্পের বিশেষত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে— অভিনব করার জন্য মুখে সাদা রং-এর প্রলেপ ব্যবহারে, বেশভূষায়, প্রস্তাবনায় এবং দূতের ভাষণে। থেস্পিসের সময় থেকেই নটের জন্য নির্দিষ্ট রঙ্গাভূমির নাম দল 'বেদি'। আর বেদির পিছনে বাগানের মত যে ছোট ঘরটি থাকত, তাই পরবর্তকালে রঙ্গামঞ্চের দৃশ্যপট ও পশ্চাদপট হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

নাটক জীবনকে নিখুঁতভাবে রূপায়িত করতে পারে। গ্রীক নাটক তার অপরূপ শৈল্পিক বিকাশের মধ্য দিয়ে যে নাটকীয় সজ্জা গ্রহণ করতে থাকে তার পক্ষে উল্লেখযোগ্য বিবর্তন হল মঞ্চের বিবর্তন। থেস্পিসের যুগের সেই অভিনয় বেদিই অদূরকালেই দিওন্যুসাসের থিয়েটারে রূপান্তরিত হয়। দিওন্যুসাস থিয়েটার গড়ে ওঠে আক্রোপোলিস অর্থাৎ নগরীর উচ্চভূমির দক্ষিণ ঢালুতে দিওন্যুসাস এলেউথেরেউসের পবিত্র পূজাভূমিতে। সম্ভবত খ্রিঃপূঃ ৬০০ অব্দে এই রঙ্গালয়টি গড়ে ওঠে। থেসপিস্ মঞ্চে চরিত্র

---

১. খ্রিঃপূঃ ৫৩৫ অব্দ।

২. গ্রীক রঙ্গালয়ের ক্ষুদ্র মধ্যবৃত্তকে অর্খেস্ত্রা (orchestra) বা নৃত্যভূমি বলা হত। বর্তমানকালে যারা নানারকম বাদ্যযন্ত্র বাজায় তাদেরকে অর্খেস্ত্রা বলা হয়।

পরিবর্তনের যে রীতি প্রচলন করেছিলেন, সেটাই মঞ্চে দৃশ্যসজ্জাকে সুচারুরূপে গড়ে তোলে। ফলে নাটকের প্রয়োগ পদ্ধতি ও মঞ্চশিল্প উভয়ই সেই সময় থেকে যথার্থভাবে বিকশিত হতে থাকল। কোরাস কেন্দ্রিক নাটকে মানুষ ও দেবতার সংঘাত নিয়ে বকখাস ও ল্যুকুর্গাস নামক দুই চরিত্রের অভিনয় দ্বন্দ্ব ও আবেগে তীব্রতর হয়ে ওঠে। গ্রীক কোরাস সঙ্গীত, একজন অভিনেতা ও একটি মঞ্চ যুক্ত হয়ে নাটকের প্রাথমিক রূপ গড়ে তোলে। এখান থেকেই দেখা যায় নাটকে কোরাস সঙ্গীতের পরিবর্তে কথোপকথন বৃদ্ধি পেয়ে মঞ্চ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

খ্রিঃপূঃ ৪৯৯ অব্দে গ্রীসে কোনো এক অভিনয়কালে কাঠের স্ট্যান্ড ভেঙে যাওয়ার কথা জানা যায়। এই ভেঙে যাওয়া জনিত কারণকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে কাঠের স্ট্যান্ড বা পাটাতনের পরিবর্তে পাহাড়ের কঠিন সানুদেশে রঙ্গালয় গড়ে ওঠে। তখনকার দিনের সুবিখ্যাত রঙ্গালয় ছিল এথেন্সের দিওন্যূসাস থিয়েটার। এই থিয়েটারে ইস্কাইলাস, সফোক্লিস, এউরিপিদেস, আরিস্তোফানেস প্রমুখ বিখ্যাত নাট্যকারদের নাটকগুলির প্রথম অভিনয় হয়। আইস্খ্যুলসের মঞ্চ পদ্ধতিও থেস্পিসের অনুসরণে গড়ে ওঠা। এই সময়ে গড়ে ওঠা রঙ্গালয়ে দর্শকদের বসার ব্যবস্থা ভাল ছিল না, অভিনেতাদের জন্য অরখেস্ত্রা ছাড়া যথার্থ মঞ্চ ছিল না। এই সময় থেকেই অরখেস্ত্রা ও মঞ্চ আলাদা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়। নাটকে ধর্মীয় প্রেরণার কারণে কোরাসের প্রাধান্য কমে যায়। নাটকীয় ক্রিয়া সংঘাতে কোরাসের প্রাধান্য কমে যাওয়া গ্রীক রঙ্গামঞ্চের সাধারণ ইতিহাসে একটা লক্ষণীয় বিষয়। মঞ্চে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ ও যান্ত্রিক পদ্ধতির যে পরিবর্তন তা নাটকের কুশীলবদের প্রয়োজনেই। তাছাড়া এই সময়ে লেখা নাটকগুলো মঞ্চকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। কখনো আবার দেখা গেছে নাট্য বিষয়ের প্রয়োজনে মঞ্চেরও নানারকম বিবর্তন ঘটেছে। কখনো কখনো অনিপুণ কিছু দৃশ্যাবলী মঞ্চে প্রবেশ করেছে। গ্রীসে প্রাচীন রঙ্গামঞ্চের ভগ্নাবশেষে যে কাঠের বীমের ভগ্ন প্রান্তভাগ দেখা যায় সেটা আসলে পশ্চাদ্‌পটের স্কেনের কাঠামো।

ইস্কাইলাসের পর সফোক্লিসের সময়ে নাটকেও তার প্রয়োগশিল্পের আঙ্গিকে পরিবর্তন দেখা যায়। এথেন্সের নিম্নভূমিতে 'থিয়েত্রোন' নাম রঙ্গালয়ের সৃষ্টিও হয়। মূলমঞ্চের গঠন একই রকম রেখে মাঝে বিভিন্ন ধরনের নাটকের জন্য বিভিন্ন ধরনের মঞ্চ বা মঞ্চদৃশ্য ব্যবহার করা হত। প্রথম দিককার অস্থায়ী মঞ্চ পরের দিকে স্থায়ী মঞ্চে পরিণত হয়েছে। গ্রীসের প্রাচীন নাট্যশালার মধ্যে এপিদাউরসের মঞ্চ গঠনশৈলী বেশ উন্নত মানের ছিল। এখানে দর্শক-শ্রোতাদের প্রবেশ-প্রস্থানে সুবিধার জন্য তীক্ষ্ণ নজর ছিল। গ্রীসে যথার্থ নাটক গড়ে তোলার জন্যই রঙ্গামঞ্চের অগ্রগতি হয়েছে। আবার গ্রীকমঞ্চে অভিনয়ের নানান কৌশল, অবলম্বন করার প্রমাণও পাওয়া যায়। এ যুগের প্রধান যান্ত্রিক কৌশল তিনদিকের তিন দৃশ্য ঘুরিয়েই দৃশ্যপট পরিবর্তন করা। দ্বিতীয় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে দৃশ্য অপসারণ, দৃশ্য সজ্জিত করে রাখা এবং নতুন দৃশ্য রচনা করা যেত। তৃতীয়ত সঞ্চরণশীল মঞ্চবেদি এই সময় তৈরি হয়। এউরিপিদিস

তাঁর বহু নাটকে দেব-আদেশ জাতীয় অভিনব মঞ্চকৌশল ব্যবহার করে নাটককে এক আকস্মিক পরিণতির দিকে নিয়ে যেতেন। এভাবেই নাটকে মঞ্চ নির্ভরশীলতা বাড়তে থাকে। খ্রিঃপূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে "ফ্লাইং মেশিন"-এর ব্যবহারও দেখা যায়। "এরেত্রিয়া" থিয়েটারে মঞ্চের নিচে ভূগর্ভ পথের সন্থানও পাওয়া যায়। গ্রীক নাটকে প্রতিনিয়ত যে ভাঙা-গড়া চলত তার সূত্র ধরেই মঞ্চোপকরণ ও কলাকৌশলের নানা পরিবর্তন ঘটেছে। এক্ষেত্রে নাট্যকারদের দাবি মেটানো এবং অভিনেতাদের প্রাধান্যও স্মরণযোগ্য।

হেলেনীয় যুগ গ্রীসের শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রীক সভ্যতার অবক্ষয়ের যুগ। 'মাইমস্' এই সময়কার সৃষ্টি। এ যুগের প্রতিভাবান এবং শক্তিশালী শিল্পী-অভিনেতার অভিজাত ধরনের রঙ্গভূমি গড়ে তোলার দিকে নজর দিলেন। এই সময়ে গ্রীসে সর্বপ্রথম উচ্চতা বিশিষ্ট মঞ্চের আবির্ভাব ঘটে। এ সবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ "প্রিয়েনে" থিয়েটার। এ যুগে নাট্যসাহিত্যের খুব বেশি বিবর্তন না হওয়ায় মঞ্চ স্থাপত্যেও তেমন উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ে নি। যা হোক গ্রীক যুগের শেষ পর্যায়ে এসে দেখা যায়—অরখেস্ত্রা ছিল প্রাচীন "আরখেইক্" যুগের তৈরি, থিয়েটার বা রঙ্গামঞ্চ ছিল ক্লাসিকাল যুগে অর্থাৎ খ্রিঃপূঃ চতুর্থ শতকে তৈরি এবং অভিনব মঞ্চ হল হেলেনীয় যুগে তৈরি। নাটকে আদর্শ মঞ্চ ধারণা এভাবেই গড়ে ওঠে।

গ্রীক মঞ্চ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কোরাস, অরখেস্ত্রা, স্কেনে, বেদি খুবই উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন গ্রীসে অভিনয় ক্ষেত্রটি তৈরি হত একটি স্বল্পায়ত বৃত্তাকার গর্তের মধ্যে। এই গর্তের পিছনে থাকত দেবমন্দির। তারপর জনপথ, সমুদ্রতীর, ককেশাস পাহাড়ের নির্জনভূমি, রাজপ্রাসাদের সম্মুখ—এমনিভাবে ধাপে ধাপে তার অগ্রগতি।

৮৮.১০ সারাংশ

মিশরের 'পিরামিড টেক্সটস্' থেকে সেদেশের নাটক সম্বন্ধে জানা যায়। মিশরের অভিজাতদের কবরভূমিতে নাটকের সঙ্গে মঞ্চের উল্লেখ পাওয়া যায়। নাটকে নৌকা পোশাক ও অলঙ্কারের ব্যবহার ছিল। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে নাটক হত। স্থায়ী কোনো রঙ্গামঞ্চ ছিল না। নাটকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান, শোভাযাত্রা গুরুত্ব পেত।

চীনা নাটকের প্রাচীন উৎস হল নৃত্য। আবেগতাড়িত হয়ে থং সম্রাট একটি নাটকের দল তৈরি করেন। দেবতার কাহিনী নাটকের বিষয় হয়ে ওঠে। চীনের নাটক অনেক ক্ষেত্রে চরিত্র নির্ভর ছিল। মঞ্চ, সাজসজ্জা, চরিত্র অনেকের কাছ আকর্ষণীয় ছিল। দেবমন্দির, মুক্তাঞ্চলে নাট্যাভিনয় চলত। মঞ্চের গঠন, মঞ্চের উপাদান, আবৃত্তি পোশাক খুবই জাঁকজমক থাকত। চা-খানাকে কেন্দ্র করে স্থায়ী রঙ্গালয় গড়ে ওঠে। মন্দির, রেস্টুরেন্ট ছাড়াও বড় বড় শহরে অনেক রঙ্গালয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। চীনা রঙ্গালয়ে

বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, সুসজ্জিত মঞ্চ, আলাদা বসার জায়গা, টানা আলোর ব্যবহার—এ জাতীয় বহুরকম উপকরণ ছিল। মঞ্চোপকরণ সাধারণ মানের হলেও পোশাক ও অভিনয় কৌশল ছিল উন্নতমানের। সাধারণ রঙ্গালয় ছাড়া রাজপ্রাসাদেও কোথাও কোথাও রঙ্গালয় ছিল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, দার্শনিক জীবনাদর্শ চীনা নাট্যশিল্পে থাকলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে চীনে গড়ে উঠেছে 'ইয়াংকো' ধারার নাটক ও নাট্যমঞ্চ।

গ্রীস দেশে কোরাস সঙ্গীত থেকেই মঞ্চের ধারণা গড়ে ওঠে। হোরেসের রচনা থেকে জানা যায় থেস্‌পিস দর্শকদের নাটক দেখার জন্য উঁচু জায়গা থেকে অভিনয় করতেন। এখান থেকেই মঞ্চের ধারণা গড়ে ওঠে। মঞ্চোপকরণ হিসেবে মুখে সাদা রং, বেশভূষা, প্রস্তাবনা, দৃশ্যপট প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। থেস্‌পিসের যুগের 'বেদি' পরবর্তীকালে দিওন্যুসাসের থিয়েটারে রূপান্তরিত হয়। এর নাটকের শৈল্পিক বিকাশ ঘটে কথোপকথনের মাধ্যমে। দিওন্যুসাস থিয়েটারে ইস্কাইলাস, সফোক্লিস প্রমুখদের বিখ্যাত নাটক অভিনীত হয়। পাহাড়ের সানুদেশে রঙ্গালয় গড়ে ওঠে। দর্শকদের বসার ব্যবস্থা হয়। মঞ্চে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ ও যান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে। সফোক্লিসের সময়ে নাটকের আঙ্গিকে পরিবর্তন দেখা যায়। গ্রীসে যথার্থ নাটক গড়ে তোলার জন্য রঙ্গমঞ্চের অগ্রগতি ঘটেছে। সঞ্চরণশীল মঞ্চবেদি এই সময়ে তৈরি হয়। 'মাইমস্' হেলেনীয় যুগের সৃষ্টি। সর্বপ্রথম উচ্চতাসম্পন্ন মঞ্চের আবির্ভাব এই সময়ে। নাটক, মঞ্চ, মঞ্চোপকরণ, কলাকৌশল এমনিভাবেই ধাপে ধাপে গ্রীক রঙ্গালয়ের অগ্রগতি ঘটেছে।

৮৮.১১ অনুশীলনী ৩

১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর ডানদিক থেকে বেছে নিয়ে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) চীনদেশীয় নাটকের প্রাচীনতম উৎস হল—
১। গীত
২। নৃত্য
৩। পূজা

(খ) চীনা নাট্যশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে—
১। ইয়াং রাজত্বে
২। থং রাজত্বে
৩। মাঞ্চু রাজত্বে

(গ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চীনে গড়ে ওঠে—
১। ইয়াংকো নাট্যগোষ্ঠী
২। শৌখিন নাট্যগোষ্ঠী
৩। ক্লাসিক নাট্যগোষ্ঠী

(ঘ) থেস্‌পিসের সময় রঙ্গামঞ্চের নাম হল— ১। গোরুর গাড়ি
২। বাগান
৩। বেদি

(ঙ) ইস্কাইলাসের পরের নাট্যকার— ১। এউরিপিদিস
২। সফোক্লিস
৩। থেস্‌পিস্‌

(চ) সঞ্চরণশীল মঞ্চবেদী প্রতিষ্ঠিত হয়— ১। চীন
২। গ্রীস
৩। মিশর

২। নিচের শূন্যস্থানগুলি সঠিক উত্তর লিখে পূরণ করুন।

(ক) আই-খার্‌-নেফার্ট —— প্লের প্রথম নাট্যপরিচালক।

(খ) মাঞ্চু রাজত্বে রঙ্গামঞ্চে —— প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।

(গ) চীনা নাটকে —— চরিত্রের প্রাধান্য ছিল।

(ঘ) চীনের থিয়েটারের পীঠস্থান —— শহর।

(ঙ) ব্যালাড্‌ ডান্সের একটি পরিব্যাপ্ত রূপ ——।

৩। নিচের বক্তব্যগুলি ঠিক বা ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান ঃ

	ঠিক	ভুল
(ক) 'মিং হুয়াং' থং সম্রাট ছিলেন।	☐	☐
(খ) চীনদেশে চা-খানাকে কেন্দ্র করে স্থায়ী রঙ্গালয় গড়ে ওঠে।	☐	☐
(গ) গ্রীসে পাহাড়ের সানুদেশে রঙ্গালয় গড়ে ওঠে।	☐	☐
(ঘ) 'ফ্লাইং মেশিন'-এর ব্যবহার পঞ্চম শতাব্দীতে	☐	☐

৮৮.১২ মূলপাঠ (চতুর্থ অংশ) বিদেশী মঞ্চ ঃ ইংরেজি মঞ্চ ও অন্যান্য

ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর রাজসভায় নানা ধরনের উৎসব ও নাট্যানুষ্ঠান হত। এখানে রেনেসাঁস যুগের ক্লাসিকাল ধারার ল্যাটিন নাটক রচিত ও অভিনীত হতে থাকে। বিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিও রাজসভার অনুকরণে নাট্যানুষ্ঠান শুরু করে। রাজা হেনরীর সময়ে নিকোলাস উদালের 'র‍্যালেফ্‌ রোইস্টার

ডোইস্টার' নাটক এবং প্রথম এলিজাবেথের সময়ে 'গোর্বোডাক' এবং 'গ্যামার গার্টনস্ নীডল' নামক দুখানি নাটক পাওয়া যায় যা ক্লাসিক রীতিনীতি ভঙ্গ করেই অভিনীত হয়। প্রথম এলিজাবেথ ১৫৫৮ সালে সিংহাসনে বসেন। তিনি নাটকে যথার্থ পরিবর্তন আনেন। তাঁর সময়ে কবি ও নাট্যকার রিচার্ড এডোয়ার্ডস রাজসভার গায়ক ও অভিনেতা বালকদের শিক্ষা দিতেন। এডোয়ার্ডস নিজে হালকা রোমান্টিক কমেডি নাটকও লিখতেন। তাঁর নাটকে ব্যবহৃত পোশাক, নাটকের অভিনয় সকলের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। এডোয়ার্ডেসের পর চ্যাপেল রয়ালের বালকদের শিক্ষার দায়িত্ব পান ইউলিয়াম হান্নিস। এই সময়ে রানী বেশ কিছু কিশোর দল তৈরি করেন। তার মধ্যে একটি তাঁর গ্রীষ্মকালীন আবাসে গড়ে ওঠে এবং তার দায়িত্ব পান রিচার্ড ফ্যারান্ট। এই ফ্যারান্ট রানীকে যে সমস্ত নাটক দেখাতেন, সেগুলো অভিজাত দর্শকদেরও দেখানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ফলে নাট্য প্রযোজনার ব্যাপারে অনেকে উৎসাহী হয়ে উঠল, অভিজাতরা অর্থব্যয় করে অভিনয় দেখতে শুরু করল। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে রিচার্ড ফ্যারান্ট "ব্লাকফ্রাইয়ারস্" নামে একটি হলঘর লীজ নিয়ে সেখানে অভিনয় দেখাতে শুরু করলেন।

এইভাবে পেশাদারী অভিনয় শুরু হল। ভাল নাট্যদল গড়ে উঠল। ব্যবসায়ী নাট্য প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের নাটক ও নাটকের প্রয়োগশিল্পের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হল। এলিজাবেথীয় যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল শেকসপীয়রের নাটক ও মঞ্চে তার ব্যবহার। এলিজাবেথীয় যুগে নাটক সমাজের সব ধরনের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ছিল। বাস্তব সমাজের সব রকম জীবনধারার পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিতে যেমন এলিজাবেথীয় যুগ, তেমনি শেকসপীয়রীয় থিয়েটার এবং দর্শক একাত্ম হয়ে উঠেছিল। ছন্দ, সুর, ভাবাবেগ, নাটকীয় কলা কৌশল ইংরেজ জাতির জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। রানী এলিজাবেথ নাটকের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও উচ্চশ্রেণীর নাটক ও নাট্যশালা সম্পর্কে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। ফলে শেকসম্পীয়রদের মহান সৃষ্টি হাট-মাঠ, সরাইখানা জাতীয় রঙ্গালয় থেকে অনুকূল পরিবেশ পেয়ে উঠে আসা। তখন রাজ্যসভার পাশাপাশি সরাইখানায় অভিনয়ের জন্যও নাটক লেখা হত। এলিজাবেথের সময়ে রাজসভার নাটকে সেট, সিন ও স্থাপত্যেশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৭শ শতকে ইংরেজি রঙ্গামঞ্চের বিখ্যাত নাম "ইনিগো জোনস" ইতালীয় মঞ্চের অনুকরণে চিত্রাঙ্কণ, দৃশ্যপট, যবনিকা, রূপক চরিত্রের জন্য বিচিত্র ধরনের পোশাক ব্যবহার করে ইংলণ্ডের মঞ্চকে বিশেষভাবে সজ্জিত ও প্রভাবিত করেছিলেন।

প্রথম রাজসভার থিয়েটার, পরে সাধারণ রঙ্গালয়—এই দুইয়ের পাশাপাশি ইংলণ্ডে এক ধরনের ব্যক্তিগত রঙ্গালয় গড়ে ওঠে। এগুলো মূলত অভিজাত শ্রেণীর এবং স্কুল-কলেজের নিজস্ব রঙ্গালয়। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে শেকসপীয়রের দল 'ব্লাকফ্রাইয়্যারসে'র রঙ্গালয়টি পুনর্গঠন করে সেখানে অভিনয় চালাতে থাকে। রঙ্গালয়ের একপাশে যে মঞ্চ ছিল তাতে দৃশ্যসজ্জার প্রভাব ছিল। প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের

বসার জন্য বেঞ্চের ব্যবস্থা ছিল। রঙ্গালয় ছোট হওয়ায় দর্শকের আসন সংখ্যাও ছিল অল্প। রাজপ্রাসাদে বড় বড় হলঘরে নাট্যাভিনয় হত। স্কুল-কলেজের জন্য আলাদা অভিনয় কক্ষ নির্মিত হতে থাকল। দেখা যাচ্ছে এ যুগে নাট্যাভিনয়ের জন্য নানাধরনের নাট্যমঞ্চ তৈরি হয়েছিল। তাছাড়া অভিনেতাদের পোশাক পরিচ্ছেদ, মঞ্চদৃশ্য ও অন্যান্য উপকরণ যথাযথ ব্যবহারের ব্যবস্থা ছিল। শেকস্‌পীয়রের নাটকের মধ্যেই মঞ্চ পরিকল্পনার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

ইংলণ্ডের পেশাদার অভিনেতারা ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সরাইখানায় রঙ্গামঞ্চ করে স্থায়ীভাবে অভিনয় শুরু করে। সে সময় লণ্ডন শহরেই একমাত্র স্থায়ী রঙ্গালয় ছিল। লণ্ডনের দলগুলো গ্রামে অভিজাতদের প্রাসাদে অভিনয় করলে জমিদারের দুর্গের প্রধান হলঘরে মঞ্চ তৈরি হত। কখনও কখনও ভ্রাম্যমাণ দল ওয়াগন্ মঞ্চে অভিনয় করত। নাট্যাভিনয়ের জনপ্রিয়তার কারণে ব্যবসায়ীরা লণ্ডনের বড় বড় সরাইখানা ভাড়া নিয়ে স্থায়ী রঙ্গামঞ্চ তৈরি করে। সরাইখানার একটা বিশেষত্ব ছিল। যেমন আকাশের নিচে অনাবৃত মুক্তাঙ্গন, দেওয়ালের গায়ে দু'তিন সারি গ্যালারী অভিমুখী সিঁড়ির কাছে মঞ্চ, মঞ্চের পিছনে পর্দা, তার পিছনে অভিনেতাদের সাজসজ্জার ঘর, সামনের চত্বরে দর্শক। ইতিমধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের নাটকের ওপরে বড় ধরনের আঘাত নেমে আসে। অবশেষে 'জেমস্ বারবাজ্' থিয়েটারকে বাঁচানোর জন্য একটা পরিকল্পনা করেন। বিখ্যাত এই অভিনেতা, সূত্রধর এবং মঞ্চশিল্পী পৌরসভার বাইরে একটি রঙ্গালয় তৈরি করেন। এখানেই ১৫৭৫-এ 'দ্য থিয়েটার' নামের সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরবর্তী ২৫ বছরে অনেকগুলো রঙ্গালয় গড়ে উঠেছিল।

শেকস্‌পীয়রের যুগে সাধারণ রঙ্গালয় কাঠ, খড়, টালি দিয়ে তৈরি হয়েছিল। সোয়ান থিয়েটারে দেখা যায় বৃত্তাকার প্রেক্ষাগৃহ, উন্মুক্ত স্টেজ, মঞ্চের পিছনে দেওয়ালে— তার দুপাশে দুটি দরজা, মঞ্চের চারদিকে গ্যালারী। এরকম নানারকম বর্ণনার কিছু নাট্যমঞ্চের সন্ধান এই সময় পাওয়া যায়। মঞ্চের প্রধান প্রধান চরিত্রদের বৃহৎ স্বগতোক্তি মার্লো ও শেকস্‌পীয়রের নাটকে বেশি দেখা যায়। এলিজাবেথীয় মঞ্চ স্বগতোক্তির পক্ষে আদর্শস্থানীয় ছিল। শেকস্‌পীয়রের নাটকে বর্হিদৃশ্য, অর্ন্তদৃশ্য দেখা যায়। মঞ্চ পরিকল্পনা ছিল উন্নতমানের। 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' নাটকে ব্যালকনির ব্যবহার দেখা গেছে। দরজা, জানলা, ছাদ, স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য, বৃত্তাকার প্রেক্ষাগৃহ— এ জাতীয় বাস্তব ভাবনা মাথায় রেখে মঞ্চ গঠন হয়েছিল। যান্ত্রিক কলা কৌশল সাধারণ রঙ্গামঞ্চ এসে গেছে। মঞ্চের কাছেই অভিনেতাদের সাজঘর থাকত। এই সময়কার সাধারণ রঙ্গালয়গুলি প্রায় একই রকমের ছিল। মঞ্চগুলো ছিল বর্ণবহুল। এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যোন্নতির পক্ষে এই রঙ্গামঞ্চগুলি ছিল অত্যন্ত সহায়ক।

সামাজিক অবস্থা ও দর্শকদের মানসিকতার দিকে তাকিয়ে নাট্যকারদের নাটক রচনা করতে হত। অনুন্নত মানের শিল্পকর্মে প্রবল আপত্তি দেখা যেত। মার্লোর স্বল্প রচনা যেমন এলিজাবেথীয় যুগকে চিরস্মরণীয় করে রাখে, শেকস্‌পীয়রও সর্বকালের মানুষের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সম্মান পান।

রঙ্গামঞ্চের সঙ্গে শেকস্‌পীয়রের প্রত্যক্ষ যোগের ফলে তিনি নাটকীয় কলাকৌশলে পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। এ যুগের দর্শকরা মঞ্চে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দুটোই দেখতে চাইত। লণ্ডনের 'প্যান্টামাইম' অভিনয়ে যেরূপ যান্ত্রিক কৌশল প্রদর্শিত হয়ে থাকে জগতের আর কোথাও এমন দেখতে পাওয়া যায় না।

ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের বিরোধের ফলে থিয়েটারের ওপর আঘাত হেনেছে, কিন্তু তাকে দমন করা যায় নি। আঘাতের পরবর্তী যুগকে থিয়েটারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ যুগের নাটকে ছিল জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা। ফলে নাটকের সঙ্গে পাল্টেছে মঞ্চের প্রকৃতি। শেকস্‌পীয়রীয় যুগের ঠিক বিপরীত ছিল এই যুগ। এই যুগের নাটক অভিজাত ইংরেজদের কাছে গল্পগুজব বাবুয়ানার জায়গায় পর্যবসিত হয়। 'জন ওয়েব'-এর রচনা থেকে রেস্টোরেশন যুগের মঞ্চশিল্প, দৃশ্যসজ্জা সম্পর্কে জানা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে 'ইনিগো জোনস্' অনেক বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে নাটকে আড়ম্বরপূর্ণ দৃশ্যসজ্জা প্রণালী, মঞ্চস্থাপত্য ও দৃশ্যাপসারণ পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। অনেক দিন পর্যন্ত এই পদ্ধতি চালু ছিল। রেস্টারেশন মঞ্চ দরবারী মঞ্চে পরিণত হয়েছিল। আধুনিক রঙ্গালয় এ যুগেই আরম্ভ হয়েছিল। 'দ্য রেড বুল', 'সলসবেরী কোর্ট', 'ডিউকস প্লে হাউস' নামক কিছু থিয়েটার হয় স্থাপিত না হয় পুনর্গঠিত হয়। নাটকে মুখবন্ধ, যবনিকা, স্বস্তিবচন, মঞ্চে দৃশ্য পরিবর্তন ছিলই। ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি মঞ্চে অঙ্ক-যবনিকা এল। মঞ্চে মোমবাতি বা তেলের বাতি জ্বেলে আলোকসজ্জা হত। রঙ্গালয় ছিল গৃহাভ্যন্তরে। এই সময়কার রঙ্গামঞ্চে বাস্তব এবং প্রথাসম্মত ব্যবস্থার অদ্ভুত সমন্বয় ঘটেছিল। এই যুগের মঞ্চশিল্পে স্বদেশী-বিদেশী পদ্ধতির সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়।

৮৮.১৩ সারাংশ

রাজা অষ্টম হেনরীর সময় থেকে ইংলণ্ডে নাট্যানুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথম এলিজাবেথ নাটকে পরিবর্তন আনেন। এই সময়ে গায়ক ও অভিনেতা এডোয়ার্ডস নাটককে সকলের কাছে জনপ্রিয় করে তোলেন। পরে রিচার্ড ফ্যারান্ট-এর আগ্রহ ও উৎসাহে রানী হলঘর ভাড়া নিয়ে অভিনয় দেখাতে শুরু করেন। এইভাবে পেশাদারী ভালো নাট্যদল গড়ে ওঠে। এলিজাবেথীয় যুগে শেকস্‌পীয়রের নাটক মঞ্চস্থ হয়। নাটকীয় কলাকৌশলের দ্বারা অভিনয় বাস্তব সমাজের নানান ঘটনা প্রকাশ করে। শেকস্‌পীয়রের নাটক সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। রাজসভার থিয়েটারের পাশাপাশি ইংলণ্ডে ব্যক্তিগত থিয়েটার গড়ে ওঠে। অভিজাত শ্রেণী, স্কুল-কলেজের জন্য আলাদা আলাদা নাট্যালয় গড়ে ওঠে। মঞ্চদৃশ্য, পোশাক-পরিচ্ছদের যথাযথ ব্যবহার শুরু হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে সরাইখানায় স্থায়ী রঙ্গামঞ্চ গড়ে ওঠে। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ব্যবসায়ীরা এই সব সরাইখানা ভাড়া দিয়ে রঙ্গামঞ্চ তৈরি করে। এক সময়ে এর ওপরেও নেমে আসে আঘাত। ফলে পৌরসভার বাইরে গিয়ে গড়ে ওঠে রঙ্গালয়।

শেকস্‌পীয়রীয় যুগে রঙ্গালয় কাঠ, খড়, টালি দিয়ে তৈরি হয়েছিল। এই সময়ে চরিত্রদের মধ্যে স্বগতোক্তি দেখা যায়। গড়ে উঠেছে ব্যালকনি, সাজঘর, বর্ণবহুল রঙ্গামঞ্চ। নাট্যোন্নতির জন্য শেকস্‌পীয়র সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সম্মান পান। নাটকে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জীবনের অন্তঃসারশূন্যতার ফলে নাটকের সঙ্গে মঞ্চের প্রকৃতি পাল্টেছে। অনেক বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে রেস্টোরেশন মঞ্চ দরবারী মঞ্চে পরিণত হয়েছে। বাস্তব এবং প্রথাসম্মত ব্যবস্থায় আধুনিক রঙ্গালয় এ যুগেই তৈরি হয়েছিল।

৮৮.১৪ অনুশীলনী ৪

১। নিচের শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন ঃ

(ক) প্রথম এলিজাবেথ — সালে সিংহাসনে বসেন।
(খ) 'ইনিগো জোন্‌স' — মঞ্চের অনুকরণ করেন।
(গ) প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের বসার জন্য — ব্যবস্থা ছিল।
(ঘ) ব্যবসায়ীরা লণ্ডনে — ভাড়া নিয়ে রঙ্গামঞ্চ তৈরি করে।
(ঙ) ইংল্যাণ্ড — বিরোধের ফলে থিয়েটারের ওপর আঘাত নেমে আসে।

২। নিচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) রানীর গ্রীষ্মকালীন আবাসের দায়িত্ব পান—
(১) এডোয়ার্ডস্‌
(২) ফ্যারাণ্ট
(৩) উইলিয়াম হানিস

(খ) শেকস্‌পীয়র সবচেয়ে খ্যাতি পেয়েছিলেন—
(১) রেনেসাঁস যুগে
(২) হেলেনীয় যুগে
(৩) এলিজাবেথীয় যুগে

(গ) 'ব্ল্যাকফ্রাইয়্যারস' রঙ্গালয়টি পুনর্গঠিত হয়—
(১) ১৬০৮ খ্রিঃ
(২) ১৮০৬ খ্রিঃ
(৩) ১৬০৬ খ্রিঃ

(ঘ) ইংলণ্ডের সরাইখানায় স্থায়িভাবে রঙ্গামঞ্চ তৈরি হয়—
(১) ষোড়শ শতাব্দীতে
(২) পঞ্চদশ শতাব্দীতে
(৩) সপ্তদশ শতাব্দীতে

(ঙ) রেস্টোরেশন যুগের মঞ্চশিল্প সম্পর্কে জানা যায়— (১) 'ইনিগো জোনস্'-এর রচনা থেকে
(২) 'জন ওয়েব'-এর রচনা থেকে
(৩) 'মার্লো'-র রচনা থেকে

৮৮.১৫ উত্তর-সংকেত

অনুশীলনী ১। ১। (ক) ঠিক (খ) ভুল (গ) ঠিক (ঘ) ঠিক (ঙ) ভুল
২। (ক) ২ (খ) ৩ (গ) ১

অনুশীলনী ২। ১। (ক) ১ (খ) ১ (গ) ১।
২। (ক) ঠিক (খ) ঠিক (গ) ভুল (ঘ) ঠিক

অনুশীলনী ৩। ১। (ক) ২ (খ) ২ (গ) ১ (ঘ) ৩ (ঙ) ২ (চ) ২
২। প্যাশান (খ) অভিনেত্রীদের (গ) টাইপ (ঘ) পেপিং (ঙ) খোরাস।
৩। (ক) ঠিক (খ) ঠিক (গ) ঠিক (ঘ) ভুল

অনুশীলনী ৪। ১। (ক) ১৫৫৮ (খ) ইতালীয় (গ) বেঞ্চ (ঘ) সরাইখানা (ঙ) রাজতন্ত্রের।
২। (ক) ২ (খ) ৩ (গ) ১ (ঘ) ১ (ঙ) ২

৮৮.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক — ড. গীতা সেনগুপ্ত।
২। বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস— ড. অজিত কুমার ঘোষ।
৩। নাটকের কথা— ড. অজিতকুমার ঘোষ।
৪। লোক সংস্কৃতি গবেষণা ('যাত্রা' বিশেষ সংখ্যা)— সম্পাদনা : ড. সনৎকুমার মিত্র।

একক ৮৯ ❑ মঞ্চাভিনয় ঃ বাংলা নাটক

গঠন

৮৯.১ উদ্দেশ্য

৮৯.২ প্রস্তাবনা

৮৯.৩ মূলপাঠ (প্রথম অংশ) : কোলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয় ও তার প্রেরণা

৮৯.৪ সারাংশ

৮৯.৫ অনুশীলনী— ১

৮৯.৬ মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) : কোলকাতায় বাংলা নাট্য অভিনয়ের সূচনা : লেবেডফ, প্রসন্ন ঠাকুরের মঞ্চ

৮৯.৭ সারাংশ

৮৯.৮ অনুশীলনী — ২

৮৯.৯ মূলপাঠ (তৃতীয় অংশ) : শ্যামাবাজার নবীন বসু বেলগাছিয়া নাট্যশালার নাট্যাভিনয়

৮৯.১০ মূলপাঠ (চতুর্থ অংশ) : জোড়াসাঁকো, পাথুরেঘাটা ও নবকৃষ্মদেবের শোভাবাজার নাট্যশালার নাট্যাভিনয়

৮৯.১১ মূলপাঠ (পঞ্চম অংশ) : বাগবাজার-শ্যামবাজার নাট্যসমাজ ও সাধারণ রঙ্গামঞ্চ, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রভৃতি

৮৯.১২ সারাংশ (মূলপাঠ ৩,৪,৫)

৮৯.১৩ অনুশীলনী (মূলপাঠ ৩,৪,৫)

৮৯.১৪ উত্তর সংকেত

৮৯.১৫ গ্রন্থপঞ্জি

৮৯.১ উদ্দেশ্য

এই একক পড়লে আপনি—

- বিদেশী রঙ্গালয় থেকে কিভাবে আমাদের দেশে থিয়েটারী অভিনয় শুরু হয় তা জানতে পারবেন।
- থিয়েটারে বাংলা নাটকের অভিনয়ের সূচনা কিভাবে হয় তা জানতে পারবেন।
- লেবেডফ্ প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গালী থিয়েটার থেকে সাধারণ রঙ্গামঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা পর্যন্ত সময়কালে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ইংরেজি নাটকের অভিনয় ধারা বাঙালি অভিনেতাদের মধ্যে কিভাবে সংক্রামিত হয়েছিল তা জানতে পারবেন।
- তখনকার দিনের পত্র-পত্রিকাগুলো নাটক ও নাট্যমঞ্চ সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করত তা জানতে পারবেন।
- থিয়েটারের মাধ্যমে কিভাবে লোকশিক্ষা হয় জানতে পারবেন।

৮৯.২ প্রস্তাবনা

রঙ্গামঞ্চের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ আমাদের মধ্যে বৈচিত্র্য সঞ্চার করে। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি কলকাতায় বিদেশী নাট্যালয় গড়ে ওঠার পর অনেক রঙ্গালয়ের সৃষ্টি হয়। প্রাচীন সংবাদপত্রে এর পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরেজরা মূলত চিত্ত বিনোদনের জন্য এইসব নাট্যশালা গড়ে তোলেন। তবে এলিজাবেথীয় রীতি মেনেই এইসব রঙ্গামঞ্চ তারা গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। বিদেশী রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখে তার সম্পর্কে দর্শকদের মধ্যে একটা নতুন বোধ গড়ে ওঠে। দেশী-বিদেশী বেশ কিছু নামকরা ব্যক্তি এখানে অভিনয় করেছেন। এইসব অভিনয় দেখে স্বদেশীরা বিদেশীদের অনুকরণে নিজেদের গৃহপ্রাঙ্গণে থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ইংরেজদের থিয়েটারের ৩৯ বছর পরে ১৭৯৫ সালে প্রথম বাংলা নাট্যশালার আবির্ভাব। এই নাট্যশালার উদ্যোক্তা রুশ দেশীয় নাট্যানুরাগী 'গেরাসিম স্টেপানোভিচ লেবেডফ'।

জানা যায় বাঙালি প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারে এ দেশীয় লোকেরা ইংরেজি নাটকের অভিনয় করেছিলেন। লেবেডফের সময় থেকে ৭৭ বছর পরে অর্থাৎ ১৮৭২ সালে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই এককে বাংলা নাটক, নাট্যমঞ্চ ও মঞ্চাভিনয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে যুগ প্রবণতা, মঞ্চের উদ্ভবের কথা, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কথা, সাজসজ্জা, আঙ্গিক, আলোক-

সম্পাতের কথা গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা রঙ্গমঞ্চ বাংলার শিল্প-সাহিত্য ইতিহাস সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বাঙালিকে নতুন ভাবনার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে। রঙ্গমঞ্চ বাঙালির সংস্কৃতি ও সহিত্যচর্চাকে উজ্জীবিত করে তুলেছে।

৮৯.৩ মূলপাঠ (প্রথম অংশ) ঃ কোলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয় ও তার প্রেরণা

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আমাদের দেশে বিদেশী রঙ্গালয় থেকে থিয়েটারী অভিনয়ের সুত্রপাত। এই সময়ে খোলামঞ্চে গীতপ্রধান যাত্রাভিনয়ের প্রচলন ছিল। চারদিকে ঘেরা মঞ্চে যখন অভিনয় শুরু হল তখন নাটক এবং মঞ্চের শিল্পরীতি পাল্টে গেল। ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চ ও তাদের রোমান্টিক অভিনয় তখন এখানকার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অনুসরণ করতেন। এই অভিনয়ে কণ্ঠস্বরের উচ্চতা, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, অতিনাটকীয় যা ছিল তা আমাদের দেশীয় অভিনয়েও দেখা যেত। ফলে বাংলা নাট্যশালা ইংরেজ রঙ্গালয়ের কাছে অনেকটা ঋণী— নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীও একথা স্বীকার করেছেন।

ইংরেজরা কলকাতায় ব্যবসার নিমিত্তে এসে বসবাস শুরু করে। ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময় থেকেই এদেশে রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। লালবাজার অঞ্চলের 'প্লে হাউস' সম্ভবত ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত প্রথম রঙ্গালয়। এর প্রতিষ্ঠাকাল সঠিকভাবে না জানা গেলেও পলাশীর যুদ্ধের আগে যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়। এমনকি ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে এখানে প্রথম অভিনয়ও হয়েছিল। ইংলণ্ডে বিখ্যাত অভিনেতা গ্যারিকের আদর্শ এখানকার অভিনেতারা অনুসরণ করতেন। অভিনেতারা সকলেই ছিলেন অ্যামেচার শিল্পী। সিরাজদৌল্লার কলকাতা আক্রমণের সময় এটি ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর একে একে ক্যালকাটা থিয়েটার, মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার, হোয়েলার প্লেস থিয়েটার, এথেনিয়াম থিয়েটার, চৌরঙ্গী থিয়েটার, দমদম থিয়েটার, বৈঠকখানা থিয়েটার, সাঁ সুসি থিয়েটার— এরকম বেশ কিছু থিয়েটারের অভ্যুদয় ঘটে। আবির্ভাব ঘটে বহু স্মরণীয় শিল্পীর।

ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় নাট্যশালার নাম 'ক্যালকাটা থিয়েটার' বা 'দি নিউ প্লে হাউস'। প্রায় পাঁচ বিঘা জমির ওপরে লক্ষ টাকা ব্যয় করে জর্জ উইলিয়ামসন ১৭৭৫ সালে রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর পিছন দিকে এই নাট্যশালাটি গড়ে তোলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস, রিচার্ড বারওয়েল, স্যার ইলিজা ইম্পে, চেম্বার্স প্রমুখেরা এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ডেভিড গ্যারিকের পরামর্শে এই নাট্যালয়টিও সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়। এই নাট্যমঞ্চের টিকিটের মূল্য ছিল বেশি। ক্যাপ্টেন কল নামে এক ব্যক্তি এই মঞ্চে অভিনয় করে 'গ্যারিক অব দি ইস্ট' নামে অভিহিত হয়েছিলেন। মিসেস ব্রিস্টোর সময়ে ১৭৮৯ সালে প্রথম এই মঞ্চে স্ত্রী-লোকই অংশগ্রহণ করেন। এর দৃশ্যপট ছিল সুন্দর এবং অভিনেতাদের পোশাক

পরিচ্ছদও ছিল বেশ সাজানো-গোছানো। দৃশ্যপটে ও মঞ্চ সাজানোয় মুন্সীয়ানার ছাপ ছিল। অর্থাভাবে তেত্রিশ বছর পর এই নাট্যলয় বন্ধ হয়ে যায়।

ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত অনেকগুলো থিয়েটারের নাম পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই নাট্যশালাগুলোর মধ্যে 'ক্যালকাটা থিয়েটার', 'চৌরঙ্গী থিয়েটার' এবং 'সাঁ সুসি থিয়েটার' ছাড়া অন্যগুলো ছিল স্বল্পস্থায়ী। সেদিনের কলকাতার গণ্যমান্য বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তির চেষ্টায় ১৮১৩ সালের ২৫ শে নভেম্বর মহাসমারোহে চৌরঙ্গী থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক হোরেস হেম্যান উইলসন, ক্যাপ্টেন ডি. এল, রিচার্ডসন, হেনরী মেরেডিথ পার্কার, স্যার জে.পি.গ্রান্ট অনেকেই এই নাট্যশালার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অনেক উঁচুদরের শিল্পীর অভিনয় নৈপুণ্যে চৌরঙ্গী থিয়েটারের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। এই রঙ্গালয়ের একজন দরদী বন্ধু, প্রথম শ্রেণীর নাট্যসমালোচক ও অভিনেতা স্টোকলার তাঁর 'মেময়ার্স অফ এ জার্নালিস্ট' গ্রন্থে চৌরঙ্গী থিয়েটার সম্পর্কে বহু খবর রেখে গেছেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এই রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখানকার অভিনেতারা বেতন পেতেন। 'ক্যালকাটা গেজেট', 'জনবুল' প্রভৃতি সংবাদপত্রে এই মঞ্চের খবর থাকত। কোয়েলার, পার্কার, মিসেস এসথার লীচ প্রমুখেরা অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে ঋণের দায়ে এই রঙ্গালয় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের কাছে বিক্রি হয়ে যায়। তখন এর দৃশ্যপট, সাজসজ্জা ও অভিনয়ের উন্নতির চেষ্টা করা হলেও নানা কারণে ১৮৩৯ সালের ৩১ শে মে এই রঙ্গালয়টি অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয় এবং এই রঙ্গালয়ের অবসান ঘটে।

চৌরঙ্গী থিয়েটারের পর ১৮৩৯ সালের ২১ শে আগস্ট সাঁ সুসি থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়। স্টোকলারের প্রচেষ্টায় মিসেস লীচের যোগদানে এই রঙ্গালয়ে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। মঞ্চ, সাজঘর, প্রেক্ষাগৃহ সুন্দরভাবে নির্মিত হয়। প্রথম অভিনীত হয় 'You Can't Marry Your Grandmother'। এই নাট্যমঞ্চে অনেকগুলো নাটকের অভিনয় হয়। দর্শকদের বসার জায়গা খুব বেশি ছিল না। এখন যেখানে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ সেখানে সাঁ সুসির নিজস্ব বাড়ি ছিল। মিসেস লীচের মৃত্যুর পর এই নাট্যালয়ের পতন ঘনিয়ে আসে। এই রঙ্গালয়ের প্রথম একজন এদেশী অভিনেতা বৈষ্ণবচরণ আঢ্য অভিনয়ের সুযোগ পান। জানা যায় ওথেলোর ভূমিকায় অভিনয় করে আঢ্য খুব প্রশংসা অর্জন করেন, কিন্তু ঐ অভিনয়ের পর ১৮৪৯ সালে সাঁ সুসি বন্ধ হয়ে যায়।

কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত বিদেশী রঙ্গালয়গুলির মধ্যে বেশ কিছু রঙ্গালয় স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে ১৭৮৯ সালের ১ লা মে পুয়োর সোলজার নামক নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার-এর দ্বারোদঘাটিত হয়। মিসেস ব্রিস্টোর অভিনয়, দৃশ্যপট এবং অর্কেস্ট্রার কথাও উল্লেখ ছিল। মেয়েরা এই রঙ্গামঞ্চে পুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করে। এই রঙ্গামঞ্চ বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। ১৭৯৭ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি হোয়েলার প্লেস থিয়েটার নামে এক নতুন রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। অর্থাভাবে পরের বছরই এই রঙ্গালয় বন্ধ হয়ে যায়। ১৮১২ সালের ৩০ শে মার্চ এথেনিয়াম থিয়েটারের

দ্বারোদঘাটন হয়। কিন্তু এই রঙ্গালয়ের জীবনেও সুদিন না আসায় এই মঞ্চে যবনিকা পড়েছিল। কলকাতার উপকণ্ঠে গড়ে ওঠা দমদম থিয়েটার, ১৮২৪ সালে বৈঠকখানা থিয়েটারের নামও জানা যায়। তবে এসব থিয়েটার স্বল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল।

ইংরেজ পরিচালিত রঙ্গালয়গুলিতে টিকিট বিক্রি করে অভিনয় দেখার ব্যবস্থা ছিল। শিল্পীরা বেতন পেত। ইংরেজ শিল্পীদের কাছ থেকে এদেশীয় শিল্পীরা মঞ্চে চলাফেরা, দাঁড়ানো বা বসার ভঙ্গি, অঙ্গসঞ্চালন প্রভৃতিতে পারদর্শিতা অর্জন করে। চৌরঙ্গী ও সাঁ সুসি থিয়েটার থেকে বাঙালিরা নাট্যচর্চার প্রেরণা পায়। সাঁ সুসির পরে উনিশ শতকের শেষার্ধে সেন্ট থিয়েটার, থিয়েটার রয়্যাল, অপেরা হাউস, গ্যারিসন থিয়েটার নামক কয়েকটি স্বল্পকালীন রঙ্গালয় নাটক অভিনয়ের ধারা বজায় রেখেছিল। এবং এসব থেকে রঙ্গমঞ্চ সজ্জা, অভিনয় কৌশল বাঙালি রপ্ত করেছিল।

৮৯.৪ সারাংশ

বিদেশী রঙ্গালয় থেকে আমাদের দেশে থিয়েটারী অভিনয়ের সূচনা। ইংরেজদের অভিনয়ের উচ্ছ্বাস, তাদের ভাবধারা এখানকার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অনুকরণ করতে শুরু করে। ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত প্রথম রঙ্গালয় প্লে- হাউস পলাশীর যুদ্ধের আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানকার অভিনেতারা ছিলেন অ্যামেচার শিল্পী। এরপর একে একে এখানে অনেক থিয়েটার গড়ে ওঠে। ইলিজা ইম্পে প্রমুখের পৃষ্ঠপোষকতায় ডেভিড গ্যারিকের পরামর্শে 'ক্যালকাটা থিয়েটার' ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়। এই মঞ্চে প্রথম স্ত্রী চরিত্রে স্ত্রী অভিনেতা অভিনয় করে। ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত থিয়েটারগুলোর মধ্যে পরবর্তীকালে 'চৌরঙ্গী থিয়েটার' ও 'সাঁ সুসি থিয়েটার' ছাড়া অন্যগুলো বিশেষ চলে নি। এই থিয়েটারগুলো গণ্যমান্য কয়েকজন ব্যক্তির চেষ্টায়, বেশ কিছু শিল্পীর অভিনয় নৈপুণ্যে কিছুদিন ভালোভাবে চলেছিল। সাঁ সুসি থিয়েটারে মঞ্চ, সাজঘর, প্রেক্ষাগৃহ সুন্দরভাবে তৈরি হয়েছিল। এই রঙ্গালয়ে প্রথম এদেশী অভিনেতা বৈষ্ণবচরণ আঢ্য ওথেলার ভূমিকায় অভিনয় করে খুব প্রশংসা অর্জন করেন। ইংরেজ পরিচালিত রঙ্গালয়গুলিতে টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা ছিল। এই সমস্ত রঙ্গালয়গুলি থেকে বাঙালিরা অভিনয় কৌশল এবং নাট্যচর্চার প্রেরণা পায়।

৮৯.৫ অনুশীলনী ১

১। নীচের প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত প্রথম রঙ্গালয়—
১। দমদম থিয়েটার
২। প্লে হাউস
৩। ক্যালকাটা থিয়েটার

(খ) ক্যালকাটা থিয়েটারের অপর নাম— ১। চৌরঙ্গী থিয়েটার
২। এথেনিয়াম থিয়েটার
৩। দি নিউ প্লে-হাউস

(গ) চৌরঙ্গী থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় — ১। ১৮১৩ সালে
২। ১৮৩১ সালে
৩। ১৮৩৩ সালে

২। যথাযথ শব্দ বসিয়ে বাক্য সম্পূর্ণ করুন।

(ক) বাংলা নাট্যশালা —— রঙ্গালয়ের কাছে অনেকটা ঋণী।

(খ) দ্বারকানাথ ঠাকুর —— থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

(গ) বৈষ্ণবচরণ আঢ্য —— ভূমিকায় অভিনয় করেন।

(ঘ) কলকাতার উপকণ্ঠে গড়ে ওঠে ——

৮৯.৬ মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) কোলকাতায় বাংলা নাট্য অভিনয়ের সূচনা ঃ লেবেডফ, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মঞ্চ

কোলকাতায় বাংলা নাট্যাভিনয়ের সূচনা করেন রুশ দেশীয় একজন জ্ঞানতাপস গেরাসিম স্টেপানোভিচ লেবেডফ। তিনি বাংলার অভিনয় জগতে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনেন। কলকাতায় নাট্যশালা নির্মাণ করে বাংলা নাটকের অভিনয় করানোর কৃতিত্ব তিনি দাবি করতে পারেন। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'বেঙ্গালী থিয়েটার' নামে একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে এম জডরেলের লেখা 'The Disguise' নাটকের বাংলা অনুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল' তিনি তাঁর নির্মিত মঞ্চে পর পর দুবার অভিনয় করিয়েছিলেন। প্রথমবার ১৭৯৫ সালের ২৭ শে নভেম্বর এবং দ্বিতীয়বার ১৭৯৬ সালের ৩ রা মার্চ। তাঁর শিক্ষক গোলোকনাথ দাসের সাহায্য নিয়ে তিনি 'The Disguise' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেন। লেবেডফ একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। কলকাতায় ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা থিয়েটার'-এর দৃশ্যপট ও অভিনয় দেখে এবং ইংরেজ অভিনেত্রী ব্রিস্টোর নাচ-গান দেখে ও শুনে তাঁর একটি বাঙালি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা হয়। তিন মাসের মধ্যেই নিজেই নকশা করে বিলাতি রঙ্গামঞ্চের মত করে তিনি নাট্যশালাটি তৈরি করেন।

'কাল্পনিক সংবদল' নাটকটি অভিনয়ের সময় সেটিকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য তার মধ্যে 'বিদ্যসুন্দর' থেকে কিছু গান যুক্ত করা হয়। নাটকে বাঙালি ভাব সঞ্চারিত হয়। বাঙালি অভিনেতা ও

অভিনেত্রী সংগৃহীত হয় নাটকের জন্য। বঙ্গীয় রীতিতে মঞ্চসজ্জা, কণ্ঠ যন্ত্রসঙ্গীতে ভারতীয় ভাবধারা অনুসরণ করা হয়। বেহালাবাদক লেবেডফের পক্ষে এগুলো সহজসাধ্য হয়েছিল। এদেশীয় দর্শকদের চাহিদা অনুসারে তিনি নাটকে গান, বাজনা ও নানারকম দৃশ্যের অবতারণা করেছিলেন। এমনকি নাট্যাভিনয়কে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য নাটকের 'বাজিয়্যার' বাজনার ব্যবস্থা ছিল। অভিনয়ের চরিত্রগুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের পোষাক-পরিচ্ছদের দিকে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন।

লেবেডফের থিয়েটারে স্ত্রী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য অভিনেত্রীদের আগমন অবশ্যই তখনকার দিনের অভিনয়ের একটি আকর্ষণীয় দিক। অভিনেতারা সমাজের সাধারণ স্তর থেকে এলেও অভিনেত্রীরা খিদিরপুরের ডক অঞ্চলের বারাঙ্গানা পল্লী থেকে সংগৃহীত। তবে অনুমান করা হয় যাত্রা-রসিক গোলাকনাথ দাস অভিনেত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঝুমুর গান, সারিগান এবং কীর্তন গান গাইয়েদের গুরুত্ব দিতেন। লেবেডফের সময় কলকাতায় ধনী বা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রভাব ততটা চোখে পড়ত না। ফলে সমাজের সাধারণ স্তরের লোকেরা একটু নিকৃষ্ট মানের নাচ গানে মেতে থাকত। আবার যারা লেবেডফের নাট্যশালার অভিনয়ের দর্শক ছিলেন তারা বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্পর্কে খুব বেশি সচেতন ছিলেন না। এই রঙ্গমঞ্চে টিকিটের মূল্যও বেশি ছিল। তবে ইংরেজদের রঙ্গালয়ের টিকিট মূল্যের চেয়ে কম হওয়ায় ইংরেজ সাহেবরা এখানে ভিড় জমাত।

লেবেডফের রঙ্গমঞ্চের অভিনয় সাফল্য এবং জনপ্রিয়তা ইংরেজি থিয়েটার কর্তৃপক্ষের কাছে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে। ফলে তারা নানাভাবে তাঁর ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করেন। কিন্তু এদেশীয় লোকেরা কৌতুকপূর্ণ বিষয় বেশি পছন্দ করতেন বলে লেবেডফও সেই রুচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চেয়েছিলেন। তাঁর জন্যই বাংলা নাট্যশালায় নাচ ও গান প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশের যাত্রাশিল্পে দৃশ্যবিভাগ ও গর্ভাঙ্ক রচনার ব্যাপারেও লেবেডফের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। বাংলার রঙ্গামঞ্চ পাশ্চাত্য ভাবধারায় গড়ে উঠলেও তা জাতীয় বৈশিষ্ট্যে সমুন্নত হয়েছিল লেবেডফের বাস্তবজ্ঞান ও নিষ্ঠায়। সেজন্য লেবেডফের কাছে বাঙালি নাট্যপিপাসুদের ঋণ অপরিসীম।

ইংরেজদের চক্রান্তে লেবেডফের থিয়েটার ধ্বংস হলে উনিশ শতকের প্রথমে বাংলার রঙ্গালয়ে অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়। অবশ্য এই সময়ে যাত্রা, পাঁচালি কবিগান, হাফ আখড়াই জাতীয় কিছু মাধ্যম বাঙালি জনমানসের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে রঙ্গামঞ্চের সংকট প্রশমনের জন্য ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর নারকেলডাঙার বাগানবাড়িতে একটি নাট্যশালা তৈরি করেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত এই থিয়েটারের নাম 'হিন্দু থিয়েটার'। আবার হিন্দু কলেজ প্রতিষ্টার পর থেকে বাঙালি ইংরেজি নাটকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় তারা যাত্রা-পাঁচালির পরিবর্তে মঞ্চে অভিনয়ের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। এদের মধ্যে কেউ কেউ নাট্যশালা গড়ে তুলতে চাইল। সেই সুত্রে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের আবির্ভাব তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি রঙ্গামঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। বাঙালি সমাজে বিদ্যা-

বুদ্ধিতে তিনি আদর্শস্থানীয় ব্যক্তি। হিন্দু থিয়েটার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর তখনকার দিনের নাট্যামোদী শ্রীকৃষেণ সিং, কিষেণ দত্ত, গঙ্গাচরণ সেন, মাধবচন্দ্র মল্লিক তরাচাঁদ চক্রবর্তী, হরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখদের সাহায্য পেয়েছিলেন।

'হিন্দু থিয়েটার' বাঙালি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হলেও এখানে প্রথম ইংরেজি নাটকের অভিনয় হয়। শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সীজার' নাটকের পঞ্চম অঙ্ক এবং পরে ভবভুতির 'উত্তর রামচরিত'-এর প্রথম অঙ্ক অভিনীত হয়। স্যার এডোয়ার্ড রায়ান, কর্নেল ইয়ং, রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সেদিন দর্শকরুপে উপস্থিত ছিলেন। ১৮৩২ সালের ২৯ শে মার্চ এখানে বহু সম্ভান্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে 'নাথিং সুপারফ্লুয়াস' (Nothing Superflous) নামে একটি ছোট প্রহসনের অভিনয় হয়। এই অভিনয়ের খুব প্রশংসা হয়েছিল। এখানকার পাত্র-পাত্রীর বেশভূষা ও অভিনয় ছিল চমৎকার এবং দৃশ্যপট ইত্যাদি রুচিসম্মত হয়েছিল। তবে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় নি। তাই খুব তাড়াতাড়ি এই থিয়েটার উঠে যায়।

৮৯.৭ সারাংশ

বাংলা নাট্যাভিনয়ে গেরাসিম লেবেডফের অবদান স্মরণযোগ্য। তিনি 'বেঙ্গালী থিয়েটার' নামে একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। এম জডরেলের 'কাল্পনিক সংবদল' তাঁর তৈরি মঞ্চে পর পর দুবার অভিনীত হয়। সঙ্গীতজ্ঞ লেবেডফ নিজের শিক্ষক গোলোকনাথ দাসের সাহায্য নিয়ে, ক্যালকাটা থিয়েটারের অভিনয় দেখে, মিসেস ব্রিস্টোর নাচ দেখে বাঙালি নাট্যশালা তৈরি করেন। বাঙালি ভাবধারা সমন্বিত এই নাটকে বাঙালি দর্শকদের চাহিদা অনুসারে তিনি গান, বাজনা, মঞ্চসজ্জা, যন্ত্রসঙ্গীত এমনকি অভিনেতা-অভিনেত্রী ব্যবহারের ব্যবস্থাও করেছিলেন। লেবেডফের থিয়েটারে অভিনেত্রীদের আগমন ছিল উল্লেখযোগ্য বিষয়। এখানে সাধারণ সম্প্রদায়ের মানুষদের ভিড় ছিল বেশি। ফলে বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতনতার অভাব ছিল। লেবেডফের রঙ্গামঞ্চের সাফল্য ইংরেজদের দুশ্চিন্তার কারণ হওয়ায় তারা এই থিয়েটারের ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করে, কিন্তু লেবেডফ এদেশীয় মানুষের রুচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলায় তা সংঘটিত হতে কিছুটা দেরী হয়েছিল।

ইংরেজরা চক্রান্ত করে লেবেডফের থিয়েটার ধ্বংস করলে বাংলা রঙ্গালয়ে অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়। এই সংকট প্রশমনের জন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১৮৩১ সালে 'হিন্দু থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন। বাঙালিরাও মঞ্চে অভিনয় দেখা এবং অভিনয় করার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল। প্রসন্নকুমার সেই ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে কিছু নাট্যামোদী ব্যক্তির সাহায্যে সখের নাট্যশালা গড়ে তুললেন। শেকস্‌পীয়রের 'জুলিয়াস সীজার' নাটকের অভিনয় দিয়ে এই নাট্যশালার যাত্রা শুরু। বেশ কিছু সম্ভান্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে এই নাট্যশালা রুচিসম্মত অভিনয় বজায় রাখলেও হিন্দু থিয়েটার সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় নি।

৮৯.৮ অনুশীলনী ২

১। শূন্যস্থাগুলি যথার্থ শব্দযোগে পূরণ করুন।

(ক) লেবেডফ একজন —— ছিলেন।

(খ) অভিনেত্রীরা —— ডক অঞ্চল থেকে আসত।

(গ) ইংরেজরা লেবেডফের নাট্যশালার —— চেষ্টা করে।

২। নিচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) 'The Disguise' নাটকের বাংলা অনুবাদ করেন — (১) জডরেল
(২) গোলোকনাথ দাস
(৩) লেবেডফ

(খ) লেবেডফের সময় নাটক দেখত— (১) ধনী
(২) শিক্ষিত
(৩) সাধারণ মানুষ

(গ) প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালা— (১) বেঙ্গলী থিয়েটার
(২) হিন্দু থিয়েটার
(৩) বঙ্গীয় নাট্যশালা

৮৯.৯ মূলপাঠ (তৃতীয় অংশ) শ্যামবাজার নবীন বসু ও বেলগাছিয়া নাট্যশালার নাট্যাভিনয়

তখনকার দিনে বিত্তবান ব্যক্তিরা নিছক আমোদ উপভোগ করার জন্য থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করতেন। সাধারণ মানুষের জন্য থিয়েটার তৈরি কিংবা অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল না। স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের পরিবর্তে বাড়ির উঠান, নাটমন্দিরে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হত। এরকম ভাবেই উত্তর কলকাতার শ্যামবাজারের বাসিন্দা তৎকালীন কলকাতার বিত্তশালী ব্যক্তি নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে ১৮৩৩ সালে একটি নাট্যশালা গড়ে ওঠে। নবীনচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত এই থিয়েটার শ্যামবাজার থিয়েটার নামে পরিচিত। ১৮৩৫ সালের ২২শে অক্টোবর হিন্দু কলেজের ছাত্রদের পরিচালিত 'হিন্দু পাইয়োনীয়ব পাত্রিকা থেকে জানা যায় ১৮৩৩

সালে এই থিয়েটারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে শ্যামবাজার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা কাল নিয়ে বিতর্ক থাকলেও 'হিন্দু পাইয়োনীয়র' পত্রিকার সিদ্ধান্ত আমাদের কিছুটা সন্দেহ মুক্ত করে।

বাংলা ভাষায় হিন্দুদের দ্বারা অভিনীত এই থিয়েটারটিকে স্বদেশী থিয়েটার নামে অভিহিত করা হত। এখানে বছরে চার/পাঁচটি করে নাটক অভিনীত হত। এখানকার অভিনয় পদ্ধতি সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জানা যায়। এই থিয়েটারের জন্মলগ্ন থেকেই নারী অভিনেত্রী নিয়োগ করা হয়েছিল। এই থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য দৃশ্যপট নির্মাণ ছাড়াও দৃশ্যাঙ্কনের ব্যবস্থা ছিল। এখানে বাংলা নাটক অভিনয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

'হিন্দু পাইয়োনীয়র' নামক পত্রিকা থেকে জানা যায় যে ১৮৩৫ সালের ৬ই অক্টোবর ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের প্রথম অভিনয়ের মাধ্যমে শ্যামবাজার থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। ৬ই অক্টোবরের পূর্ণিমা রাত্রিতে ১২টার সময় 'বিদ্যাসুন্দর'-এর অভিনয় শুরু হয় এবং পরের দিন সকাল সাড়ে ৬টা পর্যন্ত চলে। স্বদেশী বিদেশী মিলিয়ে প্রায় হাজার মানুষ এখানে অভিনয় দেখে। সেতার, সারেঙ্গী, পাখোয়াজ, বেহালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল। আলোর কৌশলে স্টেজে ঝড়-বিদ্যুৎ দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মঞ্চে পর্দার ব্যবহার ছিল। পর্দা অর্থাৎ যবনিকা তোলার আগে স্তোত্রপাঠের ব্যবস্থা ছিল। তবে মেঘ, জল জাতীয় পশ্চাৎপট চিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ প্রকাশ পায় নি। বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় পদ্ধতিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রীতির প্রয়োগ চোখে পড়ে. কাহিনীটি ছিল লোকপ্রিয়। নবীন বসুর প্রাসাদ ও উদ্যান জুড়ে এর অভিনয় হয়েছিল। কৃত্রিম দৃশ্যপট ছাড়াও নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ির কাছাকাছি থাকা পুকুর ও বাগানের গাছ ইত্যাদি দৃশ্যরুপে ব্যবহৃত হয়েছিল। পুরুষ অভিনেতা অপেক্ষা স্ত্রী অভিনেত্রীদের অভিনয় মনোজ্ঞ হয়েছিল এবং দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছিল। সুন্দরের ভূমিকায় শ্যামাচরণ, দিব্যার ভূমিকায় রাধামণি, রানী ও মালিনীর ভূমিকায় জয়দুর্গার অভিনয় অনেকের ভালো লেগেছিল। নাট্যকার নিজেই 'কালুয়া'র ভূমিকায় অভিনয় করে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। নাটকের মধ্যে নাট্যকার সমাজ সংস্কার ও নারী প্রগতির কথা উল্লেখ করেছেন।

শ্যামবাজার থিয়েটার নামক মঞ্চটি তৈরি করতে নবীনচন্দ্র বসু দুই লাখের বেশি টাকা ব্যয় করেছিলেন। এই থিয়েটারে বাংলার প্রথম নাট্যাভিনয় অভিনীত হয়। তবুও এই থিয়েটার চার/পাঁচ বছরের বেশি স্থায়ী হয়নি। বাংলা নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে এই থিয়েটারের ভূমিকা উল্লেখযোগ। প্রথম বাঙালি প্রতিষ্ঠিত এই থিয়েটার সমকালীন শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত জনসমাজে খুবই উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল।

রঙ্গমঞ্চকে কেন্দ্র করে বাংলা নাটক রচনার ক্ষেত্রে একটা নবজীবন সঞ্চারিত হয়েছিল যেমন,তেমনি সখের নাট্যশালারও বিকাশ ঘটতে শুরু করে। 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা' এরকম একটি সৌখিন নাট্যশালা।

বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে এই নাট্যশালাটি তৈরি করা হয়েছিল। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের বাগানবাড়িতে মহারাজ যতীনমোহন ঠাকুরের পরামর্শে এই রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা। ১৮৫৮ সালের ৩১শে জুলাই এর দ্বারোদঘাটন হয়। এই মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয় রামনারায়ণ তর্করত্ন অনুদিত শ্রহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটক। সে যুগের ইংরেজি শিক্ষিত ও নব্যশিক্ষিত অনেক বাঙালি এই মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মধুসূদন দত্তের সহপাঠী গৌরদাস বসাকের 'স্মৃতিকথা' ছাড়াও তৎকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে এ জাতীয় অনেক তথ্য জানা যায়।

এই নাট্যশালার মঞ্চসজ্জা, গীতবাদ্য এবং অভিনয় খুব উচ্চমানের ছিল। গ্যাসের আলোয় পাদপ্রদীপ আলোকিত করা হয়েছিল। লাইমলাইটের সাহায্যে একটা বিশেষ মোহময় পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল। এখানেই প্রথম ঐকতানবাদন প্রবর্তিত হয়। ইংরেজ শিল্পীরা মঞ্চের দৃশ্যপট অঙ্কন করেছিলেন। জানা যায় সিংহ ভ্রাতারা এর জন্য দশ হাজার টাকা খরচ করেছিলেন। বিদূষক-এর ভূমিকায় কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখার জন্য দেশী-বিদেশী অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। ছোট্টলাট স্যার পেডারিক হ্যালিডে, বিদ্যাসাগর, প্যারিচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, মধূসূদন দত্ত প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অভিনয় দেখার জন্য মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজি অনুবাদের দায়িত্ব বর্তায় মধুসূদন দত্তের ওপর। এই জন্যেই বেলগাছিয়া নাট্যশালার সঙ্গে মধুসূদনের সংযোগ গড়ে ওঠে। 'হিন্দু প্রেট্রিয়ট' পত্রিকা থেকে জানা যায় 'রত্নাবলী' নাটকের প্রথম অভিনয়ে গীতবাদ্য, আলো, সাজসজ্জা খুব প্রশংসনীয় হয়েছিল। সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাতে প্রশংসা করে এর বিবরণ প্রকাশিত হয়। 'রত্নাবলীর' নাটক বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ছয় /সাত বার অভিনীত হয়।

এখান থেকেই মধুসূদন দত্ত বাংলা নাটকের অভাব অনুভব করে নাটক লিখবেন মনস্থ করেন। সেই অভিলাষেই রচিত হয় 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। এই নাটকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন ঘটে। প্লট রচনা, চরিত্র চিত্রণ এবং সংলাপ প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই নাটক বাংলা নাট্যজগতে যুগান্তর সৃষ্টি করে। ১৮৫৯ সালের ৩ রা সেপ্টেম্বর 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা'য় 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। ২৭শে সেপ্টেমবর ষষ্ঠ এবং শেষ অভিনয় হয়। মাত্র পঁচিশ দিনের মধ্যে ছয়বার অভিনয় হওয়ায় এই নাটকের জনপ্রিয়তা কতটা ছিল তা বোঝা যায়। শর্মিষ্ঠার পর আর কোনো নাটক এই নাট্যশালায় অভিনীত হয়নি। ১৮৬১ সালের ২৯শে মার্চ রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অকাল মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বেলগাছিয়া নাট্যশালার উজ্জ্বল-দীপ নির্বাপিত হয়। তবুও অল্প সময়ের মধ্যে এই নাট্যশালা যেভাবে দর্শকদের উৎসাহিত করেছিল তা প্রশংসা করার মতো। বাঙালির নাট্যচিন্তার ক্ষেত্রে এই রঙ্গামঞ্চের অবদান কম নয়।

৮৯.১০ মূলপাঠ (চতুর্থ অংশ) জোড়াসাঁকো, পাথুরেঘাটা ও নবকৃষ্মদেবের শোভাবাজার নাট্যশালার নাট্যাভিনয়

ঠাকুরবাড়িতে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নাটক নাট্যশালা ও নাট্যাভিনয়ের প্রতিও বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তার প্রমাণ স্বরুপ, 'জোড়াসাঁকো নাট্যশালার নাম উল্লেখ করা যায়। এটি সখের নাট্যশালাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার মূলে গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সাবদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ তৎকালীন কয়েকজন নাট্যামোদী ব্যক্তি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। জানা যায় গোপাল উড়ে নামক একজনের যাত্রা দেখে উপরিউক্ত ব্যক্তিরা এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করেন। তার জন্য অভিনেতা এবং নাট্যবিশেষজ্ঞ কৃষ্মবিহারী সেনের নেতৃত্বে পাঁচজনের একটি কমিটিও গঠিত হয়। এই কমিটিতে কৃষ্মবিহারী সেন ছাড়াও ছিলেন গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। নাট্যশিক্ষক হিসাবে নির্বাচিত হন কৃষ্মবিহারী সেন।

জোড়সাঁকো নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা 'কৃষ্মকুমারী' নাটক। এই নাটকের অভিনয় তারিখ নিয়ে কিছু বিতর্ক থাকলেও শেষ পর্যন্ত ১৮৬৭ সালের ৫ই জানুয়ারী তারিখটিকে গ্রহণ করা হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কৃষ্মকুমারী' নাটকে কৃষ্মকুমারীর মা অহল্যাবাঈ-এর ভূমিকায় অভিনয় করেন। এর পরেই মধুসূদনের আর একটি প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা-র অভিনয়ও এখানে অনুষ্ঠিত হয়। তবে এখানকার কর্তাব্যক্তিরা লোকশিক্ষামূলক নাটকের অভাব অনুভব করতে থাকেন। ফলে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর প্রধান শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দীর পরামর্শ নিয়ে সমাজ সমস্যা বিষয়ক নতুন ধরনের নাটক লেখার কথা ভাবেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৬৫ সালের জুন মাসে 'Indian Daily News' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে সমাজ বিষয়ক উৎকৃষ্ট নাটক আহ্বান করা হয় এবং তার জন্য পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়। নাটকের বিষয় ছিল 'বহু-বিবাহ'। রামনারায়ণ তর্করত্ন এই নাটক লেখার সম্মতি দেওয়ায় আগের বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করে নতুন করে দুটো বিষয়ে নাটক লেখার জন্য আবার বিজ্ঞাপন দেন। এবারের বিষয় (১) হিন্দু মহিলাদের দুরবস্থা এবং (২) পল্লীগ্রামের জমিদারদের অত্যাচার।

নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন বহু-বিবাহ বিষয়ে 'নবনাটক' নামে একখানি নাটক রচনা করেন। এজন্য ১৮৬৬ সালের ৬ ই মে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে প্যারীচাঁদ মিত্রের সভাপতিত্বে এক অনুষ্ঠানে রামনারায়ণ তর্করত্নকে একটি রৌপ্যাধারে করে দুইশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৮৬৭ সালের ৫ই জানুয়ারী নবনাটকের প্রথম অভিনয় অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। 'The National paper' ১৮৬৭সালের ৯ই জানুয়ারী এবং 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা ১৮৬৭ সালের ২৮শে জানুয়ারী

'নবনাটক'-এর অভিনয় সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। ফলে অল্প সময়ের ব্যবধানে নবনাটক আরও নয় বার অভিনীত হয়েছিল। নবনাটক অভিনয়ের পর এই নাট্যশালা বন্ধ হয়ে যায়।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় অভিনীত নাটকগুলোতে নানারকম মঞ্চোপকরণ ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। স্টেজ বাঁধা, দক্ষ পটুয়াদের দিয়ে দৃশ্যপট আঁকানো বিবিধ যন্ত্রের ব্যবহার, কনসার্টের ব্যবস্থা ছিল। মঞ্চে বিভিন্ন দৃশ্য প্রায় জীবন্ত ও বাস্তবসম্মত করার চেষ্টা করা হত। আলোকসম্পাতে নৈপুণ্য দেখানো হয়েছে। এই নাট্যমঞ্চ গতানুগতিক ছিল না। দৃশ্যাঙ্কন ও সুরসৃষ্টিতে দেশীয় ভাবধারাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে জোড়াসাঁকো নাট্যশালা আধুনিক থিয়েটারের প্রস্তুতিতে অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

সখের থিয়েটারের বিকাশ পর্ব প্রতিষ্ঠিত আরও একটি উল্লেখযোগ্য নাট্যশালার নাম পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়। এই রঙ্গালয় প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। কিন্তু তারও আগে যতীন্দ্রমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরগোষ্ঠীর আদি বাড়িতে থাকা রঙ্গামঞ্চে কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের বাংলা ভাবানুবাদের অভিনয়ের মাধ্যমে ১৮৫৯ সালে এই থিয়েটারের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। ১৮৬০ সালের ৭ই জুলাই এই নাটকের দ্বিতীয় এবং শেষ অভিনয় হয়েছিল এই মঞ্চে।

পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়ের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। বেলগাছিয়া নাট্যশালা বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং পারিবারিক পরিমণ্ডল তাঁকে এ কাজে অগ্রণী করেছিল। ১৮৬৫ সালের ৩০শে ডিসেম্বর যতীন্দ্রমোহন তাঁর নিজের বাড়িতে নিজের লেখা 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই নাট্যালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। ভারতচন্দ্রের কাহিনীর অবান্তর ও অশোভন অংশ বর্জন করে এই নাটকের সুসংহত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ঘনশ্যাম বসু এই নাট্যশালার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। বিদ্যাসুন্দরের প্রথম অভিনয় সম্পর্কে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা ১৮৬০ সালের ২৩শে জুলাই কিছু বিবরণ দিয়ে থাকে। তা থেকে জানা যায় এখানে দুশোর বেশি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়ে বাদ্যসঙ্গীত খুব আকর্ষণীয় হয়েছিল। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং সৌরীন্দ্রমোহন যথাক্রমে বিদূষক ও কুঞ্চকীর ভূমিকায় প্রশংসনীয় অভিনয় করেছিলেন। প্রথম রজনীতে বিদ্যাসুন্দরের পর একই সঙ্গে রামনারায়ণ তর্করত্নের লেখা 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' প্রহসনটিও অভিনীত হয়েছিল। ১৮৬৬ সালের ৬ই জানুয়ারী বিদ্যাসুন্দর দ্বিতীয়বার অভিনয় হয়। 'বেঙ্গালী' পত্রিকার ১৮৬৬, ১৩ই জানুয়ারী সংখ্যা থেকে জানা যায় বিদ্যাসুন্দরের দ্বিতীয় অভিনয়ের সময় সেখানে রেওয়ার মহারাজা উপস্থিত ছিলেন। তিনি অভিনেতাদের অভিনয়ে সন্তুষ্ট হয়ে প্রত্যেককে তিন হাজার করে টাকা এবং একটি করে কাশ্মীরি শাল উপহার দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উচ্চবংশোদ্ভূত অভিনেতারা আত্মমর্যাদার জন্য তা গ্রহণ করতে চাননি। বিদ্যাসুন্দর দ্বিতীয় অভিনয়ের পর স্ত্রী চরিত্রের ভূমিকায় স্ত্রী অভিনেত্রীর

প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। বিদ্যাসুন্দর এবং যেমন কর্ম তেমনি ফল এই নাট্যালয়ে প্রায় দশবার অভিনীত হয়েছিল।

১৮৬৬ সালে 'বুঝলে কি না' প্রহসনটির অভিনয় হয়। এই প্রহসনের দৃশ্যপট, অভিনয় এবং সঙ্গীত পরিচালনা দর্শকদের তৃপ্ত করেছিল। রামনারায়ণ তর্করত্নের অনুদিত 'মালতীমাধব' নাটক ১৯৬৯-এ এখানে অভিনীত হয়। নাটকটি পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়ে দশ-বারো বার অভিনীত হয় বলে জানা যায়। রামনারায়ন তর্করত্নের অনেকগুলো নাটক ও প্রহসন এই রঙ্গামঞ্চে অভিনীত হয়। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক 'চক্ষুদান' ও 'উভয়সংকট' নামক প্রহসন ১৮৭০ সালের প্রথম দিকে অভিনীত হয়েছিল। তারপর একবছর বাদে ১৮৭২ সালের ১৩ই জানুয়ারী রামনারায়ণের 'রুক্মিণীহরণ' ও 'উভয়সংকট' নামক পৌরাণিক নাটক অভিনীত হয়। 'রুক্মিণীহরণ' নাটকটি এই নাট্যালয়ে দশ-এগারো বার অভিনীত হয়েছিল বলে স্বয়ং নাট্যকার অভিমত প্রকাশ করেছেন। ১৮৭৩ সালের পর এই নাট্যশালা কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকে। ১৮৮১ সালে পুনরায় সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের লেখা 'রসাবিষ্কারকবৃন্দ' নামক দৃশ্যকাব্য এখানে অভিনীত হয়।

পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গানাট্যালয় দীর্ঘস্থায়ী রঙ্গামঞ্চ। এই মঞ্চে দীর্ঘদিন ধরে নানা ধরনের নাটকের অভিনয় চলেছিল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা এই নাট্যালয়কে জাতীয় নাট্যালয় আখ্যা দিয়েছিল।

উত্তর কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়িতে 'শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি' নামে একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৪৪ সালে এখানে প্রথম ইংরেজি নাটক অভিনীত হলেও দীর্ঘ কুড়ি বছর আর কোনো নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা হয়নি। ১৮৬৫ সালের ১৮ই জুলাই মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' অভিনয়ের মাধ্যমে এখানে বাংলা নাট্যাভিনয় শুরু হয়। শোভাবাজর রাজবাড়ির রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা দেবীকৃষ্ম দেববাহাদুরের বাড়িতেই প্রথমবার 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনের অভিনয় হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা থেকে জানা যায় ভালো নাটক দেখানোর জন্য কয়েকজন রাজকুমারের বিশেষ উদ্যোগে এই নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা। মধুসূদনের এই প্রহসনটি দ্বিতীয়বার এই নাট্যশালায় অভিনীত হয় ২৯শে জুলাই ১৮৬৫। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় এই নাটকের প্রভুত প্রশংসার বিবরণ পাওয়া যায়। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা থেকেও এই নাটকের অভিনয় সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

জানা যায় কালীপ্রসন্ন সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ বেশ কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই নাটকের অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। এ নাটকে ঊনত্রিশ জন অভিনেতা অংশগ্রহণ করেছিলেন। নববাবু ও নর্তকীদ্বয়ের অভিনয়ের স্বাভাবিকতা ছিল। রঙ্গাভূমিতে নট-নটীর আগমন ও তাদের কণ্ঠের গান সকলের ভালো লেগেছিল। অন্তঃপুরের ললনাদের তাসখেলা, পরিজনদের অনুশোচনা—এসবই ছিল স্বাভাবিক। নাট্যশালার উদ্যোক্তাদের মধ্যে চন্দ্রকালী ঘোষের প্রস্তাবে এই থিয়েটারের সংক্ষিপ্ত নাম হয় 'শোভাবাজর নাট্যশালা'।

১৮৬৭ সালের ৮ই ফ্রেব্রুয়ারী শোভাবাজর নাট্যশালায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের ঐতিহাসিক বিয়োগান্তক নাটক 'কৃষ্মকুমারী' অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে অভিনীত হয়। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা 'কৃষ্মকুমারী'র অভিনয়ের গঠনমূলক আলোচনা করে। এই নাটক সকলকে আনন্দ দান করে। এই নাট্যদলের অভিনেতাদের অভিনয় দক্ষতা ছিল অসাধারণ। বঙ্গ রঙ্গামঞ্চের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব গিরিশচন্দ্র ঘোষ শোভাবাজার নাট্যশালায় কৃষ্মকুমারীর অভিনয় দেখেছিলেন। ১৮৬৭ সালের অভিনয়ের পর এই নাট্যশালা বন্ধ হয়ে গেলেও বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে শোভাবাজার নাট্যশালা নিঃসন্দেহে প্রশংসা পাবার যোগ্য।

৮৯.১১ মূলপাঠ (পঞ্চম অংশ) বাগবাজার-শ্যামবাজার নাট্যসমাজ ও সাধারণ রঙ্গামঞ্চ, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রভৃতি

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পর থেকে বাংলায় সখের নাট্যশালার উদ্ভব। বাগবাজারের নাট্যশালাটি সখের নাট্যশালার পরিণতি পর্বের উল্লেখযোগ্য নাট্যশালা। এই নাট্যশালা সাধারণ নাট্যশালার জনক। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে বাগবাজার অঞ্চলের কয়েকজন আগ্রহী যুবক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মদাস সুর, রাধামাধব কর, মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণচন্দ্র হালদার, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী প্রমুখেরা মিলিত হয়ে একটি যাত্রার দল গঠন করেন। আর্থিক অসঙ্গতির জন্য তাঁর প্রথম মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা'কে বেছে নিয়ে যাত্রা করেন। পরে থিয়েটার করার প্রবল ইচ্ছায় দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার' একদশী' নাটক মঞ্চস্থ করেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এর অভিনেতা ছিলেন। বাগবাজারের প্রাণকৃষ্ম হালদারের বাড়িতে ১৮৬৮সালের দুর্গাপূজার দিনে এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়।

এভাবেই গড়ে ওঠে 'বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার'। বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নাট্যশিক্ষক ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 'সধবার একাদশী' এখানে সাতবার অভিনীত হয়। নিমচাঁদের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অটলের ভূমিকায় নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ঘটিরাম ডেপুটির ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী অভিনয় করেছিলেন। সধবার একাদশীর চতুর্থ অভিনয়ের রাত্রিতে স্বয়ং নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র উপস্থিত ছিলেন। এখানে নিমচাঁদের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের অভিনয় এবং জীবনচন্দ্রের ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীর অভিনয় খুব প্রশংসা পেয়েছিল. স্বয়ং নাট্যকার অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে তারদ্বারা প্রভাবিত হয়ে নাটকের বাস্তবসম্মত পরিবর্তনে সম্মত হয়ে অর্ধেন্দুকে বলেছিলেন 'আমি এবার সধবার একাদশীর নূতন সংস্করণে অটলকে লাথি মারিয়া গমন লিখিয়া দিব।" এই নাটকের শেষ অভিনয় হয়েছিল চোরাবাগানে লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের বাড়িতে দুর্গাপূজার সময়। এই নাটক জনমানসে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল।

'সধবার একাদশীর শেষ অভিনয়ের দিনে একই সঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'

প্রহসনখানি অভিনীত হয়েছিল। তারপর প্রায় কিছুদিন এই থিয়েটারে কোনো নাটকের অভিনয় হয় নি। একবছর পর অভিনীত হয় দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' নাটক। নানা কারণে এই নাটকের অভিনয়ের সময় বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারের নাম হয় 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ'। ১৮৭২সালের ১১ই মে শ্যামবাজারে রাজেন্দ্রলাল পালের বহির্বাটিতে অস্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ করে 'লীলাবতী' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। সকলে এই নাটকের অভিনয়ের প্রশংসা করেন। বিশেষ করে ধর্মদাস সুরের দৃশ্যপট অঙ্কন ও মঞ্চ নির্মাণ বিশেষ প্রশংসিত হয়েছিল। এখানকার সুরসৃষ্টিও দর্শকদের মুগ্ধতার কারণ হিসেবে ধরা যায়। পরপর কয়েক শনিবারের অভিনয় সত্ত্বেও দর্শকদের চাহিদা ছিল। আসলে এঁদের অভিনয় ছিল উচ্চাঙ্গের।

১৮৩৩ সাল থেকে প্রায় চার দশক ধরে সখের থিয়েটার পর্ব চলে। এই পর্বে প্রতিষ্ঠিত সৌখিন থিয়েটারগুলি সাধারণত অভিজাত সম্প্রদায়ের ইচ্ছায় গড়ে ওঠে। অল্পবিস্তর স্কুল-কলেজকে আশ্রয় করেও গড়ে ওঠে। উচ্চবিত্তরা ছাড়া সাধারণ মানুষ এই জাতীয় নাটক দেখার সুযোগ পেতেন না। ফলে সাধারণ মানুষের অভিনয় দেখার জন্য সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রয়োজন অনুভূত হয়। তাছাড়া ইতিমধ্যে বেশকিছু জনপ্রিয় নাটকের অভিনয়ের প্রচার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে. সাধারণ মানুষ এসবের অভিনয় দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়ে। মঞ্চ চালনা, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে থিয়েটারকে পেশাদারী করাও জরুরী হয়ে পড়েছিল। তার ফলে বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার-এর উদ্যোক্তাদের চেষ্টায় 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম নিয়ে পেশাদারী নাট্যশালা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে এর সূচনা। বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে এটি একটি গৌরবময় দিন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সেদিন এই অভিনয়ের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। ন্যাশনাল থিয়েটারে সাধারণ মানুষ টিকিট কিনে অভিনয় দেখার সুযোগ পায়। এটি বাঙালিদের দ্বারা পরিচালিত, বাঙালি অভিনেতাদের দ্বারা অভিনীত বাংলা নাটকের মঞ্চ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল।

'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, মতিলাল শূর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু প্রমুখের অভিনয় মনে রাখার মত। 'এডুকেশন গেজেট' এই অভিনয়ের যেমন প্রশংসা করে তেমনি কিছু ত্রুটিও ধরিয়ে দেয়। নীলদর্পণের অভিনয়ের সাত দিন পরে অর্থাৎ ১৪ই ডিসেম্বর ১৮৭২এই মঞ্চে দীনবধু মিত্রের 'জামাইবারিক' মঞ্চস্থ হয়। এই অভিনয়ে আসন ও আলোর ভালো ব্যবস্থা ছিল। ১৮৭২-এর ২১শে ডিসেম্বর নীলদর্পণের দ্বিতীয় অভিনয়ে অভূতপূর্ব সাফল্য লক্ষ্য করা যায়। ১৮৭২-এর ২১শে ডিসেম্বর 'সধবার একাদশী', ৪ঠা জানুয়ারী ১৮৭৩ 'নবীন তপস্বিনী' এবং ১১ই জানুয়ারী, ১৮৭৩ 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় পরপর তিনটি শনিবারে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে জানা যায় নাটকগুলোর অভিনয় ভালো হয়েছিল। অভিনয়ের ও দৃশ্যপটগুলির উচ্চ প্রশংসা করা হয়। সঙ্গীতের উন্নতির কথাও এখানে উল্লেখ করা হয়। জানা যায়

দৃশ্য-যবনিকা-র ব্যবহারের কথা। ন্যাশনাল থিয়েটারের সময় থেকেই নাট্যশালায় প্রমটার রাখার ব্যবস্থা হয়।

'লীলাবতী' নাটকের অভিনয়ের পর থেকে 'ন্যাশনাল থিয়েটারে' বুধবারেও অভিনয় শুরু হয়। ১৮৭৩-এর ১৫ই জানুয়ারী দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' ও কয়েকটি প্যান্টোমাইমের অভিনয় হয়। বাংলা রঙ্গমঞ্চে পাশ্চাত্যের অনুকরণে এই প্রথম প্যান্টোমাইম দেখানো হল। এরপর 'কুব্জার অঘটন', 'নব-বিদ্যালয়', 'মুস্তাফী সাহেবের তামাসা', 'পরীস্থান' প্রভৃতি নাটকের অনুষ্ঠান হয়। কুব্জার অঘটনের দৃশ্যগুলি খুব সুন্দর ছিল। ১৮৭৩-এর ১৮ই জানুয়ারী 'নবীন তপস্বিনী' দ্বিতীয়বারের অভিনয়ের পর রঙ্গালয়ের সংগঠকদের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়। পরে সালিশী কমিটির প্রচেষ্টায় বিবাদ মিটে যায়। ইতিমধ্যে রামানারায়ণের 'নবনাটক' দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ', অমৃতবাজার সম্পাদকের লেখা 'নয়শো রূপয়া', দীনবন্ধুর 'জামাইবারিক' এবং কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা' নাটকের অভিনয় হয়। ১৮৭৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী 'কৃষ্মকুমারী' নাটকের অভিনয় হয়। ১৮৭৩ সালের ৮ ই মার্চ এখানে শেষ অভিনয় হয়। সম্পাদকের পদ, টাকা-পয়সার গোলমাল এই নাট্যশালা বন্ধ হওয়ার মূলে সক্রিয় ছিল।

তিনমাসের নিয়মিত অভিনয়ের পর টাকা-পয়সার গোলমাল, বর্ষা, সাজ-সরঞ্জামের বাঁটোয়ারা নিয়ে মনোমালিন্যের কারণে ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। দ্বিতীয় বা মধ্য পর্বে গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখরকে কেন্দ্র করে ন্যাশনাল থিয়েটারের বিভাজন ঘটে। স্টেজ ও সিন্ পাওয়া গিরিশচন্দ্রের দল 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে এবং পোষাক-পরিচ্ছদ পাওয়া অর্ধেন্দুশেখরের দল 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে পরিচিত হয়। ন্যাশনাল থিয়েটার প্রথম টাউন হলে দেশীয় হাসপাতালের সাহায্যের জন্য নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় করে। গিরিশচন্দ্রের এই দল অভিনয় সাফল্যে প্রশংসিত হয়।

'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' ১৮৭৩ সালের ৫ই এপ্রিল মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' ও কতকগুলি 'প্যান্টোমাইম'-এর অভিনয় করে লিন্ডসে স্ট্রীটে অপেরা-হাউস ভাড়া নিয়ে। তারপর ১২ই এপ্রিল উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' নাটক অভিনয় করে। এরপর এই দল ঢাকায় চলে যায়। সেখানে তারা প্রায় একমাস ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তারা 'নীলদর্পণ', রামানারায়ণের 'নবনাটক', দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী', 'নবীন তপস্বিনী', 'জামাইবারিক', মধুসূদনের 'কৃষ্মকুমারী'র অভিনয় দেখিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। সেখানে অভিনয়ের সময় দলটি নবাব বাড়ির ব্যান্ড ও মোহিনীবাবুর কনসার্ট-এর সাহায্য পায় এবং সেখানকার দর্শকরা খুব আনন্দ পায়। এরপর হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার, ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে মিলিতভাবে বিভিন্ন জায়গায় বেশ কিছু অভিনয় করে। তার মধ্যে মধুসূদনের মৃত্যুতে তার পরিবারকে সাহায্য করার জন্য ১৮৭৩-এর ১৬ই জুলাই 'কৃষ্মকুমারী'র অভিনয় উল্লেখযোগ্য। এর পরে 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' এককভাবে 'মোহান্তের এই কি কাজ' (১৮৭৩, ১৩ই সেপ্টেম্বর), 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' নাটকের অভিনয় করে অভিনয় কলাকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

পাশাপাশি 'ন্যাশনাল থিয়েটার'ও 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয়ের পর শোভাবাজার রাজবাড়িতে এসে 'কৃষ্ণকুমারী', 'নীলদর্পণ', 'কিঞ্চিৎ জলযোগ', একেই কি বলে সভ্যতা', রঙ্গনাট্য 'ডিসপেনসারি' এবং 'চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি'-র অভিনয় করে। শোভাবাজার নাটমন্দিরে এই থিয়েটারের শেষ অভিনয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' ও তার সঙ্গে 'ভারতসঙ্গীত' ১৮৭৩ সালের ১০ই মে। অভিনয় ক্ষেত্রে দুদলই বিশেষ প্রচার ও প্রসার লাভ করেছিল। এভাবেই সাধারণ রঙ্গালয়ের দ্বিতীয় পর্বের সমাপ্তি।

শেষ পর্বে 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার', গ্রেট ন্যাশনাল' নাম গ্রহণ করে। 'ন্যাশনাল থিয়েটার' পূর্ব নামেই থেকে যায়। তবে ১৮৭৩-এক ৭ই ডিসেম্বর দুদলই পৃথক পৃথক ভাবে একই দিনে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করে। তারপর কিছুদিন পরে হরলাল রায়ের 'হেমলতা', দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী'-র অভিনয় মঞ্চস্থ হয়। এরপর 'ন্যাশনাল থিয়েটার' 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর সঙ্গে মিলে যায়। এইভাবে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে পেশাদারী থিয়েটারের প্রবর্তন ঘটায়।

বাংলা নাট্যজগতের অন্যতম প্রধান পুরুষ গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনি একাধারে নট, নাট্যকার, নাট্যচার্য, অভিনয় শিক্ষক ও মঞ্চ পরিচালক। প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাশালী মাত্র ত্রিশ কি বত্রিশটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বাংলা নাট্যশালার সেবক হিসেবে উৎসর্গীকৃত প্রাণ তিনি। বাগবাজারের সখের দলে 'সধবার একাদশী'-তে নিমচাঁদের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয়ের মধ্য দিয়ে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব। দেশী-বিদেশী দুই অভিনয় ধারার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের ভীমসিংহ চরিত্রে অভিনয় করে তিনি খুব প্রশংসা পেয়েছিলেন। তিনি ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, স্টার, মিনার্ভা-য় বহু নাটকে অভিনয় করেছেন। সামাজিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক জাতীয় নাটকে অভিনয় করে নিজ প্রতিভার দ্বারা তিনি বাঙালি দর্শকের চিত্ত জয় করেছিলেন। নাট্যালয়ের সঙ্গে গভীর যোগের কারণে তিনি চার/পাঁচটি নাট্যালয় গড়ে তোলেন। জনশিক্ষায় তাঁর নাটক মূল্যবান সম্পদ। রঙ্গালয়ের প্রয়োজনে এবং তার উন্নতির জন্য তিনি নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। তিনি রঙ্গালয়ের অদ্বিতীয় পুরুষ। অভিনয় মঞ্চ এবং অভিনয় দল গড়ার ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ আকর্ষণী শক্তি ছিল। যুগের প্রয়োজনে জাতির হৃদয়-ভাবনাকে উপলব্ধি করে নাট্যমঞ্চে নাটকের চরিত্রের মুখে তিনি ভাষা দিয়েছেন। গৈরিশ ছন্দের মধ্য দিয়ে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। গিরিশচন্দ্রের কণ্ঠস্বর, তাঁর ব্যক্তিত্ব রঙ্গামঞ্চে দর্শকদের মধ্যে বিস্ময়ের উদ্রেক করত। নিমচাঁদ, ভীমসিংহ, বিদূষক, করিমচাচা, যোগেশ এ জাতীয় বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় নবতর তাৎপর্যে দর্শকদের মনে আলোড়ন তুলত। ট্রাজিক চরিত্রের অভিনয়ে তাঁর প্রতিভা শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দাপট বাংলা রঙ্গামঞ্চকে উজ্জীবিত করে তুলেছিল। বাংলা রঙ্গামঞ্চে ১৮৮০ থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল।

অমৃতলাল বসু বাংলা নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধিতে আত্মনিবেদিত প্রাণ। গুরুগম্ভীর ও রঙ্গব্যঙ্গের চরিত্রের অভিনয়ে তিনি কৃতিত্বেরপরিচয় দেন। গিরিশযুগের নট, নাট্যকার ও নাট্যাচার্য হিসেবে তাঁর গুরুত্ব অপরিসীম। নাট্যসংগঠক হিসেবেও তাঁর অবদান কম নয়। তাঁর সৃষ্টিকর্ম ও ব্যক্তিত্বে হাস্যরসের ফুলঝুরি। নাট্যশালা ও নাট্যমঞ্চের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনায় তিনি নিজেকে আন্তরিকভাবে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। নাট্যমঞ্চের আলোকসম্পাতে, দৃশ্যসজ্জায়, রূপসজ্জায় ও প্রসাধনে তাঁর তীক্ষ্ম নজর ছিল। বাক্‌চাতুর্যে তিনি সকলকে মোহিত করতে পারতেন। সাহেবী ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করতে পারতেন। হাস্যরসের দিকে তাঁর স্বাভাবিক ঝোঁক থাকলেও উদার প্রসন্নতার জন্য তিনি করুণ ও ভক্তিরসাত্মক ভূমিকায় অভিনয়-পটুত্ব দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'নীলদর্পণ' নাটকে সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকায় প্রথম অভিনেত্রী হিসেবে,, 'মৃণালিনী'-তে দিগ্বিজয়ের ভূমিকায় প্রথম কৌতুক অভিনেতা রূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ। বিদূষক জাতীয় চরিত্র, টাইপ চরিত্র, রসিক বৃদ্ধের ভূমিকায় তিনি অসাধারণ অভিনয় করতে পারতেন। নিজের লেখা নাটকেও তিনি অভিনয় করেছেন। 'সরলা' নাটকের নীলকমল, 'খাসদখল'-এর নিতাই, 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের মদনিকা, 'হীরকচূর্ণ'-এ অ্যাডভোকেট জেনারেল, 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী'তে ম্যাজিস্ট্রেট মাক্রেন্ডেলের ভূমিকায়, 'চন্দ্রশেখর'-এ লরেন্স, 'প্রফুল্ল' নাটকে রমেশ প্রভৃতি চরিত্রে তিনি অসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন। প্রচুর নাটক লিখে, অনেক চরিত্রে অভিনয় করে, নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালানায় দক্ষতা দেখিয়ে অভিনয় জগতে অমৃতলাল অবিস্মরণীয় নিদর্শন রেখে গেছেন।

৮৯.১২ সারাংশ (মূলপাঠ ৩, ৪, ৫)

সখের থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করার সমকালীন ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে নবীনচন্দ্র বসু শ্যামবাজার থিয়েটার তৈরি করেন। এই থিয়েটারে বাংলা ভাষায় হিন্দুদের দ্বারা বাংলা নাটক অভিনীত হত। 'বিদ্যাসুন্দর'-এর অভিনয় দিয়ে এর উদ্বোধন হয়। এখানে প্রথম নারী অভিনেত্রী নিয়োগ, দৃশ্যপট নির্মাণ, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার, আলোকসম্পাত ইত্যাদির মাধ্যমে মনোজ্ঞ অভিনয় ও মঞ্চসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। এই থিয়েটার জনসমাজে উদ্দীপনা সৃষ্টি করলেও বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয়ে পাইকপাড়ার রাজাদের দ্বারা তৈরি 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা' ১৮৫৮ সালে 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এর মঞ্চসজ্জা, গীতবাদ্য এবং অভিনয় খুব উচ্চমানের ছিল। বিদ্যাসাগর, মধুসূদন প্রমুখ দেশী-বিদেশী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে এই নাট্য মঞ্চ সরগরম থাকত। এখানকার ঐকতানবাদন, আলোকসজ্জা প্রশংসনীয় হয়েছিল। এখান থেকে মধুসূদন নাটক লেখার প্রেরণা পান। তাঁর রচিত 'শর্মিষ্ঠা' বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে কয়েকবার অভিনীত হয়। এই নাট্যশালা বাঙালির নাট্যভাবনাকে বেশ কিছুটা অগ্রসর করেছিল।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে নাট্যামোদী সদস্যরা জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে এখানকার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। তবে লোকশিক্ষা মূলক নাটক লেখার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র নন্দীর পরামর্শে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। রামানারায়ণ তর্করত্নের 'নবনাটক' এই মঞ্চে নানারকম মঞ্চোপকরণের সাহায্যে অভিনীত হয়ে প্রশংসা অর্জন করে ও গতানুকতিকতা ভঙ্গ করে। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গানাট্যালয়-এর দ্বারোদঘাটন হয় 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে। এখানকার বিভিন্ন নাটকে বাদ্যসঙ্গীত খুব আকর্ষণীয় হয়েছিল। রেওয়ার রাজা অভিনেতাদের উপঢৌকন দিতে চাইলেও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। 'মালতীমাধব' সহ বেশ কিছু নাটক বেশ কয়েকবার সাফল্যের সঙ্গে এখানে অভিন্ীত হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহদের প্রচেষ্টায় শোভাবাজার নাট্যশালা 'একেই কি বলে সভ্যতা' নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রঙ্গাভূমিতে নট ও নটীর আগমন এবং তাদের কণ্ঠের গান ছিল এখানকার আকর্ষণ। সাড়ম্বরে কৃষ্ণকুমারীর অভিনয়ের পর এই নাট্যশালা বন্ধ হয়ে যায়।

সখের নাট্যশালার পরিণতি পর্বে গিরিশচন্দ্র গোষ, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী এদের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে 'বাগবাজার অ্যমেচার থিয়েটার'। 'সধবার একাদশী' নাটক সফল অভিনয়ের সংবাদে দীনবন্ধু মিত্র স্বয়ং এই নাটক দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই থিয়েটারের নাম হয় 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ'। এখানকার অভিনয় ছিল উচ্চাঙ্গের। কিন্তু সাধারণ মানুষ নাটক না দেখতে পাবার জন্য তাদের ও মঞ্চের দিকে তাকিয়ে এখান থেকেই গড়ে ওঠে 'ন্যশনাল থিয়েটার'। ১৮৭২ সাল বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে গৌরবময় দিন। নামকরা বাঙালি অভিনেতা, নামকরা বাংলা নাটকের অভিনয় ছিল এই নাটকের প্রাণ। দীনবন্ধু মিত্রের প্রায় সব নাটক এই থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। প্রায় একবছর ধরে বেশ কিছু নাটকের অভিনয়ের পর আভ্যন্তরীণ গোলমালে এই নাট্যশালা বন্ধ হয়ে যায়। মূলত গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীর দ্বন্দ্বে এই বিভাজনে 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর সঙ্গে 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' জন্ম নেয়। কোলকাতা এবং কোলকাতার বাইরে এই দুই দল বেশ কিছু নামী নাটকের অভিনয় করে। পরবর্তীকালে এরা একসঙ্গে মিলে যায়। গড়ে ওঠে 'গ্রেট-ন্যাশনাল থিয়েটার'। তবে বাংলা রঙ্গালয়ে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রায় একটা ইতিহাস। নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ বহু নাটকে অভিনয় করে, প্রশংসা পেয়ে, দর্শকদের উজ্জীবিত করে বাংলা রঙ্গামঞ্চকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এই যুগে নাট্যশালা ও অভিনয়ের সমৃদ্ধিতে নাট্যসংগঠক হাস্যরসিক অমৃতলাল বসু আন্তরিকভাবে নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে নাট্যমঞ্চের ব্যবস্থাপনায় ও অভিনয় দক্ষতায় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

৮৯.১৩ অনুশীলনী ৩, ৪, ৫

১। নিচের প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তরে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) নবীনচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত থিয়েটারের নাম—
- (১) শ্যামবাজার থিয়েটার
- (২) বেলগাছিয়া থিয়েটার
- (৩) জোড়াসাঁকো নাট্যশালা

(খ) বেলগাছিয়া নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়—
- (১) ১৮৩৩ সালে
- (২) ১৮৫৮ সালে
- (৩) ১৮৫৯ সালে

(গ) রত্নাবলী নাটকের লেখকের নাম—
- (১) দীনবন্ধু মিত্র
- (২) মধুসূদন দত্ত
- (৩) রামনারায়ণ তর্করত্ন

(ঘ) কৃষ্ণকুমারী কি জাতীয় নাটক?
- (১) পৌরাণিক
- (২) ঐতিহাসিক
- (৩) সামাজিক

(ঙ) কোন পত্রিকা পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়কে জাতীয় নাট্যালয় আখ্যা দেয়?
- (১) হিন্দু পেট্রিয়ট
- (২) বেঙ্গালী
- (৩) সোমপ্রকাশ

২। নিচের বক্তব্যগুলি ঠিক বা ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে টিক্ (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান।

	ঠিক	ভুল
(ক) পাইকপাড়ার রাজার নাম প্রতাপচন্দ্র সিংহ।	☐	☐
(খ) গোপাল উড়ের যাত্রা দেখে জোড়াসাঁকো নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা।	☐	☐
(গ) জোড়াসাঁকো নাট্যমঞ্চ গতানুগতিক ছিল।	☐	☐
(ঘ) বঙ্গরঙ্গমঞ্চের জনক গিরিশচন্দ্র ঘোষ।	☐	☐
(ঙ) ন্যাশনাল থিয়েটারের সময় থেকে প্রম্‌টার রাখার ব্যবস্থা হয়।	☐	☐

৩। নিচের শূন্যস্থানগুলিতে যথাযথ শব্দ বসিয়ে পূরণ করুন।

(ক) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পরামর্শে——প্রতিষ্ঠা।

(খ) মধুসূদনের সহপাঠীর নাম ——।

(গ) রামনারায়ণ বহুবিবাহ বিষয়ে —— লেখেন।

(ঘ) ধর্মদাস সুরের —— অঙ্কন প্রশংসিত হয়েছিল।

(ঙ) —— ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করতেন অমৃতলাল বসু।

৮৯.১৪ উত্তর-সংকেত

অনুশীলনী ১ :

১। (ক) ২ (খ) ৩ (গ) ১

২। (ক) ইংরেজ (খ) চৌরঙ্গী (গ) ওথেলো (ঘ) দমদম থিয়েটার

অনুশীলনী ২ :

১। (ক) সঙ্গীতজ্ঞ (খ) খিদিরপুরের (গ) ক্ষতিসাধনের

২। (ক) ৩ (খ) ৩ (গ) ২

অনুশীলনী ৩, ৪, ৫ :.

১। (ক) ১ (খ) ২ (গ) ৩ (ঘ) ২ (ঙ) ১

২। (ক) ঠিক (খ) ঠিক (গ) ভুল (ঘ) ঠিক (ঙ) ঠিক

৩। (ক) বেলগাছিয়া নাট্যশালা (খ) গৌরদাস বসাক

(গ) নবনাটক (ঘ) দৃশ্যপট (ঙ) সাহেবী

৮৯.১৫ গ্রন্থপঞ্জি

(১) কোলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয় — অমল মিত্র।

(২) বাংলা নাট্যমঞ্চের রূপরেখা — ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

(৩) বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস — ড. অজিত কুমার ঘোষ।

একক ৯০ ❑ বাংলা নাট্যাভিনয়ের নবযুগ

গঠন

৯০.১ উদ্দেশ্য
৯০.২ প্রস্তাবনা
৯০.৩ মূলপাঠ ১ ·. নাট্যপরিচালনা ও অভিনয়ে নবযুগের সূচনা ও শিশিরকুমার
৯০.৪ মূলপাঠ ২ : রবীন্দ্রনাটকের মঞ্চাভিনয় — শান্তিনিকেতন
৯০.৫ সারাংশ (মূলপাঠ ১, ২)
৯০.৬ অনুশীলনী ১ (মূলপাঠ ১, ২)
৯০.৭. মূলপাঠ ৩ গণনাট্য আন্দোলন ও তারপর গণনাট্য সংঘ, বহুরূপী, নান্দীকার
৯০.৮ সারাংশ
৯০.৯ অনুশীলনী ২
৯০.১০ উত্তর-সংকেত
৯০.১১ গ্রন্থপঞ্জি

৯০.১ উদ্দেশ্য

এই একক পড়লে আপনি—

- গণনাট্য আন্দোলন কি তা জানতে পারবেন।
- স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে দুর্ভিক্ষজনিত সামাজিক প্রেক্ষাপটে 'নবান্ন' নাটকের ভূমিকা ও গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন। গণনাট্যের প্রথম নাটক হিসেবে এর অবদান ও গণনাট্যের গুরুত্ব জানতে পারবেন।
- নবনাট্য আন্দোলন বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চের ক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করেছিল সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি যে নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছিল তা জানতে পারবেন।

৯০.২ প্রস্তাবনা

বাংলাদেশে আধুনিক নাট্যকলা ইংরেজি নাটক ও নাট্যমঞ্চের রীতিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে।

লেবেডফের নাটক বিদেশী রীতিতে প্রস্তুত হলেও বাঙালির নাট্যভাবনা অগ্রসর হয়েছে এই পথে। সখের নাট্যশালার পর পেশাদারী নাট্যমঞ্চ। এই সময় থেকে গিরিশ ঘোষ, শিশিরকুমার ভাদুড়ীরা বাংলার নাট্যচিন্তাকে অনেকদূর অগ্রসর করেছে। মঞ্চ, দৃশ্যপট, সাজসজ্জা, বাদ্যযন্ত্র, আলোকসম্পাত, প্রমট করা ইত্যাদি বিষয় ভাবনা বঙ্গ রঙ্গামঞ্চকে ধাপে ধাপে উন্নীত করেছে। তারপর নাট্যমহলে ঢুকেছেন রবীন্দ্রনাথ। নাটক পেয়েছে নতুন ধারা। অবশেষে বিংশ শতাব্দীতে নানা ঘটনা ও সমস্যা, ফ্যাসিবাদ, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি মানবজীবনে যে যন্ত্রণা নামিয়ে আনে তার প্রভাব পড়ে নাটকে। যুগযন্ত্রণাকে প্রকাশ করার জন্য শুরু হয় গণনাট্য আন্দোলন। মানুষের জীবন ভাবনা, জীবন দর্শন এসবই নাটকে প্রতিফলিত হয়। উঠে আসে রাজনীতি। শুরু হয় দ্বন্দ্ব। ভাঙে গণনাট্য সংঘ। নতুন জীবন ভাবনার আলোকে গণনাট্য সংঘ ভেঙে বহুরূপী, নান্দীকার, শৌভনিক, গন্ধর্ব প্রভৃতি নাট্যগোষ্ঠী মানুষের কথা বলতে শুরু করে। দেশী-বিদেশী ভালো নাটক উপহার পেতে শুরু করে নাট্যামোদীরা।

৯০.৩ মূলপাঠ ১ : নাট্যপরিচালনা ও অভিনয়ে নবযুগের সূচনা ও শিশিরকুমার

সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রায় ১৯২০ সাল পর্যন্ত সময়কালকে গিরিশ যুগ নামে অভিহিত করা হয়। গিরিশ যুগের পর বাংলা সাধারণ নাট্যশালার দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত। এই পর্বের অবিসংবাদিত অভিনেতা-পুরুষ নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তাঁর মহনীয় আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে বাংলা রঙ্গালয়ের অভিনয় জগতে এক অবিস্মরণীয় পরিবর্তন আসে। গিরিশচন্দ্রের যুগকে অমৃতলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল সুর প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্বরা বহন করে চলেছিলেন; কিন্তু শিশির ভাদুড়ীর আবির্ভাবের পর এই যুগের অবসান ঘটে এবং বাংলা রঙ্গামঞ্চের জগতে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। শিল্পসম্মত অঙ্গসঞ্চালন, কণ্ঠস্বরে বৈচিত্র্য, মননশীলতা প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি অভিনয়ে নবরীতির প্রবর্তন করেন। তিনি নাটক উপস্থাপনা, অভিনয়, প্রয়োগ সবকিছুতেই নতুন ভাবনা জুড়ে, দিয়ে নাটক ও নাট্যমঞ্চের পূর্ণবিকাশের পথ সুগম করেছিলেন।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। তিনি ছিলেন শিল্পী স্রষ্টা, বোদ্ধা এবং সমালোচক। নাট্যমঞ্চে তাঁর প্রথম আবির্ভাব ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর' নাটকে। আলমগীরের ভূমিকায় তাঁর বিস্ময়কর অভিনয় নাট্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বাংলা রঙ্গামঞ্চকে জনমানসে সমাদৃত করার ক্ষেত্রে, মঞ্চের সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে, দর্শকদের রুচি উন্নত করার ক্ষেত্রে, সর্বোপরি নাট্যশালায় শৃঙ্খলা আনার ক্ষেত্রে শিশিরকুমারের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা যায়। অভিনেতা হিসেবে তাঁর প্রতিভা ছিল একটা ঐশ্বর্য। তিনি নাটক লেখেননি, কিন্তু নাটক লিখিয়েছেন। তাঁর সুললিত কণ্ঠস্বর, বাচনভঙ্গি, থিয়েটার সম্পর্কে পাণ্ডিত্য, সহজাত শিল্পপ্রতিভা বাংলা থিয়েটারের সম্পদ হিসেবে গৃহীত।

নাট্যাভিনয় ও নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে শিশিরকুমার অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর পরিচালিত নাটকে তিনি প্রধান হলেও অপ্রধানদের প্রস্ফুটিত করার দায়িত্ব ছিল তাঁরই। মঞ্চে সাফল্য, দূরদর্শিতার পরিবর্তে ঝড়ের পাখির মত দুঃসাহসিকতা দেখাতে তাঁর জুড়ি ছিল না। নাটকে বাস্তবানুগ পরিবেশ সৃষ্টি করতে তিনি সচেষ্ট থাকতেন। অভিনয়ের সময় শিশিরকুমারের সত্তার সামগ্রিক ক্রিয়াশীলতা প্রকাশ পেত। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল প্রশংসা পাবার যোগ্য। আবেগের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির যোগ ঘটিয়ে দর্শকদের যেমন তিনি আনন্দ দিতেন, তেমনি তাদেরকে উদ্দীপ্ত করে তুলতেন। সচেতন শিল্পী ছিলেন বলেই অভিনয়ের চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে তুলতে পারতেন। রাম, আলমগীর, চাণক্য, জীবানন্দ প্রভৃতি চরিত্রের অভিনয়ে তিনি তা প্রমাণ করিয়েছেন। 'সীতা' নাটকে রামের ভূমিকায়, 'নরনারায়ণে' কর্ণের ভূমিকায়, 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'-এ ভীম-এর ভূমিকায় 'চন্দ্রগুপ্তে' চাণক্য, 'আলমগীর' নাটকে আলমগীরের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় সাফল্য মনে রাখার মত। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের নাটকেও তিনি মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি স্টার, রঙমহল, নাট্যনিকেতন, নাট্যমন্দির, শ্রীরঙ্গম প্রভৃতি নাট্যমঞ্চে বহু অভিনয় করে গেছেন। একজন দক্ষ নট হিসেবে নাট্য পরিচালনা, অভিনয় শৈলীতে যে নবরীতির ধারা শিশিরকুমার সৃষ্টি করে গেছেন তা বাংলা নাট্যমঞ্চের অমূল্য সম্পদ।

৯০.৪ মূলপাঠ ২ : রবীন্দ্রনাটকের মঞ্চাভিনয় — শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথের নাটক ও নাট্যমঞ্চের কথা বলতে গেলে জোড়াসাঁকো ও শান্তিনিকেতন দুই-এরই কথা মনে আসে। প্রথম প্রতিষ্ঠিত জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় 'কয়কুমারী', 'নবনাটক' ইত্যাদি অভিনীত হয় এবং নাট্যশালাটি বন্ধ হয়ে যায়। ঠাকুরবাড়ির মধ্যেই এই নাট্যমঞ্চের অভিনয় সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে এই শৌখিন নাট্যশালায় সাধারণের জন্য কিছু নাটক মঞ্চস্থ হলেও রঙ্গালয়টি বন্ধ হয়ে যায়। পরে এখানে 'বিদ্বজ্জন সমাগম' নামে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়। এখানে গীতিবাদ্য, আবৃত্তি এবং মাঝে মাঝে নাটকের অভিনয় চলত। দ্বারকানাথের সময় থেকেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে মঞ্চ ও অভিনয়ের প্রতি একটা বিশেষ অনুরাগ ছিল। ফলে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এঁদের কাছ থেকে নাটক ও নাট্যমঞ্চের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। আবার বড় হয়ে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত 'সঙ্গীত-সমাজ'-এ গিয়ে অভিনয় শিক্ষা দিতেন। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ নাটক লেখায়, অভিনয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। ১৮৮১ সাল থেকে ১৯৩৯ সালপর্যন্ত জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে এবং শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকের অভিনয় হয়েছিল।

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে 'বিদ্বজ্জন সমাগম' মঞ্চে দেশী ও বিদেশী সুরের সহযোগে রবীন্দ্রনাথের লেখা 'বাল্মীকি প্রতিভা' নাটকখানি প্রথম অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেন। স্ত্রী

ভূমিকায় বাড়ির মেয়েরাই অভিনয় করেছিল। মঞ্চে গাছপালা দিয়ে অরণ্যপরিবেশ তৈরি কবা হয়েছিল। ঠাকুরবাড়িতে 'কালমৃগয়া', 'মায়ার খেলা', 'রাজা ও রানী', 'গোড়ায় গলদ', 'বিসর্জন' এবং 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনীত হয়। এই সমস্ত নাটকগুলিতে রবীন্দ্রনাথ যথাক্রমে অন্ধমুনি, বসন্ত, বিক্রমদেব, গায়ক, রঘুপতি এবং কেদারের ভূমিকায় সফল অভিনয় করেছিলেন। এখানে রোমান্টিক ট্রাজেডি, লঘু কমেডি, গীতিনাট্য জাতীয় বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া ঠাকুরবাড়ির আরও অনেকে ঐ সমস্ত নাটকগুলিতে অংশগ্রহণ করে স্ব স্ব যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাটকের অভিনয় নাটক ও মঞ্চের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাটকের মঞ্চাভিনয়কে আমরা দুটি পর্বে ভাগ করতে পারি— (১) জোড়াসাঁকো পর্ব এবং (২) শান্তিনিকেতন পর্ব। জোড়াসাঁকো পর্বে ছিল আবেগ ও রোমান্টিকতা, কিন্তু শান্তিনিকেতন পর্বে অভিনয় এবং তার প্রয়োগ শিল্পের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়। অভিনয়কে নাট্যকার শিক্ষার অঙ্গ মনে করে তাঁর আদর্শকে পরিবর্তন করেন। তাই সেখানকার ছাত্রদের উপযোগী নাটক 'শারদোৎসব', 'ডাকঘর', 'অচলায়তন', 'ফাল্গুনী', 'মুক্তধারা' নাটক রচনা করেছেন। ছাত্রদের জন্য লিখিত বলে অনেক নাটক স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত, খোলা মঞ্চে অভিনয়ের মতো। ১৯০২ সালে এখানে 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় হয়। 'শারদোৎসব' নাটক অভিনয়ের সময় রবীন্দ্রনাথ প্রমটারেরর কাজ করেছিলেন। ১৯০৯ সালে 'মুকুট' ও 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের অভিনয় হয়। শান্তিনিকেতনে অভিনীত 'রাজা' নাটকে রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদার চরিত্রে অভিনয় মনে রাখার মত। ১৯২২-তে অভিনীত হয় 'ডাকঘর' নাটক। একই বছরে 'ফাল্গুনী' ও 'অচলায়তন' নাটকের অভিনয় হয়েছিল। এর পরেও 'গুরু', 'বিসর্জন', 'নটীর পূজা' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় হয়েছে। নাটকগুলোর অভিনয়ে যেমন রবীন্দ্রনাথ থাকতেন তেমনি ক্ষিতিমোহন সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎকুমার রায়, জগদানন্দ রায়, কালিদাস বসু সহ ঠাকুর পরিবারের অনেকেই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন।

নাট্যাভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ নতুন আঙ্গিকের উদ্ভাবন করেন। মঞ্চে সাজপোশাক, মঞ্চোপকরণ প্রভৃতি যেমন তিনি ব্যবহার করতেন তেমনি ছাত্র তথা সাধারণের জন্যও নাটকের পটভূমি নির্মাণে স্বাভাবিকতা রাখার চেষ্টা করতেন। নাট্যধর্মী প্রয়োগরীতিতে তাঁর নাটক মঞ্চ সফল। বাংলা রঙ্গামঞ্চে প্রচলিত পাশ্চাত্য আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ মানতে চাননি। এমন কি দৃশ্যপট, আলো, সাজসজ্জা প্রভৃতি থেকে তিনি অভিনয়কে মুক্ত রাখার কথা বলেছেন। শান্তিনিকেতন নাটক লিখতে গিয়ে অভিনয় সম্পর্কে তাঁর ধারণা প্রকাশ করেছেন, যার মধ্যে একটা নতুন ধারার প্রবর্তন ঘটেছে। শান্তিনিকেতন পর্বে সাঙ্কেতিক নাটকগুলিতে তিনি গানের সাহায্যে অসাধারণ ভাব ব্যঞ্জনা প্রকাশ করেছেন। ফলত রবীন্দ্রনাটক এবং নাটকের মঞ্চাভিনয় বাংলা রঙ্গামঞ্চের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৯০.৫ সারাংশ (মূলপাঠ ১, ২)

গিরিশ যুগের পর বাংলা সাধারণ নাট্যশালার অবিসংবাদিত অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তাঁর আবির্ভাবের পর বাংলা রঙ্গামঞ্চের জগতে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। তিনি অভিনয়ে নবরীতির প্রবর্তন করেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর' নাটকে আলমগীরের ভূমিকায় আলোড়ন সৃষ্টি করা অভিনয়ের মধ্য দিয়ে নাট্যমঞ্চে তাঁর আবির্ভাব। নাট্যশালার শৃঙ্খলা আনা, দর্শক রুচির প্রতি নজর রাখা, নাটকে বাস্তবানুগ পরিবেশ সৃষ্টি করায় তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বিভিন্ন নাট্যমঞ্চে বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করে একজন সচেতন শিল্পী হিসেবে তিনি মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর, বাচনভঙ্গি, থিয়েটার সম্পর্কে পাণ্ডিত্য, অভিনয় শৈলীতে নবধারার প্রবর্তন বাংলা নাট্যমঞ্চের অমূল্য সম্পদ।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে মঞ্চ ও অভিনয়ের প্রতি একটা বিশেষ অনুরাগ ছিল। নানা সময়ে ঠাকুরবাড়ির বিভিন্ন নাট্যামোদী সদস্যদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে রবীন্দ্রনাথও নাটক লেখায় এবং অভিনয় করায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি প্রতিভা নাটকটি ১৮৮১ সালে প্রথম অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথও অভিনয় করেন। রবীন্দ্রনাথের নাটক জোড়াসাঁকো ও শান্তিনিকেতন দু'জায়গাতে অভিনীত হয়। দুই জায়গার অধিকাংশ নাটকে অন্যান্য চরিত্রাভিনেতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেও অভিনয় করতেন। তাঁর 'কালমৃগয়া', 'রাজা ও রানী', 'গোড়ায় গলদ', বিসর্জন', 'ডাকঘর', 'শারদোৎসব' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় স্মরণযোগ্য। 'রাজা' নাটকে রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদার চরিত্রে অভিনয় মনে রাখার মত। শান্তিনিকেতন পর্বে সাঙ্কেতিক নাটকে গানের ব্যঞ্জনায় বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নাটক ও নাটকের মঞ্চাভিনয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নাট্যধর্মী প্রয়োগরীতিতে তিনি মঞ্চসফল।

৯০.৬ অনুশীলনী ১ (মূলপাঠ ১, ২)

১। নিচে কয়েকজন রচয়িতা ও গ্রন্থের নাম দেওয়া আছে। আপনি সেগুলিকে দুই স্তম্ভে উপযুক্ত স্থানে লিখুন।

গ্রন্থ	রচয়িতা
(ক) আলমগীর	(ক) মধুসূদন দত্ত
(খ) কৃষ্ণকুমারী	(খ) ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
(গ) নব নাটক	(গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(ঘ) বৈকুণ্ঠের খাতা	(ঘ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
(ঙ) সীতা	(ঙ) রামনারায়ণ তর্করত্ন

গ্রন্থ	রচয়িতা
(ক)	
(খ)	
(গ)	
(ঘ)	
(ঙ)	

২। শূন্যস্থানগুলিতে যথাযথ শব্দ বসিয়ে বাক্য সম্পূর্ণ করুন।

(ক) গিরিশ যুগের পর ——— দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত।
(খ) শিশিরকুমার ভাদুড়ীর আবির্ভাবে বাংলা রঙ্গামঞ্চের ——— সূচনা।
(গ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত নাট্যসমাজের নাম ———।
(ঘ) 'রাজা' নাটকে রবীন্দ্রনাথ ——— চরিত্রে অভিনয় করেন।

৯০.৭ মূলপাঠ ৩ : গণনাট্য আন্দোলন ও তারপর ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, বহুরূপী, এল.টি.টি, নান্দীকার

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ :

ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট ধারা বেয়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা। নতুন চিন্তা, নতুন অভিনয় ধারা, নতুন মঞ্চসজ্জার মধ্য দিয়ে গণনাট্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সৌখিন আর পেশাদার এই দুই রীতিকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গণনাট্য সংঘ এক নতুন যুগের সূত্রপাত করেছে। আনুষ্ঠানিকভাবে গণনাট্য সংঘের জন্ম ১৯৪৩ সালে। ১৯৪৩-এর মে মাসে বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন' এবং বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরী' এঁরা প্রথম মঞ্চস্থ করেন। পরে বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হোমিওপ্যাথি' অভিনীত হয়। ১৯৪৪ সালের ২৪শে অক্টোবর বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের অভিনয় দিয়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের জয়যাত্রা শুরু।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা হয় 'ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' (১৯৪২)-এর নাট্যবিভাগ রূপে। ১৯৪২ সালে ঢাকায় তরুণ লেখক সোমেন চন্দের হত্যাকে কেন্দ্র করে এই সংঘের আবির্ভাব। গণনাট্য সংঘের জন্মের আগে থেকেই বিভিন্ন বামপন্থী ছাত্র সংগঠন, ইয়ুথ কালচারাল

ইনসটিটিউট, ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ গঠনের প্রস্তুতি শুরু করে। মহাযুদ্ধকালীন ঘটনা, দেশব্যাপী মন্বন্তরের বিভীষিকার প্রতিক্রিয়ারূপে গড়ে ওঠে গণনাট্য আন্দোলন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ গণনাট্য আন্দোলনকে রাজনৈতিক চেতনা দিয়েছে। গড়ে তুলেছে সমসাময়িক জীবন সম্পর্কে চেতনাবোধ। কৃষকের সঙ্গে জমিদারের সংঘাত, শ্রমিকের সঙ্গে মালিকের সংঘাত, সাধারণ চেতনাবোধ নিয়ে সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীতে নাটক লেখার কাজ শুরু হয়। তৃপ্তি মিত্র, শোভা সেন, সুধি প্রধান, গঙ্গাপদ বসু, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত প্রমুখেরা ছাড়াও গ্রাম-শহরের বহু শিল্পী এসে জড়ো হয় এর আকর্ষণে। গান, নাটক, ছাড়া, প্রবন্ধ, নৃত্য ইত্যাদি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি পৌঁছানোর চেষ্টা চলে। ঝড়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, খাদ্য সংকট, দুর্ভিক্ষ, জাপানী আক্রমণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বিভিন্ন নাটক অভিনয় করতে শুরু করে। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে আগামী প্রজন্মকে আশাবাদে উৎসাহিত করে সমাজজীবনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন আনে গণনাট্য আন্দোলন। এই সময়ের নাটকে বক্তব্য ছিল নতুন, বাস্তব এবং নির্ভীক। মঞ্চে দৃশ্যপটেরপরিবর্তে প্রতীকধর্মিতা, বক্তব্যের বলিষ্ঠতা, কর্মীদের আন্তরিকতায় নতুনভাবে সমকালীন নানা সমস্যা শিল্পরূপ পায়। সংলাপ জীবনমুখী করা, আলো ও ধ্বনি দিয়ে মূলভাব ফোটানোর চেষ্টা, মতাদর্শের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির দ্বারা নাটকের গুরুত্ব বাড়ানোর চেষ্টা হয়।

বহুরূপী — শম্ভু মিত্র :

কিন্তু রাজনৈতিক বক্তব্য প্রাধান্য পাওয়ায় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ভাঙন শুরু হয়। ভারতীয় গণনাট্য থেকে বেরিয়ে এসে শম্ভু মিত্র ১৯৪৮ সালে 'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠী তৈরি করেন। এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন গঙ্গাপদ বসু, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অমর গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, সবিতাব্রত দত্ত, গীতা দত্ত, কুমার রায় প্রভৃতি। এ সময় নাটকে আবার নতুন ধারার সূচনা হল। শম্ভু মিত্র জনমুখী চেতনার পরিবর্তে সাহিত্যমুখী চেতনার ওপর গুরুত্ব দিলেন। সম্পূর্ণ বামপন্থী চেতনা নয়, মতাদর্শের ভিত্তিতে নাটক নয়; বরং নাটকে সাহিত্য, ইমোশন, মঞ্চ ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হল। শম্ভু মিত্রের এই ধারাকে বলা হয় 'নবনাট্য' আন্দোলনের ধারা। 'বহুরূপী' প্রায় পঁচিশ বছর তার অসামান্য প্রভাব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। 'বহুরূপী' নাট্যসংস্থার নাট্য প্রযোজনা এবং অভিনয় আনে একটা ঐতিহ্য। ১৯৪৮ থেকে শুরু করে 'নবান্ন', 'পথিক', 'উলুখাগড়া', 'ছেঁড়াতার' তারা সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছে। পাশাপাশি 'রক্তকরবী', 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা' অভিনয় করে নবনাট্যগোষ্ঠী দেখিয়ে দিয়েছে রবীন্দ্রনাথকে মানুষের মধ্যে আনা যায়। বহুরূপী প্রযোজিত 'রক্তকরবী' নাট্য আন্দোলনে এক নতুন ধারার বিবর্তন ঘটালো। অন্যদিকে 'বহুরূপী'র তৃতীয় পর্বে বিশ্বের সাহিত্য ও সমাজকে তুলে ধরার চেষ্টা হয়। নাট্য আন্দোলনকে আরও ব্যাপক করার আগ্রহে সৎ নাট্যের প্রতি উৎসাহ বেড়ে ওঠে। সফোক্লিস-এর 'রাজা

অয়দিপাউস', ইবসেনের 'ডলস হাউস' জাতীয় প্রাচীন ক্লাসিকস্-এর প্রযোজনা শুরু হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের নাটকও এখানে মঞ্চস্থ হয়। তার মধ্যে বিজয় তেন্ডুলকারের 'চোপ আদালত চলছে' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'বহুরূপী'র পাশাপাশি 'শৌভনিক' 'গন্ধর্ব', 'থিয়েটার ইউনিট'ও বেশ কিছু নাটক মঞ্চস্থ করেছেন।

উৎপল দত্ত : লিটল থিয়েটার গ্রুপ (এল.টি.জি) ও প্রগ্রেসিভ লিটল থিয়েটার (পি.এল.টি) :

ব্যবসায়িক মঞ্চে গিরিশচন্দ্র-অর্ধেন্দুশেখর থেকে শিশির ভাদুড়ীর কাল পর্যন্ত অর্থাৎ চারের দশকের সূচনা পর্যন্ত ছিল পেশাদারী অভিনয়ের যুগ। কিন্তু চল্লিশের দশকের সামাজিক, আর্থ-রাজনৈতিক জটিলতার মধ্য দিয়ে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-এর (সংক্ষেপে ভাগনাস) নেতৃত্বে কিছু সমাজ-রাজনীতি সচেতন থিয়েটারের সূচনা হল 'নবান্ন' নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে। একদিন থিয়েটারকে একটা নেশা ভাবা হলেও পেশাদারদের কাছে ছিল সেটা পেটের দায়, সৌখিন অভিনেতাদের কাছে আনন্দ-স্ফূর্তির বিষয়, আর এই নতুন থিয়েটারে এ হল একেবারে অন্তরের টান, যার পেছনে সক্রিয় ছিল আদর্শের ভিত্তি। উৎপল দত্ত শেষোক্ত থিয়েটারের ফসল।

ব্রিটিশ থিয়েটারের ঘরানায় উৎপল দত্তের অভিনয়-পরিচালনা-প্রযোজনা জীবনের সূচনা। সেক্সপীয়রীয় নাটকের অভিনেতা জেফ্রি কেন্ডালের শিক্ষা ও সেক্সপীয়র প্রেম তাঁর সামাজিক-রাজনৈতিক নান্দনিক চেতনাকে তৈরি করেছে। জুন, ১৯৪৮-এ লিটল থিয়েটার গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করে তিনি কয়েকটি ইংরেজি নাটক—ওথেলো, মিডসামার নাইটস্ ড্রিম, রোমিও জুলিয়েট, ম্যাকবেথ প্রভৃতি অভিনয়ের মধ্য দিয়ে পথ চলা শুরু করেছিলেন। পরে বেশ কয়েকটি বাংলা—বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ, অলীকবাবু, তপতী প্রভৃতি ইংরেজি নাটকের বাংলা অনুবাদ—ম্যাকবেথ, নীচের মহল প্রভৃতি প্রযোজনা করেন। ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ -তে পরপর দুটি নাট্যোৎসব শেষে ২৭শে জুলাই, ১৯৫৩-এ তিনি মিনার্ভা থিয়েটার 'লিজ' নিয়ে অঙ্গার, ফেরারি, ফৌজ, কল্লোল, তিতাস একটি নদীর নাম, লেনিনের ডাক প্রভৃতি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনার মাধ্যমে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। অবশেষে 'তীর' (১৯৬৯) নাটক অভিনয়ের পর তিনি বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। ফলে, এল.টি.জি. ভেঙে যায়। উৎপল দত্ত শেষ পর্যন্ত নিজের ভুল বুঝে নতুন নাট্যদল গঠন করেন, নাম দেন প্রগ্রেসিভ লিটল থিয়েটার (পি.এল.টি)। পি.এল.টি-র প্রযোজনায় 'টিনের তলোয়ার' (আগস্ট ১৯৭১), ব্যারিকেড ১৯৭২), দুঃস্বপ্নের নগরী (১৯৭৪), তিতুমির (১৯৭৮) প্রভৃতি স্মরণীয় হয়ে আছে। পরিচালক-অভিনেতা-প্রযোজক উৎপল দত্ত থিয়েটারকে একটি শিল্পকর্ম হিসেবে গণ্য করতেন বলেই তাঁর প্রতিটি প্রযোজনায় অভিনেতার অভিনয়-গৌরব অত্যধিক গুরুত্ব পেলেও, তিনি দৃশ্যসজ্জা, সঙ্গীত, আলোক, পোশাক, রূপসজ্জাতেও সমান গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় : নান্দীকার, নান্দীমুখ :

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় গণনাট্য থেকে বেরিয়ে এসে, কলেজের নাট্যপ্রেমী কয়েকজন বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে স্বতন্ত্র নাট্যদল গড়েন। (২৯শে জুন, ১৯৬০)। এতে ছিলেন, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, দীপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, অজয় গঙ্গোপাধ্যায়। পরে যোগ দেন, ঝরনা চট্টোপাধ্যায়, মায়া ঘোষ, অশোক মুখোপাধ্যায়, দীপালি চক্রবর্তী, বিভাস চক্রবর্তী। ১৯৬৩-তে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত এবং আরও অনেকে। এঁরাও 'বহুরূপী'র মতো খোলা দৃষ্টিভঙ্গির যুক্তি অনেকাংশে গ্রহণ করেছিলেন। নাটক নির্বাচনে আরও একটু স্বাধীনতা প্রত্যাশা নিয়ে পৃথিবীর নাট্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলিকে নিজেদের স্বাধীন জ্ঞানবুদ্ধি মতো নির্বাচন ও পরিবেশন করবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। অজিতেশের নেতৃত্বে যে সমস্ত নাটক নির্বাচিত হত সেখানে প্রাধান্য পেত নাটকের বক্তব্য ও নাট্যরূপের চমৎকারিত্ব। 'নান্দীকার' অভিনীত নাটকের প্রতি লক্ষ্য রাখলেই তার বিষয়, উপস্থাপনা ও গঠনবৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রসঙ্গত, অজিতেশ পরিচালিত ও অভিনীত পিরানদেল্লোর নাটক অনুসরণে 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র' নিয়ে কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে স্মরণীয় একজন বড়োমাপের নাট্যকার, অভিনেতা অভিনেত্রী ও অন্যান্য নাট্যকর্মীর সমাবেশ ঘটে। এঁদের কেউ কেউ সংগত কারণে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হতে বাধা নেই, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ব্যক্তিত্বের সংঘাত। অজিতেশের ব্যক্তিত্ব, দলের ওপর তার সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণের ফল দলে কিছু জটিলতা তৈরি হয়। ফলে সংহতির সমস্যা দেখা দেয়। এরই পরিণতিতে দেখা যায়, ফ্যাসিস্ট মুসোলিনার সঙ্গে পিরানদেল্লোর ঘনিষ্ঠতা প্রসঙ্গ তুলে নান্দীকার প্রযোজিত ও অজিতেশ অভিনীত নাটক নিয়ে বিতর্ক ও বিরোধ সৃষ্টি হয়। অজিতের এর দায় গ্রহণ করে নান্দীকার ছেড়ে 'নান্দীমুখ' (১৯৭৭) তৈরী করেন। রুদ্রপ্রসাদ নান্দীকার পরিচালনার দায়িত্ব নেন। 'নান্দীমুখ'-এ অজিতেশ অভিনীত পরিচালিত নাটক 'নানারঙের দিন', 'সওদাগরের নৌকা', 'শর আফগান' ও 'পাপপূণ্য' প্রভৃতি।

৯০.৮ সারাংশ

নতুন চিন্তাধারা নিয়ে বাংলা নাট্যজগতে গণনাট্য সংঘের আবির্ভাব। শৌখিন এবং পেশাদারী এই রীতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গণনাট্য সংঘ গণনাট্য আন্দোলনের রূপ নেয়। দেশব্যাপী ফ্যাসিবাদ, দুর্ভিক্ষ নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে সমকালীন ঘটনার প্রতিক্রিয়াকে মাথায় রেখে নতুন যুগের সূত্রপাত করে এই নাট্য সংস্থা। বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন', 'নবান্ন' এই জাতীয় আর কিছু নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে গণনাট্য সংঘ গণ আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপ দেয়। সমসাময়িক জীবনভাবনাকে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নিয়ে আসে। শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, উৎপল দত্ত প্রমুখদের চেষ্টায় বিভিন্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে, সামাজিক মূল্যবোধের স্বপক্ষে সমকালীন নানা সমস্যা শিল্পরূপ পায়। কিন্তু রাজনৈতিক বক্তব্য প্রাধান্য পাওয়ায়

জনমুখী চেতনার পরিবর্তে সাহিত্যমুখী চেতনাকে গুরুত্ব দিয়ে শম্ভু মিত্ররা গণনাট্য ভেঙে গড়ে তোলেন 'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠী। শুরু হয় নবনাট্য আন্দোলন। গুরুত্ব পায় রবীন্দ্রনাথ। গড়ে ওঠে সৎ নাট্য প্রচেষ্টা।

এল.টি.জি/পি.এল.টি 'বহুরূপী' থেকে স্বতন্ত্র পথে হেঁটেছে। দেশি-বিদেশি ক্লাসিক নাটক অভিনয় দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও, সবসময়ই এই গোষ্ঠীর নাট্যভাবনায় সমাজ-রাজনীতি ও নন্দন-তত্ত্বের বিষয়টি সদাজাগ্রত থেকেছে। উৎপল দত্তের বহুমুখী জ্ঞান, বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিত্ব তাঁর নাট্যপ্রযোজনায় সামগ্রিকতা এনেছে। যে নাটকে যে বক্তব্য উপস্থাপিত করেন, প্রযোজনার গুণে তা দর্শকের অন্তঃস্থলকে নাড়া দেয়। ধ্রুপদী নাটক থেকে তাঁর রচিত নাটকগুলির প্রযোজনা সে স্বাক্ষর বহন করছে।

এর পরে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে ভাল এবং বিদেশী নাটকের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে 'নান্দীকার' ও 'নান্দীমুখ'। এইভাবে নাট্য আন্দোলন নতুন মাত্রা পায়।

৯০.৯ অনুশীলনী ২

১। নিচের শূন্যস্থানগুলি যথার্থ শব্দযোগে পূরণ করুন।

(ক) ঢাকায় তরুণ লেখক —— হত্যা করা হয়।

(খ) বহুরূপী প্রায় —— বছর তার প্রভাব বজায় রেখেছিল।

(গ) নান্দীকার গোষ্ঠী —— গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকত না।

২। নীচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরের পাশে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) গণনাট্য সংঘের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয়—

(১) ১৯৪২ সালে

(২) ১৯৪৩ সালে

(৩) ১৯৪৪ সালে

(খ) 'জবানবন্দী' নাটকের লেখক—

(১) বিজন ভট্টাচার্য

(২) বিনয় ঘোষ

(৩) মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

(গ) কার নেতৃত্বে 'বহুরূপী' গড়ে ওঠে?

(১) সুধী প্রধান

(২) উৎপল দত্ত

(৩) শম্ভু মিত্র

(ঙ) 'চোপ আদালত চলছে' কার লেখা?

(১) ইবসেন

(২) বিজয় তেন্ডুলকার

(৩) সফোক্লিস

৩। উৎপল দত্ত পরিচালিত নাট্যসংস্থা এল.টি.জি ও পি.এল.টি.-র অবদান সংক্ষেপে লিখুন।

৪। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নান্দীকার' ছেড়ে 'নান্দীমুখ' গড়লেন কেন? 'নান্দীমুখ' প্রগ্রেসিভ দুটি নাটকের নাম উল্লেখ করুন।

৯০.১০ উত্তর-সংকেত

অনুশীলনী ১ :

১। (ক) খ (খ) ক (গ) ঙ (ঘ) গ (ঙ) ঘ

২। (ক) সাধারণ নাট্যশালার (খ) নতুন যুগের

(গ) সঙ্গীত সমাজ (ঘ) ঠাকুরদার

অনুশীলনী ২ :

১। (ক) সোমেন চন্দ (খ) পঁচিশ (গ) সংকীর্ণ

২। (ক) ২ (খ) ১ (গ) ৩ (ঘ) ২

৩। ও ৪। এর জন্য ১০৭-এর এল.টি.জি, পি.এল.টি, নান্দীকার, নান্দীমুখ প্রসঙ্গ একটু ভাল করে পড়ে উত্তর তৈরি করুন।

৯০.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১। বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস — ড. অজিত কুমার ঘোষ।

২। বাংলা নাট্যমঞ্চের রূপরেখা — ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

৩। বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক — ড. গীতা সেনগুপ্ত।

৪। রঙ্গামঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ — সমকালীন প্রতিক্রিয়া — রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী।

৫। বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার — সম্পাদনা : সুবীর রায়চৌধুরী।

৬। প্রসংগ : গণনাট্য — শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ই. বি. জি — ৬
বাংলা বিষয়ের ঐচ্ছিক পাঠক্রম

পর্যায়
২৪

একক ৯১ ❑ কাব্য ঃ গীতিকাব্য, আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য

গঠন

৯১.১ উদ্দেশ্য

৯১.২ প্রস্তাবনা

৯১.৩ কবিতার সংজ্ঞা; কবির প্রসঙ্গ

৯১.৪ কবিতার শ্রেণিবিভাগ ঃ মন্ময় ও তন্ময় কবিতা

৯১.৫ অনুশীলনী

৯১.৬ মন্ময় কবিতার পরিচয় ঃ গীতিকবিতা

৯১.৭ গীতিকবিতার শ্রেণিবিভাগ ঃ ভাবকেন্দ্রিক, রূপকেন্দ্রিক

৯১.৮ ভাবকেন্দ্রিক গীতিকবিতা

৯১.৯ রূপকেন্দ্রিক গীতিকবিতা

৯১.১০ অনুশীলনী

৯১.১১ তন্ময় কবিতার শ্রেণিবিভাগ

৯১.১২ আখ্যানকাব্য ঃ সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ ; উদাহরণ

৯১.১৩ অনুশীলনী

৯১.১৪ মহাকাব্য ; সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ ; উদাহরণ

৯১.১৫ সারাংশ

৯১.১৬ অনুশীলনী

৯১.১৭ গ্রন্থপঞ্জি

৯১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি সাধারণভাবে কবিতা, কবিতার নানা ভাব-কল্পনা এবং রূপ-প্রকরণ সম্পর্কে পরিচিত হতে পারবেন। এক দেশের কবিতা কিংবা এক রূপ-প্রকরণের কবিতা কিভাবে অন্য দেশের কবির কাছে গৃহীত-অনুসৃত-পরিবর্তিত হয়, সে বিষয়েও অবহিত হতে পারবেন।

৯১.২ প্রস্তাবনা

কবিতা বিশ্বব্যাপী মানবিক অনুভূতির চিরস্থায়ী প্রকাশ। সব শ্রেণির মানুষের মনের মধ্যেই কিছু না কিছু কবিতার প্রভাব থাকেই। এক-এক দেশের মানুষ এক-এক ভাবনা-ভঙ্গির মাধ্যমে সেটি প্রকাশ করে। এর মধ্যে কখনো প্রাধান্য পায় Object বা বিষয়, কখনো প্রাধান্য পায় Subject বা বিষয়ী অর্থাৎ ব্যক্তি। দেখা গেছে, একই দেশের এক-এক যুগে কবিতার একটি বিশেষ মূর্তি ধরা পড়ে,—কি ভাব বা বক্তব্যের দিক থেকে, কি রূপ-প্রকরণের দিক থেকে। কখনো দেখা দেয় কোনো আন্দোলনকে ভিত্তি করে কবিতা কোনো নতুনতর মূর্তি। এক দেশের সেই ভাবনা-প্রকরণের ঢেউ অন্য দেশের কবিকে স্পর্শ করে, সে দেশেও সে আন্দোলন প্রসারিত হয়। কখনো বা কোনো দেশের কোনো কবি স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে কিংবা নিজের প্রতিভার বিশেষত্ব অনুসারে কোনো নতুন ধারার প্রবর্তন করেন, অন্য দেশের কবি অবিকৃতভাবে সে ধারাকে গ্রহণ করেন কিংবা দেশ-কাল-কবির ভিন্নতার কারণে সে ধারার ঈষৎ পরিবর্তন-বিবর্তনও ঘটে। এই ভাবেই কবিতা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। পদ্যে বা গদ্যে, সমিল ও অমিল ছন্দে, কখনো বা নাটকের আভাসেও কবিতা রচিত হয়ে থাকে। কখনো বা হয় কবিতার ব্যঙ্গানুকৃতি। কখনো আকারে ছোট, কখনো বা বড়, কখনো বা কবিতার মাধ্যমে বলা হয় কথা-কাহিনী-গল্প। সেগুলি গাওয়াও হতে পারে। তবে, কবিতা সাধারণভাবে পড়াই হয়ে থাকে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে দীর্ঘাকার কবিতা সুদক্ষ কোনো পাঠক পড়তেন, অন্য সবাই তা শুনত। হ্রস্বাকার কবিতা এককভাবে নিজেই পড়া হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের করি ও কাব্য-সমালোচকগণ কবিতার রূপ ও স্বরূপ সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এর ফলে 'কাব্যশাস্ত্র' নামে একটি বিশিষ্ট শাস্ত্রই গড়ে উঠেছে। প্রাচীন গ্রিস এবং প্রাচীন ভারতের নাম এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

কবিতার এই বিচিত্র কথাই এই এককটির আলোচ্য।

৯১.৩ কবিতার সংজ্ঞা; কবির প্রসঙ্গ

কবি, রসিক, পণ্ডিতেরা নানাভাবে নিজের-নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে কবিতার সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। সেইসব সংজ্ঞার মধ্যে কোথাও আছে পরস্পরের সঙ্গে বিরোধ, আবার কোথাও বা সেই বিরোধকে অতিক্রম করে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্যও সৃষ্টি করা যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, প্রাচীন ও আধুনিকের প্রয়োজন ও মনোভাবের ভিন্নতা এখানে বিশেষভাবে কাজ করেছে।

এই সব বিরুদ্ধ চিন্তা-চেতনাকে সমন্বিত করে নিয়ে বলা যায় ঃ কবিতা হল—কবির সহৃদয় ও সত্য অনুভূতি, তাঁর ভাবনা-কল্পনা এবং উপযুক্ত শব্দ হয় উপমা-চিত্রকল্পের সম্মিলিত দিক। এই তিনটি দিকেরই

গুরুত্ব ও মর্যাদা সমান, তবে কোনো কোনো কবি এই সমন্বয় কর্মটি সর্বদা সার্থক রূপে করতে পারেন না বলেই সেখানে এসে পড়ে বিঘ্ন ও ব্যর্থতা। আমাদের এই তিনটি দিককে পৃথক এবং সমন্বিত—দু'দিক থেকেই বুঝে নিতে হবে।

কবি পার্সি বিস্ শেলী যখন বলেন, 'Poetry is the expression of imagination', তখন কেবল কল্পনাশক্তির কথাই তিনি বলেন না, তার expression অর্থাৎ প্রকাশকলার কথাও বলেন। আবার কবি উইলিয়ম ওয়ার্ডসওয়ার্থ যখন কাব্যের সংজ্ঞায় বলেন, 'Poetry is the breath and finer spirit of knowledge', তখন সে 'knowledge' বলতে তথাকথিত কোনো 'জ্ঞান' নয়, তা হল কবির সহৃদয়-জীবন-অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। আর তারই 'finer spirit' বা সূক্ষ্মতর সত্তার রসরূপ হল কবিতা। স্থূল, প্রত্যক্ষ এবং তৎক্ষণাৎ পাওয়া অভিজ্ঞতা নয়, তাকে থিতিয়ে পড়ার শান্ত হবার সময় দিতে হবে তবেই তা finer বা সূক্ষ্মতর হবে। 'finer' কথাটির যেমন সময়গত দিক আছে, তেমনি তার রূপগত দিকও আছে, একটি যথাযথ সার্থক ও উপযুক্ত রূপকের মাধ্যমে তার প্রকাশ হয়। এই 'finer spirit'-এর মাধ্যমে 'knowledge' নতুন মাত্রা লাভ করে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ এসে বললেন, ওই স্থূল-বাস্তব-প্রত্যক্ষ দিকটি হল—'তথ্য' মাত্র এবং 'finer spirit' -এ পরিণত হলেই তা হবে কাব্যের 'সত্য'। শেলীর 'imagination'. ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'finer spirit' আর রবীন্দ্রনাথের তথ্যের স্তর পেরিয়ে 'সত্যে'র স্তরে উত্তীর্ণ ভাবনার মধ্যে মূলত কোনোই ভেদ নেই। কবির সহৃদয় ও আন্তরিক ভাবনার মাধ্যমেই 'তথ্য' পরিণত হয় 'সত্যে'। 'সত্য' হল এক চিরন্তন অনুভূতি—কোনোদিন তার ক্ষয় নেই। এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ বলেন, বাস্তব জগৎ নয়, কবির মনোভূমি'-ই কাব্যের উৎস। 'চিত্র' ও 'সঙ্গীত'-কে রবীন্দ্রনাথ কাব্যের দুই প্রধান উপকরণ বলে মনে করেন। 'চিত্র' দেয় ভাবকে রূপ ও 'সঙ্গীত' দেয় ভাবকে গতি।

শেলীর 'expression' আর রবীন্দ্রনাথের 'প্রকাশকলা' স্বরূপের দিক থেকে এক। মনের সত্য ভাবনাকে প্রকাশ করতে হবে এবং সে প্রকাশকে যথার্থ ও উপযুক্ত হতে হবে। কাজেই নিছক প্রকাশ নয়—'প্রকাশকলা।' সংস্কৃতে এ জনেই কবিতাকে বলা হয়েছে 'কবিকর্ম'— অর্থাৎ কবিকৃত 'কর্ম'। কবিতার ইংরেজি প্রতিশব্দ হল—'Poem'। এই 'Poem'কথাটি এসেছে গ্রিক 'Peiema' থেকে। এর অর্থ হল, কিছু করা বা প্রস্তুত করা। এই সৃষ্টিকে নির্মাণ/প্রস্তুত করার মধ্যে ওই 'প্রকাশকলা' বা 'কবিকর্ম'-র দিকটিই আছে। অভিনবগুপ্ত 'ধ্বন্যালোক'-এর প্রথমেই কবির এই ক্ষমতাকে বলেছেন—"অপূর্ব বস্তু-নির্মাণ-ক্ষমাপ্রজ্ঞা"। কাব্যসংসারে কবিদের তাই বলা হয় প্রজাপতি ব্রহ্মা। তাহলে, এই 'প্রজ্ঞাই কি Knowledge? ঠিক তাই। আর শব্দ-ছন্দ-উপমা-চিত্রকল্প হল সেই প্রজ্ঞারই প্রকাশকলার দিক, সৃষ্টি-নির্মাণের দিক।

এই নির্মাণ-সৃষ্টির একটি বিশেষ দিক কবির 'কল্পনাশক্তি' বা Imagination, আজ আমরা যে এক বিশুদ্ধ ও উচ্চ কল্পনাশক্তির কথা ভাবি, তা স্যামুয়েল টেলর কোলরিজের অবদান। মধ্যযুগে Imagination

আখ্যাটির বদলে Fancy আখ্যাটিরই প্রচলন ছিল বেশি। কোলরিজ তাঁর 'Biographia Literaria' (১৮১৭) গ্রন্থের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে Fancy এবং Imagination-এর মধ্যে মাত্রাগত পার্থক্য করেছেন। কোলরিজের অন্বেষণের বিষয় ছিল—মানুষের 'সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব' ('Unified Personality'), এবং Imagination হল সেই 'সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব'কে অর্জন করবার উপায়। Imaginationহল— মানুষের Synthetic' এবং 'Magical' গুণ বা শক্তি। এই শক্তিই মানুষের বিভিন্ন Faculty (= কর্মশক্তি, দক্ষতা, মানসিক শক্তি)-র মধ্যে সমন্বয়ে সৃষ্টি করে সামগ্রিকতা বা অখণ্ডতা আনে। Fancy হল ওই Faculty-এর নিম্নস্তরের আর Imagination হল ওই Faculty -র উচ্চস্তরের দিক। খাঁটি Imagination কে তিনি Primary এবং Secondary–এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই Primary দিক হল—এক 'জীবন্ত সত্তা', যা Sensation এবং Perception-এর মধ্যস্থতা করে এবং এই Faculty-ই হল—Prime agent of all human perception, এই Faculty যে কোনো অনুভূতিশীল মানুষেরই থাকতে পারে। আর Imagination-এর Secondary দিক হল, Poetic imagination–তা প্রথম স্তরটিই একটি মাত্রাগত উচ্চতর দিক। অবশ্য ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর 'Poems' (১১৫) ভূমিকায় কোলরিজ থেকে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে Fancy একটি Creative Faculty এবং এর নিজস্ব নিয়ম-শৃঙ্খলা দ্বারা এটি পরিচালিত হয়। ইংরেজি এলিজাবেথীয় কাব্যসংস্কার অনুসারে কাব্য হল এক Divine বা স্বর্গীয় সামগ্রী, এর পেছনে কোনো যুক্তি নেই। এক 'Intuitive Perception' কবিকে যে অন্তর্দৃষ্টি দান করে তারই ফলে তিনি কবিতা রচনা করেন। কাজেই এলিজাবেথীয় যুগের Imagination-এর সঙ্গে কোলরিজের ধারণার বিশেষ পার্থক্য আছে।

Imagination সম্পর্কে শেকস্‌পীয়রের ধারণা 'A Midsummer Night's Dream' (পঞ্চম অঙ্ক/প্রথম দৃশ্য) নাটকে ব্যক্ত হয়েছে। কল্পনাশক্তির দ্বারাই কবিরা সবকিছুকে রূপ দেন এবং অস্তিত্বহীন বিষয়কে 'A local habitation and a name' দিয়ে স্পষ্টতর করে তোলেন। 'কল্পনা' নামে একটি সনেটে মাইকেল মধুসূদন দত্ত সেই অর্থেই একে গ্রহণ করেছেন। তাঁর 'কবি' নামে সনেটটিও এ প্রসঙ্গে পঠিতব্য।

কবিতার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নিয়ে সব দেশের সমালোচকগণ লেখনী চালনা করেছেন। কবিতার দুটি অর্থ ঃ আক্ষরিক ও ব্যাচ্যার্থ, অন্যটি সেই বাচ্যার্থ পেরিয়ে এক ব্যঞ্জিত অর্থময় ব্যঙ্গার্থ। 'কাব্যজিজ্ঞাসা' বইতে অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন, "যেখানে কাব্যের অর্থ ও শব্দ নিজেদের প্রাধান্য পরিত্যাগ করে ব্যঞ্জিত অর্থকে প্রকাশ করে, পণ্ডিতেরা তাকেই ধ্বনি বলেছেন।.....এই ধ্বনি বা ব্যঙ্গ হচ্ছে কাব্যের আত্মা, তার সারবস্তু।' এর কিছু পরে তিনি লিখেছেন."".....কাব্যের আত্মা হচ্ছে তার বাচ্য নয়, ব্যঞ্জনা, কথা নয় 'ধ্বনি'— এ ব্যঞ্জনা কিসের ব্যঞ্জনা, এ ধ্বনি কিসের ধ্বনি? ধ্বনিবাদীদের উত্তর—'রস-এর।"

কিছু রসই কাব্যের শেষতম লক্ষ্য নয়। যদিও কবি ভারতচন্দ্র বলে গেছেন,—'যে হৌক, সে হৌক ভাষা, কাব্যরস ল'য়ে।' রসকে ভিত্তি করে আসে 'আনন্দ',—এই 'আনন্দ'ই কাব্যের শেষ লক্ষ্য। এর আগে আলোচনা করেছি, কবির সৃষ্টির দিক থেকে। এবার সেই কবিতার পাঠকের প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে প্রসঙ্গটিকে লক্ষ্য করছি। কবির সৃষ্টি এবং পাঠকের প্রতিক্রিয়া—এই দু'দিক থেকেই সমগ্র ব্যাপারটি বিচার্য। 'কাব্যলোক' বইটিতে ড. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত বিষয়টির সুন্দর পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিকোণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—দু'দিকেই প্রসারিত। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁর 'সাহিত্যদর্পণ'- এর প্রথম দিকেই কাব্যের যে বহুপ্রচারিত সংজ্ঞাটি দিয়েছেন—'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্',— যার বাংলা অর্থ সকলেরই জানা, ড. দাশগুপ্ত তার বাংলা অনুবাদ করেছেন এই বলেঃ "আনন্দময় বাক্যই কাব্য।" অর্থাৎ 'রস'-এর বদলে তিনি সচেতনভাবে 'আনন্দ' শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। কেন? 'আনন্দ'-এর প্রতিশব্দ রূপে হ্লাদ, আহ্লাদ, নির্বৃতি, চমৎকার প্রভৃতি শব্দ মেলে। আহ্লাদের প্রসঙ্গে 'লোকোত্ত আহ্লাদ'-এর কথাও বলা হয়েছে। 'রস' ও 'আনন্দ'-এর মধ্যে পার্থক্য হল,—রস আস্বাদন করতে হয় এবং তারই ফলে 'আনন্দে'র প্রকাশ ঘটে। "আনন্দ ঊর্ধ্বে বর্তমান, তাহা শব্দার্থজাত ভাব পরিচ্ছিন্ন হইলে রস হয়।" অর্থাৎ 'ভাব' (এখানে শব্দার্থের বিশিষ্ট দিক) পরিষ্কৃত হয়ে যেমন 'রসে' পরিণত হয়। 'ভাবতন্ময় চিত্তে আনন্দের প্রতিফলন বা প্রকাশই রস।" পাশ্চাত্য সমালোচকদের কেউ কেউ এই কাব্যানন্দকে 'Delight' বা 'Pleasure' বলেছেন। কিন্তু বেনদেত্তো ক্রোচে একে বলেছেন—'Pure Poetic Joy', কবি কীটস্‌ও বলেছেন, 'A thing of beauty is a joy for ever'। ড. দাশগুপ্তের মতে, ভারতীয় 'আনন্দ'-এরই সমার্থক হল 'Joy'।

রবীন্দ্রনাথ কীটস্‌-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, 'আনন্দ' এবং 'Joy' কে তিনিও সমার্থক বলে মানেন। তবে তাঁর নিজস্ব চিন্তার আলোকে তা গ্রহণ করেছেন। ড. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত সুন্দরভাবে লিখেছেন ঃ 'কাব্য শ্রবণ ও অভিনয় দর্শন তখনই সত্য ও সার্থক বলিয়া মনে হইবে, যখন তাহা চিৎ ও আনন্দস্বরূপের ভাঙিয়া দিয়া সত্ত্বগুণময় চিত্তে (ভারতীয় দর্শনে আত্মার 'সত্ত্বগুণময় ধর্মে'র অর্থ হল— আত্মার প্রকাশশীলতা) তাহার প্রকাশ ঘটাইবে। এই প্রকাশই আত্মোপল বা আনন্দোপলধি। কাব্যের মহান লক্ষ হইতেছে শব্দার্থের আশ্রয়ে এই আনন্দের প্রকাশ।"

কাব্যের সঙ্গে নীতি ও উপদেশের প্রসঙ্গটির কথাও বহুলাংশে বলা হয়। কখনো সরাসরি কখনো 'কান্তাসম্মিত' উপায়ে সেই নীতি উপদেশ প্রদানের কথা বলা হয়েছে। সাহিত্যের রস এবং উদ্দেশ্যকে ক্ষুণ্ণ না করে সুনীতিকে সাহিত্যে প্রশয় দানের কথা বঙ্কিমচন্দ্রও বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, কবিরা নীতিব্যাখ্যার দ্বারা শিক্ষা দেন না। "তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।" এই 'চিত্তশুদ্ধি'-কে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের লক্ষ্য বলে মানেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু 'নীতি' নয়, 'মঙ্গল'-কে স্বীকার করেন। গানে বলেন, 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য-সুন্দর"। সত্য ও সুন্দরের

অবস্থান, তাঁর মতে, একই সঙ্গে আনন্দলোকে এবং মঙ্গালালোকে। এইভাবে তিনি আনন্দ ও মঙ্গালের মধ্যে সমীকরণ করেছেন। মঙ্গালের জন্য যে দুঃখ-স্বীকরণ, তাই তাঁর কাছে আনন্দ। এইভাবে 'দুঃখ-এর প্রসঙ্গটিও এখানে এসে গেছে।

সমালোচকগণ, পন্ডিতগণ, এমনকি কবি-শিল্পীরাও যতভাবেই কবিতার সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করুন না কেন, শেষ পর্যন্ত কবিতার সংজ্ঞা বোধ হয় চির-অসম্পূর্ণই থেকে যায়। খাঁটি ও অকৃত্রিম কবিতার সংজ্ঞা বোধ হয় কোনোদিনই দেওয়া যাবে না। কেউ যেমন জোর করে ফুল ফোটাতে পারে না, তেমনি কবিতা রচনা বা তার প্রক্রিয়া-প্রকরণও কেউ শিখিয়ে দিতে পারে না। অথচ, যে পারে সে কত সহজেই তা পারে। রবীন্দ্রনাথের বাণী মনে পড়ে ঃ

যে পারে সে আপনি পারে
পারে সে ফুল ফোটাতে
সে শুধু চায় নয়ন মেলে
দুটি চোখের কিরণ ফেলে,
অমনি যেন পূর্ণ প্রাণের
মন্ত্র লাগে বোঁটাতে।
যে পারে সে আপনি পারে,
পারে সে ফুল ফোটাতে।

— 'ফুল ফোটানো' ঃ খেয়া

৯১.৪ কবিতার শ্রেণিবিভাগ ঃ মন্ময় ও তন্ময় কবিতা

'Object' বা বস্তুকে দেখা যেতে পারে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঃ এক, বস্তুকে বস্তুরূপেই রেখে, তার নিজ স্বরূপকে বিকৃত না করে। দুই, সেই বস্তুকে যিনি দেখছেন, অনুভব করছেন, তিনি তাঁর নিজের ভাব ও ব্যক্তিত্বটি দিয়ে সেই বস্তুকে রাঙিয়ে নিচ্ছেন, তাকে পরিবর্তিত করে স্রষ্টার নিজ ভাব-ব্যক্তিত্বটিই যেখানে বস্তুকে ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠছে, সেখানে বস্তুটি হয়ে যাচ্ছে ভাব বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কবিতার বিষয়ের মধ্যেও এই পার্থক্যটি দেখা যাবে। কবিতার বিষয়টিই যেখানে স্পষ্ট ও প্রধান হয়ে যায় সেখানে কবিতা হবে বিষয়মুখ্য অর্থাৎ কবিতা হবে Objective। এই কবিতার নাম—'তন্ময় কবিতা'। 'তন্ময়' অর্থ—'তদগত চিত্ত' অর্থাৎ চিত্ত যখন তদ্বিষয়ে একান্ত স্থিত।

আর 'মন্ময় কবিতা' হল— ঠিক এরই বিপরীত। বিষয় নয়, 'বিষয়ী' যেখানে মুখ্য বা প্রধান। বস্তু নয়, Object নয়, Subject অর্থাৎ ব্যক্তিই যেখানে প্রধান। কবিতার বিষয় যখন আত্মগত, ব্যক্তিকেন্দ্রিক—

ব্যক্তির নিজস্ব ভাবকেন্দ্রিকতা যখন বস্তুকে ছাপিয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ একেই বলবেন, পান্না নিজস্ব রঙে সবুজ নয়, কবির চেতনার রঙে তা সবুজ হয়ে ওঠে। এই কবিতার নাম Subjective কবিতা। বাঙলায় বলা যায়—ব্যক্তিকেন্দ্রিক কবিতা।

কবিতার ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রারম্ভিক যুগে ব্যক্তির চেয়ে বস্তুই প্রাধান্য অর্জন করেছে অধিক। ক্রমে ইতিহাসের নানা পথ বেয়ে বস্তুর চেয়ে ব্যক্তির প্রাধান্যই সূচিত হয়েছে। আসলে প্রাথমিক যুগে মানুষ ছিল গোষ্ঠীবদ্ধ জীব। সেই গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের দৃষ্টিকোণ ছিল একতাবদ্ধ, বস্তুপ্রধান দৃষ্টিকোণ। একক মানুষের ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিভাবনা সাধারণ ভাবেই তখন ছিল উপেক্ষিত। গোষ্ঠী ভেঙে যখন ব্যক্তির মূল্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখনই এসেছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবনা এবং ব্যক্তিত্বের দিক। এইখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় আর একটি কথাঃ ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণে বা ব্যক্তিক ভাবনার প্রাধান্যের দিক প্রতিষ্ঠিত হলেও বস্তুপ্রধান দৃষ্টিকোণ কিন্তু অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। দুটি দৃষ্টিকোণই সাহিত্যের নানা রুপ ও শাখার মধ্যে সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত হয়ে এসেছে। এখানে কেবল আপেক্ষিক প্রাধান্যের কথা বলা হল। সাহিত্যের নানা Form বা রুপ প্রচলিত হবার পর কোনো-কোনো ক্ষেত্রে কেবল বস্তুপ্রধান বা কেবল ব্যক্তিপ্রধান দৃষ্টিকোণ যেন সেই-সেই রুপ বা Form এর পক্ষে আবশ্যকীয় হয়ে ওঠে। যেমন Classical ও Romantic দৃষ্টিকোণ। দেখা গেছে, ক্লাসিক কাব্যের মধ্যেও কখনো-কখনো রোমান্টিক দৃষ্টিকোণের সঞ্চরণ ঘটেছে। বিভিন্ন ও বিচিত্র দৃষ্টিকোণের সংমিশ্রণ যে কোনো দেশেরই সাহিত্যের এক সাধারণ লক্ষণ।

সংস্কৃত রীতি অনুসারে কাব্যকে বস্তু ও ব্যক্তির ভাবগত প্রাধান্যের আলোকে বিচার করা হয়নি। সেখানে প্রয়োগ বা ব্যবহারের দিক থেকে কাব্যের শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। সংস্কৃত রীতিতে কাব্য দুই প্রকারের ঃ শ্রব্য ও দৃশ্য। যা কেবল শোনা হয়, তা শ্রব্যকাব্য। আর যা শোনা না হলেও অভিনয়ের সময়ে দৃষ্ট হয়, তা দৃশ্যকাব্য। 'কাব্য' অভিধাটির এই ব্যাপক সংজ্ঞা এখানে লক্ষ্য করা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু বাঙালি লেখক-সমালোচক 'নাটক'-কে তাই কাব্যও বলেছেন। স্বয়ং মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকটি 'কাব্য' বলে অভিহিত করেছেন। এই অর্থেই নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে 'মহাকবি' বল হতো। 'শ্রব্যকাব্য' এই অভিধাটির মধ্যে আর একটি দিক আছে ঃ যেন পাঠক নিজে নন, আর কেউ একজন পাঠক তাঁকে তা পড়ে শোনাচ্ছেন। অবশ্য নিজেই নিজেকে পড়ে শোনানোর দিকটি কিন্তু এই ব্যখায় অস্বীকার করা হচ্ছে না। শুধু এইটুকু বলা হচ্ছে,—যেমন পাত্র-পাত্রীরা অভিনয় করে 'দৃশ্যকাব্য' ব্যাপারটিকে দর্শকের কাছে তুলে ধরেছেন, একজন পাঠকও তেমনই শ্রোতার কাছে 'শ্রব্যকাব্য' ব্যাপারটিকে রুপদান করছেন। এ জন্যেই বলা হল,— সংস্কৃতে কাব্যকে প্রয়োগ ও ব্যবহারের দিক থেকে বিভক্ত করা হয়েছে, পাশ্চাত্য ভাবনায় তেমনি কাব্যকে বিভক্ত করা হয়েছে ব্যক্তি ও বিষয়ের আপেক্ষিক প্রাধান্যের দিক থেকে।

তবে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে শ্রব্যকাব্যকে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও কোষকাব্য। দীর্ঘাকার কাব্য মহাকাব্য, স্বল্পদীর্ঘাকার কাব্য খণ্ডকাব্য। এখানে আকারকে অবলম্বন করে বিভাগ করা হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালিরা ক্ষুদ্রায়তন কবিতাকে (যা আসলে 'গীতিকবিতা') বলতেন 'খণ্ডকবিতা'— যেমন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কৃতে তেমনি গদ্যরূপ ও পদ্যরূপের মিশ্রণের ফলজাত কবিতাকে বলা হত 'চম্পূকাব্য'। 'কোশ' বা 'কোষ' শব্দের অর্থ হল—আধার, পাত্র। 'কোষকাব্যে'র অর্থ হল—বিভিন্ন কবিতাযুক্ত কাব্যগ্রন্থ। কাজেই দেখা যায়—নানা দৃষ্টিকোণ থেকে কাব্যকে বিভক্ত করা হয়েছে। বস্তু ও ব্যক্তিকে ভিত্তি করে বিভাগ-কল্পনা তার মধ্যে একটি।

৯১.৫ অনুশীলনী

(ক) নীচে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(১) কবি শেলীর অনুসরণে কাব্যের সংজ্ঞা দিন।

(২) কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের অনুসরণে কাব্যের সংজ্ঞা দিন।

(৩) রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে কাব্যের দুই প্রধান উপকরণের নাম বলুন এবং সে দু'টির ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

(৪) 'Poem' শব্দের উদ্ভব ও অর্থ সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

(৫) 'Imagination' সম্পর্কে শেকস্‌পীয়ার তাঁর কোন্ নাটকে মন্তব্য করেছেন এবং কী মন্তব্য করেছেন?

(৬) 'রস' বা 'আনন্দ'—কাব্যের শেষ লক্ষ্য কী?

(৭) কবিতা রচনা সম্পর্কে 'ফুল ফোটানো' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন, তা নিজের ভাষায় বলুন।

(খ) নীচে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির বিশদ ও বিস্তৃত আলোচনা করুন ঃ

(১) কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শেলী-কথিত 'Expression' ওয়ার্ডসওয়ার্থ কথিত 'Finer Spirit' ও 'Knowledge' এবং রবীন্দ্রনাথ কথিত 'প্রকাশকলা' ও 'সত্য'-এর মধ্যে কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় কি?

(২) কবি কোলরিজের অনুসরণে 'Imagination' বা কল্পনাশক্তি সম্পর্কে নিজের ভাষায় আলোচনা করুন।

(৩) 'আনন্দলোকে মঙ্গালালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর'— রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই পঙ্‌ক্তি অবলম্বন করে কবিতার সঙ্গে 'আনন্দ' ও 'মঙ্গালে'-এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

(৪) 'Objective' ও 'Subjective' কবিতা বলতে কী বোঝেন?

(৫) কবিতার বিভাগ সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রীতির তুলনা করুন।

৯১.৬ মন্ময় কবিতার পরিচয় ঃ গীতিকবিতা

বর্হিজগৎকে বা বস্তুবিশ্বকে দু'ভাগে কবি-শিল্পীরা গ্রহণ করেন। কিছু পূর্বেই তার আলোচনা করা হয়েছে। আপন মনের রঙ ও নিজস্বতা দিয়ে যখন সেই দর্শন ও প্রদর্শণ এবং তারই ফলে সেই দৃষ্টিকোণের প্রতিফলন ঘটে যে কাব্য-কবিতায়, সেই রচনাকেই বলা যায় মন্ময় কবিতা। এখানে স্রষ্টার মন ও নিজের ব্যক্তিত্বটিই প্রধান বা মুখ্য—বস্তু বা বিশ্বের নিজস্ব স্বরুপ নয়। অনুভূতি যখন খুব তীব্র-তীক্ষ্ণ ও নিবিড় হয় তখনই এ ধরনের কবিতা রচিত হতে পারে। কাজেই স্রষ্টার ও শিল্পীর অনুভূতির তীব্রতা ও নিবিড়তাই এ জাতীয় কবিতার মূল উৎস ও উপকরণ। সেই তীব্র অনুভূতিটি হবে নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্যাভিমুখী, লক্ষ্য-বিচ্যুতি ঘটলেই তার শিল্পগত সাফল্যও হবে বিঘ্নিত। আবার, যেহেতু ওই অনুভূতি তীব্র-তীক্ষ্ম, সেই হেতু তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না, তার প্রকাশও স্বল্পায়তন রুপের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন,"একটুখানির মধ্যে একটিমাত্র ভাবের বিকাশ!" রবীন্দ্রনাথ নিজে কবি বলেই এত সহজে এবং এত সুন্দর করে এ জাতীয় কবিতার স্বরুপ নির্দেশ করতে পেরেছেন। এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ আরও একটি গুরুত্বর্ণ কথা বলেছেন ঃ "আমাদের মনের বহুদিনের অব্যক্ত ভাবের একটি কোনো সুযোগ আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া ওঠা।" ধরা যাক কোনো বর্ষা বা বসন্তের বিশেষ দিনে বা ক্ষণে। যে কথা কোনো দিন বলা হয়নি, যে কথা অব্যক্ত ছিল মনের গহনে, রবীন্দ্রনাথ সেই ভাব ও ভাবনাকে বিশেষ ধরনের কাব্য-কবিতা বলেন, যা একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির নিবিড় প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তার মধ্যে দুটি দিক আছে ঃ রুপের দিক থেকে তা 'একটুখানি,' আর ভাবের দিক থেকে 'বহুদিনের অব্যক্ত ভাবে' এবং একটিমাত্র ভাবে'র প্রকাশ। ভাব ও রুপ—দু'দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গটিকে দেখেছেন। যেহেতু তা আয়তনে স্বল্প, যেহেতু তা ব্যক্তিগত একটি নিষ্ঠাময় অনুভূতি, সেই হেতু সহজেই তার মধ্যে এসে পড়ে সঙ্গীতের সৌকুমার্য ও সুষমা।

এই ধরনের কবিতাই 'গীতিকবিতা'। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পীরা বলতেন—'গীতিকাব্য' বা 'খণ্ডকবিতা'। অভিধাটি মূলত পাশ্চাত্য Lyric শব্দের বঙ্গানুবাদ। একথা আজ সকলেরই জানা যে lyre (lyra) বা বীণাজতীয় একপ্রকার যন্ত্রসহযোগে যে গান গাওয়া হত, গ্রীকরা তাকেই বলত—lyric। এই গানের অনুষঙ্গেই এসেছে 'গীতিকাব্য' বা 'গীতিকবিতা' অভিধাটি। তবে শিথিল অর্থে। এখন যে সব কবিতা আর গাওয়া হয় না, কিন্তু গানের সুষমা-মাধুর্য যে সব কবিতায় বিদ্যমান,

তাই হয়ে গেছে 'গীতিকবিতা'। তবে অনেক গান কবিতারূপেও পাঠ্য এবং পাঠ্য কবিতা গীতিরূপে গেয়। এর বিশিষ্ট উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ। তাঁর অনেক কাব্যগ্রন্থেই একটি-দুটি করে এমন কবিতা মেলে, যা গান। এসব রচনায় রবীন্দ্রনাথ গান ও কবিতার ভেদরেখা মুছে দিয়েছেন। গান ও কবিতার রচনারীতির মধ্যে তফাৎ আছে, কয়েকটি বিশেষ নিয়ম-নীতি-শৃঙ্খলাকে অনুসরণ করে গান লিখতে হয়। কবিতার ক্ষেত্রে সে সব কোনো বাঁধা নিয়ম-শৃঙ্খলা নেই। তবে এখানেও রবীন্দ্রনাথ নিজ-নিয়মের অনুসরণ করেছেন। অনেক সনেট কবিতাকে (যেমন, 'তবু মনে রেখো.....') তিনি গানে রূপ দিয়েছেন।

'গীতিকবিতা' কোনো একক ব্যক্তিত্বের চিন্তা ও অনুভূতি বটে, কিন্তু তা কবিরই হতে হবে, তা নয়। এখানেই অনেকে একটি ভুল করে বসেন। অনেকেই মনে করেন, গীতিকবিতা মাত্রই কবিরই ব্যক্তিগত জীবনের কথা বা অভিজ্ঞতা। সেটা অনেক সময় সত্য বটে কিন্তু সর্বদা নয়। কোনো বিষয়কে কবি আপনার ব্যক্তিগত ভাব-কল্পনা দিয়ে যখন একান্ত করে নিজের করে নেন, বিষয় এবং ব্যক্তি যখন অভিন্ন হয়ে যায়, সেই মানসিক অবস্থাই গীতিকবিতার উৎস। কাজেই মূল কথা হল—কবির নিজের ব্যক্তিজীবন নয়; কিন্তু ব্যক্তিত্ব দিয়ে কোনো ভাবনা যখন একান্ত ভাবে তাঁরই হয়ে ওঠে, সেই অবস্থাটিই এখানে আমাদের মূল লক্ষ্য। আসল কথা, কবির নিজের দৃষ্টিকোণ,—যে দৃষ্টিকোণে জারিত হয়ে কোনো ভাবনা তাঁর ব্যক্তিক ভাবনাতেই পরিণত হয়ে ওঠে।

যেমন ধরা যাক—মধ্যযুগের বৈষ্ণব বা শাক্ত পদাবলী। বিষয়ের দিক থেকে এ দুটি ক্ষেত্রের বিষয় কবিদের নিজস্ব বিষয় নয়। রাধা-কৃষ্ণ বা শ্যামা-উমার বিষয় দুটি—দুটি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর বিশ্বাসের বিষয়। কিন্তু তথাপি কবিতে-কবিতে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে, আর সেই পার্থক্যের ফলেই এই দুটি সম্প্রদায়গত বিশ্বাস অনেক খাঁটি গীতিকবিতার জন্ম দিয়েছে। এই কারণেই দেখা যায় বিদ্যাপতি রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলার যে-অংশে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন ও শ্রেষ্ঠ কবি হন, চণ্ডীদাস ঠিক সেই-সেই ক্ষেত্রে ততখানি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন না। তাঁর ক্ষেত্র পূর্বরাগ কিংবা আক্ষেপানুরাগ। একই কথা রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত সম্পর্কেও সত্য। কাজেই, বিষয় এক হওয়া সত্ত্বেও, বিষয়ীর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে, সে প্রসঙ্গটিকে একান্ত নিজের করে নেবার মধ্যেই গীতিকবিতার ব্যক্তিগত দিক নিহিত থাকে। নিছক ব্যক্তিগত দিক এখানে বড়ো কথা নয়। অনেকে কবির রচনায় কবি ব্যক্তিজীবনের অন্বেষণ করেন, হয়তো কখনো তা কিছু পরিমাণে মেলেও, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাবধানবাণী—কবির জীবনচরিত এবং তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি সম্পূর্ণই ভিন্ন। যে মাইকেল ব্যক্তিজীবনে কিছু অমিতচারী, সাহিত্যের মধ্যে তিনিই মিতাচারের সংযমকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই জন্যেই গীতিকাব্যের মূল ভাবনা কবির নিজের জীবনের কথা সর্বত্র প্রাধান্য পায় না। আসলে বিষয়কে তিনি কতোখানি নিজস্ব করে নিতে পারেন—সেটাই বড়ো কথা।

গীতিকবিতাকে রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন কোনো অব্যক্ত ভাববেদনাকে "একটি কোনো সুযোগ আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া ওঠা", সে কথাটি ভেবে দেখবার মতো। রবীন্দ্রনাথেরই গানের কলি—"তুমি হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন।" এ যেন আকস্মিক মুহূর্তের অপ্রত্যাশিত প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথেরই একটি গানের বিষয়ঃ গেল কাল রাতের বেলায় তাঁর মনে গান এসেছিল, প্রেমিকা তখন উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু আজ প্রেমিকা উপস্থিত, কিন্তু গান এলো না। এই যে বিশেষ মূহূর্তের এক মূল্যবান অভিজ্ঞতার প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথ গীতিকবিতার উৎসারণের জন্য তাকে একটি বড়ো দিক বলে মানেন।

গীতিকবিতার 'ভাব' ও 'রুপ'-এর কথা বিবেচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র এর মধ্যে কোনো জাতির জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় অন্বেষণ করেছেন। বাঙালির জাতীয় জীবনে কোনো ব্যাপক-গভীর আলোড়ন-আন্দোলন নেই, জীবনের মধ্যে এমন কোনো দুরূহ সমস্যার প্রবর্তন নেই, যা তাকে কোনো মহৎকাব্যের প্রেরণা দিতে পারে। বাঙালির জীবনের ছোট ছোট ভাব ও ছোট ছোট সমস্যা গীতিকাব্যেরই উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করেছে, সেইজন্য গীতিকাব্যের এত প্রাচুর্য এ দেশে দেখা যায়। বঙ্কিমের এই মন্তব্যকে গীতিকাব্যের এক বিশ্বব্যপী লক্ষণ বলে মেনে নেওয়া যায় না। কেননা, পৃথিবীর যে দেশে কাব্য-কবিতার অন্যান্য শাখার নিখুঁত বৈচিত্র্য দেখা যায়, সে সব দেশে গীতিকাব্যও সাফল্যের সঙ্গে রচিত হয়েছে। বাঙলার জল-হাওয়া এবং বাঙালির খাদ্যাভাস গীতিকাব্য রচনার অনুকূল— এ কথাও সর্বদা গ্রহণীয় নয়। গীতিকাব্য হল একটি বিশেষ জীবনভাবনা ও জীবন দৃষ্টিকোণের প্রকাশ তার সঙ্গে সে দেশের নৈসর্গিক ও ভৌগোলিক যোগাযোগ থাকতেই পারে, —কিন্তু সেই নৈসর্গিক পরিবেশজাত বিশেষ ধরনের জলবায়ু গীতিকবিতার প্রাচুর্যের কারণ হবে—এসব তত্ত্বের সর্বজনীনতা সম্পর্কে সন্দেহ হয়।

তবে নিসর্গজগৎ যে গীতিকবিতা রচনার একটি অনুকূল পরিবেশ রচনা করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে, নিসর্গ যদি নিছক নিসর্গই থেকে যায়, তবে সে নিসর্গ গীতিকবিতার অনুকূল অবশ্যই হবে না। নিগর্স যখন একটি বিশিষ্ট অনুভবের দ্বারা রঞ্জিত হয়ে একটি বাণীরুপে কবির দিকে এগিয়ে আসবে এবং কবির দিক থেকেও একটি বাণী হয়ে নিসর্গের দিকে এগিয়ে যাবে, তখন এই দুই দিকের মিলিত সত্তা এক রোমান্টিক ভাবসত্তা হয়ে গীতিকবিতার জন্ম দিতে পারে। অবশ্য, এটিকে নির্মাণভিত্তিক গীতিকবিতা কেউ যদি বলেন, তবে আপত্তির কিছু নেই। শুধু আমাদের বক্তব্য এই ঃ নিসর্গ এবং কবিহৃদয়ের সম্মিলনের ফলে কবি যে-এক বিশেষ উপলব্ধির জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁর সেই উপলব্ধির জগৎই অন্যান্য নানা বিচিত্র বিষয়কে আশ্রয় করে খাঁটি গীতিকবিতার সৃষ্টি করে। নিসর্গের অন্তর্নিহিত রহস্যময় শক্তিই কবির নিজের অন্তরের রহস্যকে অন্বেষণ করতে ব্যাপৃত করে।

আকারে ছোট, কিন্তু প্রকারে গভীর,—গীতিকবিতার এই বিশেষত্বের কথা অনেকেই বলবেন। সেই গভীরতাকে ব্যক্ত করতে চাই উপযুক্ত শব্দ-শিল্প, ছন্দের যথার্থ প্রয়োগ, চিত্র ও চিত্রকল্পের যোজনা।

আধুনিক গীতিকবিতার একটি বড়ো লক্ষণই হল—চিত্রকল্পের যোজনা। তবে সেই চিত্রকল্পকে হতে হবে সামগ্রিক ও অখণ্ড, যাতে সমগ্র কবিতাটি তার দ্বারা উদ্ভাসিত ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

পৃথিবীর প্রাচীনতম লিরিক বা গীতিকবিতার নিদর্শন মিলেছে ইজিপ্টের পিরামিডের গাত্রে উৎকীর্ণ কবিতারূপে (খ্রি.পূ. ২৬০০ আব্দে)। এসব লিরিক হয় শোককাব্য, নয় কোনো মৃত রাজার প্রশস্তিগীতি, কিংবা কোনো দেবতার আবাহনী গীতি। এরপর পাওয়া গেছে মেষপালক ও জালিকগণের গীতি, সমাধিস্তরে উৎকীর্ণ কিছু লিপি। গ্রিকরা লিখেছেন হিব্রু ভাষায় গীতিকবিতা। ইজিপশীয়, হিব্রু এবং গ্রিক লিরিকের মূল উৎস ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি। খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর পুর্বে খাঁটি লিরিক কবিতার উদ্ভব ঘটেনি। এই সময় থেকেই বিষয়কে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণের পার্থক্য রচিত হয়। পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রিসে Pindar প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গীতিকবির আবির্ভাব ঘটে। ইসকাইলাস, সোফোক্লিস এবং ইউরিপিদিস প্রভৃতি নাট্যকারেরা তাঁদের নাটকের অন্তর্গত কোরাস-গীতি রূপে ভালো গীতিকাবিতাধর্মী কিছু লেখা লিখেছিলেন।

রোমান গীতিকবিরা ব্যক্তিময়তা ও আত্মজীবনকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে আছেন—ওভিদ, ভার্জিল প্রভৃতি। ৩০০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীকালে মধ্যযুগীয় লাতিন কবিরা গীতিকবিতার বিষয়গত বৈচিত্র্যের প্রবর্তন ঘঠালেন, প্রকরণগত দক্ষতারও প্রমাণ দিলেন। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর 'চার্চ লিরিক' ও উল্লেখযোগ্য। খ্রিস্টীয় ৩০০ থেকে ১৩০০ পর্যন্ত কালপর্বে চিন, জাপান, পারস্য প্রভৃতি দেশে গীতিকবিতার বিশেষ বিকাশ ঘটে।

অন্ত্য-মধ্যযুগে নানা অভিধায় গীতিকবিতার নিদর্শন মেলে। এসব গতিকবিতার সঙ্গে নৃত্য ও গীত হত। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে বহু ভক্তিমূলক গীতিকবিতা পাওয়া গেছে। এই পর্বের বেশির ভাগ ইউরোপীয় গীতিকবিতাই পড়বার জন্য রচিত হয়েছে। গীতিকবিতার ঐশ্বর্যের যুগ হল—রেনেসাঁসের যুগ। ইটালির পেত্রার্ক প্রমুখ কবিরা সনেট্ কবিতায় বিশেষ দক্ষতা দেখান ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে Restoration যুগের মধ্যে প্রচুর গীতিকবিতা লিখিত হয়, যাঁদের মধ্যে আছেন স্পেনসার, শেকস্পীয়ার, জন মিলটন, ডন প্রভৃতি কবিরা।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে তেমন কোনো প্রতিভাধর গীতিকবি নেই। কিন্তু এই শতাব্দীর শেষে এবং রোমান্টিক যুগে গোটা ইউরোপ জুড়ে গীতিকবিতার ব্যাপক উদভাস লক্ষিত হয়। যেমন ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে বার্নস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ব্লেক, কোলরিজ, বাইরন, শেলী, কীটস, জার্মানীতে গ্যেটে, শিলার, ফ্রান্সে ভিক্তর উগো প্রমুখ, রাশিয়াতে পুশকিন। গোটা ঊনবিংশ শতকে এই কাব্যরূপটি বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। ইংরেজ কবিদের মধ্যে টেনিসন, ব্রাউনিং, সুইনবার্ন, ম্যাথু আর্নল্ড, হপকিন্স। এছাড়া আছেন আরো অপ্রধান ও গৌণ কবি। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্সের প্রুধোঁ বোদ্‌লেয়ার প্রভৃতিরা উল্লেখযোগ্য গীতিকবি। বোদ্‌লেয়ার সাঙ্কেতিক কবিতার অগ্রদূত। অন্য সাঙ্কেতিক কবি মালার্মে প্রভৃতি। ঊনবিংশ

শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে এবং আমেরিকার প্রায় সমস্ত প্রধান কবিই গীতিকবিতা রচনা করেছেন, যেমন ডব্লু. বি. য়েট্‌স্, এজরা পাউণ্ড, টি. এস. এলিয়ট, ডব্লু. এইচ. অডেন প্রভৃতি। জার্মান কবিদের মধ্যে আছেন রাইনের মরিয়া রিল্‌কে, হাইনরিশ হাইনে।

বাংলা গীতিকাব্যের উদ্ভব এবং তার স্রষ্টা কবিদের কথা এখানে অপরিহার্যভাবে এসে পড়ে। সাধারণ বিশ্বাস, পাশ্চত্য গীতিকাব্যের প্রভাবেই বাংলা গীতিকবিতার সূচনা হয়। এই মত কতকাংশে সত্য হলেও সবটাই তা নয়। মধ্যযুগের বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর ধারাটি এখানে বিশেষভাবেই কার্যকর হয়েছে। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যগুলিতে যেসব 'ধুয়া' গান রচিত ও প্রযুক্ত হয়েছে, তার প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত গীতিধারাও উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্য গীতিকাব্যের প্রভাবের সঙ্গে দেশীয় সাহিত্যের এই দিকগুলিকে স্বীকার না করলে ইতিহাসকেও অস্বীকার করা হবে। মাইকেল মহাকাব্যের ধারার সূচনা করলেও সেই মহাকাব্যের মধ্যেই কোথাও কোথাও গীতিকবিতার আভাস ছিল। পরে আত্মভাবমুখ্য সনেট—'আত্মবিলাপ', 'বঙ্গভূমির প্রতি' এবং কবিতার মাধ্যমে তিনি গীতিকাব্যের পূর্ণ প্রবর্তন করেন। বিহারীলাল চক্রবর্তীই বাংলা গীতিকবিতার বিশিষ্ট সুরটিকে প্রথম অনুধাবন করেন। রবীন্দ্রনাথ এই জন্যেই তাঁকে 'ভোরের পাখি' বলেছেন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন এঁরা হলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের কবি। শ্রেষ্ঠ গীতিকবি অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। এই যুগের অপর বিশেষত্ব হল, বাঙালি মহিলা কবিদলের গীতিকবিতা রচনা। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু, বিনয়কুমার ধর, কামিনী রায় প্রমুখের নাম এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। গার্হস্থ্য জীবনকেই এই মহিলা কবিদল বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিলেন। পুরুষ কবিগণ নিসর্গজগৎ এবং রোমাণ্টিক জগৎকে ধীরে ধীরে গ্রহণ করে বিচিত্র বিষয়ের গীতিকবিতা রচনা করতে থাকেন। ছন্দ ও প্রকরণ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। ফলে বাংলা গীতিকবিতা বিশেষ উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। গীতিকবিতার সঙ্গে বাঙালির গানও উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর রামনিধি গুপ্ত অর্থাৎ নিধিবাবুর টপ্পাগান, হরু ঠাকুর, রাম বসুর প্রমুখের কবিগান গীতিকবিতা রূপেও উৎকৃষ্ট। অন্যান্য কবিরাও তখন নানাভাবের গান লিখেছেন এবং সেগুলিও কাব্যগত দিকটিও ছিল সবিশেষ সমৃদ্ধ। এই কাব্যের দিকটির কথা মনে রেখেই এইসব গানকে বলা হত—'কাব্যগীতি'। বিংশ শতাব্দীতে বাংলা গীতিকাব্য অবিস্মরণীয় সাফল্য অর্জন করে। বাংলা নাট্যসাহিত্যকে আশ্রয় করেও গান-গীতিকবিতার বিকাশ ঘটেছে। বাংলা গীতিকবিতার পরিণতির দুটি দিকে : এক, গদ্যকবিতায়; দুই, কাব্যনাট্যে। দুটি ক্ষেত্রেই বাঙালি কবিরা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আধুনিক কবিদের (পুরুষ এবং মহিলা) কথাও এখানে বলা বিশেষভাবে প্রয়োজন। তাঁরাও উল্লেখযোগ্য প্রতিভা ও আন্তরিকতা নিয়ে এদিকে এগিয়ে এসেছেন।

৯১.৭ গীতিকবিতার শ্রেণিবিভাগ ঃ ভাবকেন্দ্রিক রূপকেন্দ্রিক

গীতিকবিতা নিয়ে কবিগণ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন অবিরাম। এরই ফল হল—গীতিকবিতার বিবিধ Form বা রূপের আবিষ্কার ও প্রবর্তন। একই রাধা-কৃষ্ণ প্রণয়কে ভিত্তি করে অসংখ্য কবি পদাবলী রচনা করেছেন। কিন্তু কোনো-কোনো কবি তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রকরণগত কিছু স্বাতন্ত্র্যেরও সৃষ্টি করেছেন। যেমন—চণ্ডীদাস। তিন পঙ্‌ক্তির তিনি একটি স্তবক রচনা করতেন, যা থাকত পদটির প্রারম্ভেই এবং সেটির মধ্যেই বক্তব্যের একটি প্রধান ভাব আত্মপ্রকাশ করত। Stylistics বা শৈলীবিজ্ঞানের দিক থেকে, কবির এই নিজস্বতাজ্ঞাপক স্তবকভঙ্গিকে বলা যায়—Stylometrics। বাঙলা গীতিকবিতার ক্ষেত্রে স্তবক রচনা বা বক্তব্যের বিন্যাসের সচেতনা একদিনেই বাঙালি কবিরা অর্জন বা আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়নি। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথই তাঁর কাব্যজীবনের প্রারম্ভেই এ বিষয়ে সচেতন হন সর্বপ্রথম। বিভিন্ন ভাবকেন্দ্রিক কবিতাকে (যেমন, প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশ ভক্তি ইত্যাদি ভাবমূলক কবিতা) এক-একটি বিশেষ Form বা রূপের মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে। কোনো কোনো ভাব বা চিন্তা একটি বিশেষ রূপকল্প ব্যতীত যেন সার্থকভাবে প্রকাশিতই হতে পারে না। সেই ছন্দোগত এবং রূপগত বৈশিষ্ট্যটি ওই বিশেষ ভাবনার প্রকাশের জন্য অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য।

রূপের দিক থেকে এ-প্রসঙ্গে ওড, সনেট, গাথা ও পত্রকবিতার কথা বিশেষভাবে ওঠে। গ্রিক ওড, ল্যাটিন ওড, ইংরেজি ভাষার ওড,—সবেরই এক-একটি বিশেষ বিশেষ রীতি আছে। গ্রিক কবি পিন্ডার-ই তো একাধিক রীতির ওড লিখেছেন। 'কোর‍্যাল ওড' বা 'সনোডিক ওডে'র রচনা রীতি যেমন কিছুটা পৃথক তেমনি ভাবেরও বৈচিত্র্য আছে। একই ওড কবিতা বিভিন্ন ভাবের ক্ষেত্রে বিচিত্র রূপ নিতে পারে। তেমনি সনেট কবিতা। এই কাব্যরূপটিও বিভিন্ন ভাবনার প্রকাশক। তাই পেত্রার্কের সনেট ও শেক্সপীরীয় সনেট বিষয় ও ভাবের বিন্যাসে ভিন্ন, যেমন মাইকেলের সনেটের অমিত্রাক্ষর রবীন্দ্রনাথের সনেটে ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। সমর সেন সনেটের ৭+৭=১৪ এই বিভাগে বিভক্ত করেছেন। জীবনানন্দ দাশ আবার সনেটের পঙ্‌ক্তিকে ১৮ বা ২২ অক্ষরে প্রসারিত করেছেন এবং এটি তাঁরা করেছেন ভাবের প্রকাশের চারুত্বের জন্য অর্থাৎ একই Form একাধিক ভাবের প্রকাশক হয়। সেই জন্য গীতিকবিতার শ্রেণিবিন্যাসের কালে কেবল ভাবের দিকটিকেই ভিত্তি না করে রূপের দিক থেকেও বিভাগ করা উচিত।

সব চেয়ে বিভ্রান্তিকর ব্যাপার 'গাথা'-র রূপটিকে নিয়ে ভারতীয় সাহিত্যে গাথার নানা পরিচয় দেখা যায়। গাথা কখনো বিশেষ এক ছন্দ, কখনো বা গ্রাম্যকবিতা। কখনো রাজাদের প্রশস্তি, কখনো বা কারোর বিবেচনায় 'ব্যালাড'। কখনো আকৃতিতে ক্ষুদ্র, কখনো দীর্ঘ। গাথায় কখনো পাই রোমান্টিক অনুভূতির প্রকাশ। Elegy বা শোকগীতিকে বা শোককাব্যকে 'শোকগাথা' ও বলো হয়েছে,—যেমন ভক্তিগীতিকে

বলো হয়েছে 'ভক্তিগাথা'। যদি শোকগীতি বা ভক্তিমূলক গীত ভাবকেন্দ্রিক ও Subjective Poetry হয়, তবে এসব ক্ষেত্রে গাথাকে কোন্ গুচ্ছের প্রকাশক বলা যাবে?

এই জন্যেই মন্ময় কবিতার শ্রেণিভাগ কালে ভাব এবং রূপ—বিভাজন দু'দিক থেকে করলে ঠিক হয়।

৯১.৮ ভাবকেন্দ্রিক গীতিকবিতা

নাম থেকেই বোঝা যায়, ভাবকেন্দ্রিক গীতিকবিতা (Sujective Poetry) হল সেই ধরনের গীতিকবিতা, যা কোনো ব্যক্তির নিজস্ব ভাবানুভুতিকে ভিত্তি করে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ বিষয়ের চেয়ে বিষয়ীযেখানে বড় বস্তুর চেয়ে বস্তুকে (বিষয়কে) আশ্রয় করে গড়ে-ওঠা কোনো ব্যক্তিগত ভাবনাই যেখানে প্রধান হয়ে উঠে। এই ধরনের গীতিকবিতা হল ঃ

ক) কবির আত্মচিন্তামূলক (Reflective) গীতিকবিতা ঃ নিজেই নিজের আত্মদর্শনে যেখানে তিনি ব্যক্ত ও ব্যাখ্যা করেন। আত্মদর্শন বলেতে কিন্তু তাঁর সাহিত্যদর্শন বিষয়ক চিন্তা। 'চিত্রা'-র 'উর্বশী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর সৌন্দর্যদর্শন বা সৌন্দর্যবিষয়ক চিন্তাকে ব্যক্ত করেছিলেন।

খ) ভক্তিভাবমূলক (Devotional) গীতিকবিতা ঃ যেমন রামপ্রসাদের শাক্ত পদাবলী, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির রচনাগুলি। এই রচনাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেবতার প্রতি গানে গানে অঞ্জলি নিবেদন করেছেন।

গ) স্বদেশপ্রেমমূলক (Patriotic) গীতিকবিতা ঃ এই শ্রেণীর কবিতার মাধ্যমে স্বাদেশিকতা সম্পর্কে কবির ভাবনা এবং বক্তব্য প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' (এটিকে একটি ভক্তিগীতি রূপেও নেওয়া চলে), কিংবা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের গান এই পর্যায়ে পড়ে।

ঘ) প্রকৃতি বা নিসর্গকে আশ্রয় করে রচিত গীতিকবিতা ঃ এই ধরনের কবিতায় কেবল নিসর্গ জগতের বর্ণনাই থাকবে না। এক প্রান্তে নিসর্গজগৎ, আর অপরপ্রান্তে থাকবে কবির হৃদয়। এই দুই দিকের পারস্পরিক প্রভাবে ও সম্মিলনে গড়ে উঠবে এই শ্রেণীর কবিতা। এই শ্রেণীর কবিতার মাধ্যমেই কবিদের হৃদায়ানুভূতি ব্যাপ্তি ও গভীরতা লাভ করে। রোমান্টিক কবিদের পক্ষে নিসর্গজগৎ একটি বৃহৎ ভূমিকা নিয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ বর্ষার মধ্যে 'মানবের রূপ' দেখেছেন। নিসর্গ একদিকে তাঁর হৃদয়ের কেন্দ্রে ছুটে এসেছে ঃ 'নিখিল তোমার এসেছে ছুটিয়া/ মোর মাঝে আজি পড়েছে লুটিয়া হে।' অপর দিকে তাঁর অন্তরের ভাব বাইরে নিসর্গ জগৎতে ছড়িয়ে পড়ছে ঃ 'ছিল পরানের অন্ধকারে / এল সে ভুবনের আলোকপারে।' এই পারস্পরিক প্রভাব সম্মিলন ব্যতীত খাটি নিসর্গ-কবিতার সৃষ্টি হয় না।

ঙ) প্রেমমূলক গীতিকবিতা ঃ প্রেমই যেখানে মুখ্য উপজীব্য, সেখানে প্রেমমূলক গীতিকবিতার

নিদর্শন—প্রেমের কবিতার এই সংজ্ঞা নিতান্ত স্থূল এবং সরল। প্রেমের কবিতা মিলন ও বিরহ—উভয়েরই হতে পারে বটে, তবে বিরহবোধক প্রেমের কবিতার স্থান উচ্চতর ক্ষেত্রে। বিরহের মাধ্যমে কবি তাঁর প্রেমের দর্শনকে ফুটিয়ে তোলেন। প্রেমের কবিতার দুটিদিক আছে ঃ এক,প্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যা, বৈষ্ণব কবিরা 'আক্ষেপানুরাগ' পর্যায়ে তা করেছেন। দুই, নরনারীর মন বা মানসিকতার তার প্রকাশ ও প্রতিক্রিয়ার পর্যালোচনা। অনেক প্রেমের কবিতায় কবির ব্যক্তিগত জীবনের ছাপও পড়ে।

চ) শোককাব্য (Elegy) ঃ ব্যক্তিগত কারণে বা অন্য কারণে কবি যখন শোকাহত হন, তাঁর সেই মর্ম বেদনা যখন কাব্যে প্রকাশিত হয় তখন তাকে বলে শোক কবিতা। এর মধ্যে বিশেষ এক করুণ সাময়িক দিক আছে। পৃথিবীর আদি শোককাব্য সম্ভবত বাল্মীকির অজ্ঞাতভাবে রচিত শ্লোক—ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ব বিয়োগে শোকার্ত কবির শ্লোক। কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর 'বন্ধুবিয়োগ' (তুল্য ঃ Tennyson এর 'In Memoriam', অক্ষয়কুমার বড়ালের পত্নীবিয়োগ লিখিত 'এষা', কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ'। হাসান-হোসেনের মৃত্যুতে যে স্মরণগীতি, যাকে 'জারিগণ' (জারি = প্রকাশ) বলে, তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, ধর্মবিশ্বাস ভিত্তিক।

৯১.৯ রূপকেন্দ্রিক কবিতা

কেবল ভাবকে ভিত্তি করে যেমন গীতিকবিতার শ্রেণীবিভাগ করা যায়, তেমনি রূপ বা Formকেও ভিত্তি করে এই বিভাগ করা চলতে পারে। 'পত্ররীতি' বা 'গাথা' সম্পর্কে এখানে কিছু বক্তব্য আছে। গাথা যখন বিশেষ একটি রূপ, তখন তাকে রূপকেন্দ্রিক সাহিত্য বলা যাবে, কিন্তু সেই গাথাই যখন একটি বিশেষ আখ্যান, তখন তাকে Objective বা তথ্যময় কবিতার দলে ফেলব। বাংলা সাহিত্য গাথার যে বৈচিত্র্য দেখা যায়, তাতে গাথা একই সঙ্গে মন্ময় কবিতা হয়ে উঠেছে, যদিও তন্ময় কবিতা রূপেই এই পরিচয়—মূল পরিচয়। তেমনি Epistle বা পত্ররীতির কবিতা। মাইকেলের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের কোনো-কোনো রচনায় (যেমন, তারা, শূর্পনখা, উর্বশীর পত্রে) গীতিভাব ফুটে উঠেছে। এইজন্য 'পত্ররীতি'র মধ্যে Formটিই প্রধান হলেও, মন্ময় কবিতার দিকটি এর মধ্যেও ক্বচিৎ মেলে। অন্যান্য Formগুলির পরিচয় এই ঃ

ক) 'ওড' (Ode) কবিতা ঃ গ্রিকভাষায় 'ওড' কথাটিরও অর্থ 'গান'। সে দিক থেকে গীতি কবিতার সঙ্গে এর একটি বিশেষ সাযুজ্য আছে। এই বিশেষ কাব্যধারার উদ্ভব গ্রিস দেশে । প্রাচীন গ্রীসে গাইবার জন্যই এগুলি রচিত হত। তারপর তার একটি সাহিত্য রূপগত বৈশিষ্ট্য দেখা যায় ঃ ওডের মধ্যে থাকত তিনটি স্তবক—স্ট্রোফি, অ্যান্টি-স্ট্রোফি এবং ইপোড। এই তিনটি মিলে একটি Triad । কোরাস অর্থাৎ যৌথ গীতিদলের গানের সঙ্গে তা যুক্ত। সাধারণত পনের জনের দল, তিন ভাগে বিভক্ত। বাঁ দিকের দল অ্যান্টি-স্ট্রোফি এবং শেষে মাঝখানের দল ইপোড অংশ গাইত। ভাষা ও ছন্দ সম্পর্কে রচয়িতাকে

সতর্ক থাকতে হত। এই ধরণের কোর‍্যাল ইডের বিখ্যাত কবি—পিণ্ডার। ধর্ম, নীতি, রূপক ও পৌরাণিক কাহিনীর মিশ্রণে এগুলি রচিত। বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সাফল্যে পিন্ডার এগুলি রচনা করেন। অতঃপর গ্রিস দেশে একক কণ্ঠে গাইবার জন্য প্রবর্তিত হয় 'মন্ডিক ওড'। এগুলি ধর্মনিরপেক্ষ এবং ব্যক্তিগত ভাবনার প্রকাশক। কোর‍্যাল ওডের তুলনায় লিরিক বা সন্ডি ছিল অনেকটাই ধর্মনিরপেক্ষ এবং ব্যক্তিগত। আকারেও ছোট। কোর‍্যাল ওড (Choral Ode)-এর নানা রীতি ছিল। এক পিন্ডারই অন্তত আটটি রীতির ওড লিখেছিলেন। অতঃপর উল্লেখযোগ্য ল্যাতিন ভাষায় লেখা হোরাস-এর ওড। ল্যাতিন ভাষায় মনডিক্ ওডই বেশি লেখা হয়েছে। তাতে ধর্মনিরপেক্ষ ও ব্যক্তিগত ভাব আপেক্ষিক ভাবে অধিক। ফরাসি এবং ইংরেজি ভাষায় ওড লেখা শুরু হয় রেনেসাঁসের যুগে। ইংরেজ কবিদের মধ্যে রোমান্টিক যুগ্ধের অনেক কবিই (যথা ঃ ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলী, কীটস) ওড কবিতা লিখেছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের Ode on Intimations of Immortality, শেলীর Ode to the West Wind. কীটস্-এর Ode to a Grecian Urn— সকলেরই পরিচিত।

বাঙালি কবিদের মধ্যে অনেকেই ওড কবিতা লিখেছেন। To-এর বাঙলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে 'প্রতি'। যেমন মাইকেলের 'বঙ্গভূমির প্রতি'। রঙ্গালালের 'পদ্মপুষ্পের প্রতি। Ode- এর প্রতিশব্দ 'স্তবকাব্য' বা 'স্তোত্র কবিতা'। তবে সর্বক্ষেত্রেই তা Ode-এর প্রতিশব্দ রূপে প্রযুক্ত হয়নি , কখনো Hymn-এর প্রতিশব্দ রূপেও ব্যবহৃত হয়েছে। Ode এবং Hymn- এর মধ্যে পার্থক্য আছে। তবে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'গঙ্গা-স্তোত্র' কবিতায় 'স্তোত্র' আখ্যাটিকে যেভাবে প্রয়োগ করেছেন,তাতে এটিকে Ode- এর বাঙলা প্রতিশব্দ রূপে গ্রহন করা যেতে পারে। বাঙালি কবিদের মধ্যে Ode আখ্যার প্রথম প্রয়োগ করেছেন মাইকেল। তিনি তাঁর চিঠিতে 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের প্রসঙ্গে একাধিকবার Ode কথাটির ব্যবহার করেছেন। পাশ্চাত্য Ode নিয়ে সর্বাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন বাঙালি কবিদের মধ্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই জন্য তাঁকে 'বাংলার পিনডার' বলা হত। শ্রেষ্ঠ ওড রচয়িতা—রবীন্দ্রনাথ।

খ) সনেট কবিতা ঃ ইতালীয় 'Sonetto' (অর্থ ঃ 'মৃদুশব্দ' বা 'গান') কথাটি থেকে 'Sonnet' কথাটি এসেছে। চৌদ্দটি পদ বা পঙ্‌ক্তিতে এই ধরনের কবিতা সম্পূর্ণ হয় বলে মাইকেল এর বাঙলা করেছিলেন—'চতুর্দশপদী কবিতা'।

সনেট কবিতা সাধারণ ক্ষেত্রে চোদ্দ পঙ্‌ক্তিতে পূর্ণ হয়। তবে Curtal Sonnet (জেরার্ড ম্যানলে হপকিনস্ একে কেটে ছোট করে দশ পঙ্‌ক্তির করেন, স্তবক বিভাগ ছিল ৬+৪= ১০। কেটে ছোটো করেছিলেন বলেই তিনি এর নামকরণ করেন— Curtal Sonnet) -এর কথা ভিন্ন। সাধারভাবে Iambic Pentameter ছন্দে এগুলি রচিত (যেখানে Syllable) বা অক্ষর প্রথমে হবে শ্বাসাঘাত বিহীন এবং পরে থাকবে শ্বাসাঘাত যুক্ত, তাকে বলা হয় lamb । এই ছন্দের মধ্যে যখন পাঁচটি foot বা পর্ব থাকে, তখন হয় Iambic Pentameter। শ্বাসাঘাতের এই ধরনটি মানুষের কথাবার্তার খুব কাছাকাছি, এই জন্য

এই শ্বাসাঘাত রীতি সমগ্র ইউরোপে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে)। এর স্তবক বিভাগ ঃ ৮+৬ =১৪। প্রথম আট পঙ্‌ক্তির স্তবককে বলে Octave (বাঙলায় 'অষ্টক'), পরবর্তী ছয় পঙ্‌ক্তির স্তবক—Sestet (বাঙলায় 'ষটক')। প্রথম আট পঙ্‌ক্তিকে আবার চার পঙ্‌ক্তির দুটি Quartrain-এর ভাগ করা হয়,তেমনি Sestet কেও দুটি Tercet -এ ভাগ করা যায়।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কবি সনেটের নানা রীতির ও স্তবক বিভাগের প্রবর্তন করেন। সনেটের মধ্যে মূলত তিনটি রীতির পরিচয় দেখা যায় ঃ ১. পেত্রার্কীয় রীতি, যাতে অষ্টক (মিল ঃ কখখক কখখক) এবং ষটক (মিলঃ গঘক গঘক) থাকে,২. স্পেন্সারীয় সনেটে থাকে তিনটি Quatrain এবং একটি দ্বিপদী (Couplet) । মিল ঃ কখকখ গঘগঘ, গঘ গঘ, ঙঙ। ৩. শেকস্‌পীয়রীয় সনেটেও তিনটি Quatrain এবং একটি দ্বিপদী (Couplet) । মিল ঃ কখকখ, গঘগঘ, ঙচঙচ, ছছ। এর মধ্যে পেত্রার্কীয় বা ইতালীয় রূপটিই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। অষ্টকে যে ভাব ও চিন্তা ষটকে তার পরিনতি ও পূর্ণতা।

ইংরেজ সাহিত্যে শেকস্‌পীয়রের সনেট বিশেষ বিখ্যাত। মিলটন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীটস, শেলী—সকলেই নিজের নিজের রীতিতে সনেট লিখেছেন।

বাঙলায় মাইকেল প্রথম সনেট লেখেন । রবীন্দ্রনাথ অমিত্রাক্ষর ছন্দ নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা করেন এখানে। তবে চৌদ্দ অক্ষর এবং চৌদ্দ পঙ্‌ক্তির কোনো পরিবর্তন করেন নি । পরবর্তী কালের অনেক পঙ্‌ক্তির দৈর্ঘ্য যেমন বিস্তার ঘটিয়েছেন তেমনি অষ্টক-ষট্‌ক-এর বিভাগ লুপ্ত করে দিয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ কবিরা যেমন সনেট লিখেছেন তেমনি পরবর্তীদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ, দিনেশ দাস, সমর সেন বসুপ্রমুখ কবিরাও সনেট লিখেছেন।

প্রমথ চৌধুরি বলেছিলেন, 'ভালোবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন।' কিন্তু অনেক কবিই সে বন্ধনকে কাব্যস্ফূর্তির প্রতিবন্ধক বলেই মনে করেন।

৯১.১০ অনুশীলনী

(ক) নীচে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(১) 'মন্ময় কবিতা বলতে কী বোঝেন?

(২) Lyric আখ্যাটির উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(৩) Ode আখ্যাটির প্রসঙ্গে আলোচনা করুন।

(৪) বৈষ্ণব এবং শাক্ত পদাবলীর কবিরা কোন্ অর্থে 'গীতিকবি'?

(৫) ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মহিলা কবিদলের গীতি কাব্যর মূল আলোচ্য বিষয় কী ছিল?

(৬) রূপকেন্দ্রিক গীতিকবিতার দুটি রূপের উল্লেখ করুন।

(৭) প্রথম বাঙলা সনেট কবিতা কে লেখেন? 'সনেট'- এর বাঙলা প্রতিশব্দ তিনি কী দিয়েছিলেন?

(৮) ওয়ার্ড্সওয়ার্থ, শেলী এবং কীটসের Ode কবিতার একটি নাম উল্লেখ করুন।

(৯) 'Octave এবং 'Sestet' -এর গঠন প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করুন। এ দুটির বাঙলা প্রতিশব্দ কী?

(১০) শেকসপীয়রীয় সনেটের গঠনগত বৈশিষ্ট্য কী?

(খ) নীচে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির বিস্তৃত আলোচনা করুন ঃ

(১) ভাবের দিক থেকে গীতিকবিতাকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?

(২) রবীন্দ্রনাথ গীতিকবিতার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা ব্যক্ত করুন।

(৩) সনেট কবিতার সর্বাঙ্গীণ পরিচয় দিন।

(৪) পাশ্চাত্য গীতিকবিতার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরুন।

(৫) Ode কবিতার প্রসঙ্গে আলোকপাত করুন।

৯১.১১ তন্ময় কবিতার শ্রেণিবিভাগ

Objective বা তন্ময় কবিতা হল — বিষয়নিষ্ঠ কবিতা। এখানে ব্যক্তি বা বিষয়ী নয়, বিষয়ই মুখ্য। তন্ময় কবিতা আকারে হ্রস্ব বা দীর্ঘ —দুই-ই হতে পারে। এগুলির উপস্থাপন রীতিও মন্ময় কবিতা থেকে ভিন্ন। মানুষের জীবনের অন্তরঙ্গ দিক এবং তার তীব্র তীক্ষ্ণ প্রভাব অপেক্ষা মানুষের জীবনের বহিরঙ্গীয় দিক তন্ময় কবিতায় প্রাধান্য অর্জন করে। যে সব বস্তুনিষ্ঠ কবিতা আকারে দীর্ঘ, সেগুলির মধ্যে আছে ঃ মহাকাব্য, আখ্যায়িকা কাব্য, গাথা কাব্য, ব্যালাড (বাংলায় গীতিকা)। এগুলির মধ্যে কাহিনী-আখ্যান-উপাখ্যান প্রভৃতি মুখ্য। 'ব্যালাড'কেও (Ballad) কেউ কেউ গাথা বলেছেন, যেমন, দীনেশচন্দ্র সেন। এসব কাব্য বা গাথা গাইবার জন্য নয়, — পড়বার বা আবৃত্তি করবার জন্য।

যেসব তন্ময় কবিতা আকারে হ্রস্ব, সেগুলির মধ্যে আছে ঃ পত্রকাব্য বা লিপিকবিতা (Epistee), রূপককাব্য (Allegory, রূপককাব্য অবশ্য দীর্ঘায়িত হতে পারে), ব্যঙ্গকবিতা (Satire,এও আকারে হ্রস্ব ও দীর্ঘ হতে পারে। Parody কবিতাকে এই দলে ফেলা যায়), নীতি কবিতা (Didactic), প্রশংসামূলক (Panegyric)। এছাড়া সমসাময়িক কোনো ঘটনাকে অবলম্বন করেও কবিতা লেখা হয়। সেগুলিকে বলা হয় Occasional Verse । আমাদের দেশে চৈত্র-সংক্রান্তি উপলক্ষে এ ধরনের কবিতা লেখা হয়, অবশ্য তা মুখ্যত গাইবার জন্যই। ব্যঙ্গ বা আমাদের জন্য কখনো কখনো কোনো বিশেষ উপভাষাতেও কবিতা

রচিত হয়. যা Dialect Verse নামে পরিচিত। আজকাল কেউ কেউ Serious বিষয় নিয়ে, এমন কি আত্মকেন্দ্রিক বিষয় নিয়ে উপভাষায় কবিতা লিখছেন,— আলোচ্য ক্ষেত্রে সেগুলিকে ব্যতিক্রম রূপে বিবেচনা করতে হবে।

৯১.১২ আখ্যানকাব্য ঃ সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ, উদাহরণ

ইংরাজিতে যাকে বলা হয় Narrative Poetry, বাংলায় তাকেই বলা যায়—আখ্যনকাব্য, কাহিনীকাব্য বা উপাখ্যান। Narrative কথাটি থেকে এর বর্ণনাগত দিকটি এবং 'আখ্যান' কথাটি থেকে এর ভাবগত দিকটি পরিস্ফুট হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই দুই মিলিয়ে নিলে এর সম্পর্কে একটি ধারনা সহজেই গড়ে উঠে। মরিম উলসান Twentieth Century Narrative Poems-যে সঙ্কলন করেছেন, তার ভূমিকায় তিনি এই ধরনের রচনার পিছনে কাহিনী পরিবেশনের তাগিদটিকেই বড়ো করে দেখেছেন। এই কাহিনীকথনের বর্ণনাভঙ্গিটিকেই মনে রেখে Narrative কথাটি প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে এর মধ্যে রোমান্টিকতার প্রভাব থাকতে পারে, কিংবা বর্ণনার মধ্যেও থাকতে পারে নানা বৈচিত্র্য— সে সম্পর্কেউলমান অবশ্য ততটা সচেতন নন।

প্রভাময়ী দেবী তাঁর 'বাংলা আখ্যায়িকা কাব্য, ১৮৫০-১৯০০ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত,১৯৫৮) নামে গবেষণা-গ্রন্থে আখ্যায়িকা কাব্যের গ্রহনযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন। আখ্যান নাটক বা উপন্যাসেও থাকে। কিন্তু আখ্যান কাব্যের আখ্যানের উপস্থাপনার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। নাটক-উপন্যাসের কাহিনী বাস্তব জগতের নানা বৈচিত্র্যের বর্ণনায় পূর্ণ। তার লক্ষ্য জীবনকে চিত্রিত করা। আর কাব্যে রচিত কাহিনীর লক্ষ্য হল, মানুষের জীবনের বাস্তব প্রকাশের পিছনে যে নিগূঢ় সত্য অদৃশ্য থেকেও নানা রূপে ও ভাবে জীবনকে সঙ্গীতে ও মাধুর্যে বেদনায় ও আবেগে অনুরঞ্জিত করে চলেছে, তাকে প্রকাশ করা। আখ্যানকাব্যও বাস্তবকে চিত্রিত করে কিন্তু তার মধ্যে বড় হয়ে ওঠে সৌন্দর্যের অনির্বচনীয়তা। এর মধ্যে যে কাহিনীটি থাকে, তা কবির ভাবলোকে দৃষ্ট সত্যের ছায়াময় প্রকাশ। আখ্যানকাব্যের সত্য হল — মানব আদর্শের সত্য নাটক বা উপন্যাসের কাহিনীর সত্য, মানবজীবনের সত্য। কাজেই, আখ্যানকাব্য এবং নাটক উপন্যাসের আখ্যানের উদ্দেশ্য ভিন্ন,দৃষ্টিকোণ ভিন্ন এবং উপায়ও ভিন্ন।

যেমন নাটক-উপন্যাসের আখ্যান থেকে আখ্যানকাব্যর আখ্যান ভিন্ন, তেমন গীতিকাব্য থেকেও এগুলো ভিন্ন। আখ্যানকাব্যগুলিতে কোনো একটি বিশেষ ঘটনাকে ভিত্তি করে মানবানুভূতির আবেগময় অভিব্যক্তি স্থান পায়। ফলে,গীতি কাব্যের-উচ্ছ্বাস এগুলিতে কিছু পরিমাণেই মেলে। কিন্তু গীতিকাব্যের যে মূল দিক কবির ব্যক্তি মানসের অনুভূতির প্রকাশ, তা এগুলিতে নেই।

গাথার-র সঙ্গে আখ্যানকাব্যের পার্থক্য আছে। আখ্যানকাব্যে থাকে ঘটনার বাহুল্য ও জটিলতা,

বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ ও সংঘাত—কিন্তু গাথাকাব্যে সেগুলি নেই। গাথাকাব্যে থাকে একটি বিশেষ আবেগ, অনুভূতি ও উচ্ছ্বাসের একমুখী তীব্রতা, কখনো বা কোনো আবেগ-উচ্ছ্বাসের সহজ-সরল প্রকাশ। এই ভাবে নাটক-উপন্যাসের আখ্যান, গীতিকাব্যের ব্যক্তিমানসের প্রকাশ এবং গাথাকাব্যের সহজ-সরল একমুখী উপস্থাপনা—এই তিন দিক থেকে বিচার করে আখ্যায়িকা কাব্যের সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে।

বিংশ শতকের ইংরেজি Narrative Poetry-এর উদাহরণ হিসেবে এই রচনাগুলির নাম উল্লেখ করা যায় ঃ

ওয়াল্টার ডে লা মেয়ার-এর Goliath (মাত্র ৫০ পঙ্‌ক্তির), সিসিল ড্যে লুইস-এর Flight to Australia (২০০ পঙ্‌ক্তির), W. B. Yeats-এর The Hour before Dawn (২২০ পঙ্‌ক্তি), টমাস হার্ডির-র 'The Choirmaster's Burial (৫০ পঙ্‌ক্তি)। আকারে বিশেষ বড় বলা চলে না। প্রাচুর্যের দিকে থেকে টমাস হার্ডির নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলা আখ্যানকাব্যের সঙ্গে এগুলির পার্থক্য আছে। এগুলি মূলত 'গাথা'— কোনো-কোনোটির সঙ্গে Ballad নামও সংযুক্ত হয়েছে।

সেই তুলনায় বাংলা আখ্যানকাব্য আকারে দীর্ঘ, পুরোপুরি এক-একটি কাহিনীর রুপ দেওয়া হয়েছে। বাংলা আখ্যানকাব্যের এই প্রকার দৈর্ঘ্যের পিছনে সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ বিশেষ জাতীয় কারণ অনুসন্ধান করেছেন। সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কাহিনীকাব্যগুলিতে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গালকাব্য' এবং ইসলামি রোমান্টিক সাহিত্যের প্রভাব ছিল। আর দ্বিতীয় ভাগের কাহিনীকাব্যগুলিতে রঙ্গালাল, মধুসূদন এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব পড়েছে। কেউ কেউ ইংরেজি আখ্যায়িকার সরাসরি অনুসন্ধান করেছিলেন।

বাংলা আখ্যায়িকা কাব্যের মধ্যে মোট পাঁচটি ধারার সন্ধান মেলে ঃ

১. পৌরাণিক বা দেবদেবীর মাহাত্ম্য জ্ঞাপক আখ্যায়িকা কাব্য ঃ গিরিশচন্দ্র বসুর 'বালিবধ' (১৮৭৬), হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার' (১৮৭৫), হোমারের 'ইলিয়াড' অবলম্বনে লেখা আনন্দচন্দ্র মিত্রের 'হেলেনাকাব্য'।

২. জীবনীমূলক আখ্যায়িকা কাব্য ঃ নবীনচন্দ্র সেন 'খৃষ্ট' (১৮৯০), 'অমিতাভ' (১৮৯৫), 'অমৃতাভ' (১৯০০)। আনন্দচন্দ্র মিত্রের রাজা রামমোহনের জীবনী অবলম্বনে রচিত 'ভারতমঙ্গাল' (১৮৯৪)।

৩. ইতিহাসাশ্রিত, দেশপ্রেমমূলক আখ্যায়িকা কাব্য ঃ রঙ্গালালের 'পদ্মিনীর উপাখ্যান' (১৮৫৮), নবীনচন্দ্র সেনের 'ক্লিওপেট্রা' (১৮৭৭), কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়ের 'লুক্রোশিয়া' (১৮৭৯), হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 'বীরবাহু কাব্য' (১৮৯৪)।

৪. আদিরসাত্মক, প্রণয়মূলক আখ্যায়িকা কাব্য ঃ মধুসূদন দাস ও কালীকৃষ্ম দাসের যৌথভাবে লেখা

'কামিনীকুমার' (১৮৫০), মহেশচন্দ্র মিত্রের 'লায়লা মজনু' (১৮৫৩), আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রমোদ-কামিনী কাব্য' (১৮১৭)।

৫. **গাথা বা নবীন রোমান্টিক কাব্য ঃ** অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'উদাসিনী' (১৮৭৪), রবীন্দ্রনাথের 'কবিকাহিনী' (১৮৭৮), 'বনফুল' (১৮৮০), ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যোগেশ' (১৮৮১)।

সেই সব আখ্যানকাব্যগুলি বাঙালির কাছে খুব যে জনপ্রিয় হয়েছিল, এমন কথা অবশ্য বলা যায় না।

৯১.১৩ অনুশীলনী

(ক) নীচে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

১। Narrative Poetry কথাটির অর্থ কী?

২। আখ্যানকাব্য কথাটির মধ্যে কোন বিষয়টির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়?

৩। নাটক-উপন্যাসের কাহিনীর সঙ্গে আখ্যানকাবের কাহিনীর পার্থক্য কোথায়?

৪। গাথা-র সঙ্গে আখ্যানকাব্যের পার্থক্য নিরুপণ কর।

৫। বাংলা গাথা বা রোমান্টিক আখ্যানের দুটি উদাহরণ দিন।

(খ) নীচে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির বিস্তৃত আলোচনা করুন ঃ

১। আখ্যায়িকা কাব্যের সংজ্ঞা দিন।

২। ইংরেজি Narrative Poem-এর কিছু দৃষ্টান্ত দিন।

৩। বাংলা আখ্যায়িকা কাব্যের শ্রেণিবিভাগ করুন ও দৃষ্টান্ত দিন।

৯১.১৪ মহাকাব্য ঃ সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ, উদাহরণ

ইংরেজিতে যাকে বলে Epic, প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রে তাকেই বলা হয়েছে 'মহাকাব্য'। কিন্তু Epic বলতে যে সংজ্ঞার্থ বোঝায়, মহাকাব্য ঠিক সেই অর্থেই প্রযুক্ত হয়নি। প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্র থেকে কেবল 'মহাকাব্য' অভিধাটিকেই গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু প্রযুক্ত হচ্ছে Epic অর্থে। কাজেই প্রথমেই এই ভিন্নতাটুকু লক্ষণীয়। তবে এপিক এবং মহাকাব্যের মধ্যে কোনো-কোনো দিক থেকে সাদৃশ্যও আছে।

গ্রিক 'epos' শব্দের অর্থ হল.—কথা, গাথা, গল্প, এর বিশেষণ—epikos। এই epikos থেকে

ইংরেজি epic শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে। Epic কথাটির অর্থ হল ঃ কোনো দেশের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যমূলক বীরচরিত্রাবলীর বীরত্বপূর্ণ কার্যাদির বিবরণ প্রদান করে রচিত দীর্ঘাকার বর্ণনামূলক কাব্য। এর রচনারীতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল ঃ ভাবে-ভাষায়-কল্পনায় চাই গাম্ভীর্য ও সমুন্নতি। অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২খ্রিঃ পূ.) তাঁর Poetics গ্রন্থে মহাকাব্যের (এপিকের) যে সংজ্ঞা দেন, তা এই ঃ এপিক হবে 'বর্ণনামূলক কাব্য', আগোগোড়া তাতে একই বিশেষ ছন্দের অনুসরণ থাকবে, তাতে থাকবে নাট্যগুণ। "It should have for its subject a single action, whole and complete, with a beginning, a middle, and an end. It will thus resemble a living organism in all its unity....." বিষয়ের মধ্যে থাকতে হবে মহিমা। একদিকে যেমন থাকতে হবে 'great actions'. অপরদিকে তেমনি 'great issues' একটি জাতির উচ্চ আশা-কামনা এর মধ্যে ব্যক্ত, ফলে এর মধ্যে একটি 'জাতীয় তাৎপর্য' সংযুক্ত হয়ে যায়।

নব্য-ক্লাসিক যুগের সমালোচকগণ অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞাকে বিশদতর করেছেন। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর সমালোচকগণ এপিককে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন ঃ(ক) প্রাথমিক (Primary), মৌখিক (Oral), এবং আদিস্তরের (Primitive)। এই স্তরের এপিক মৌখিক স্তর থেকে গৃহীত, এগুলি পরবর্তীকালে লিখিত রূপ লাভ করে। এগুলিকে Authentic epic-ও বলা হয়, অর্থাৎ খাঁটি epic বলতে এগুলিই বোঝায়। (খ) দ্বিতীয় পর্যায়ের (Secondary) epic, যা Literary epic বা সাহিত্যিক মহাকাব্য নামে পরিচিত। এ একবারেই লিখিত রূপ প্রাপ্ত হয়। যেহেতু খাঁটি এপিক কাব্যের অনুকরণে এ ধরনের এপিক রচিত, সেজন্য এগুলিকে 'Imitative epic'-ও বলে। Authentic epic আবৃত্তির জন্য, Literary epic পড়বার জন্য রচিত হত। হোমারের মহাকাব্য Iiad এবং Odyssey প্রাচীন এথেন্স-এর অধিষ্ঠাত্রী দেবী Athena-র প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য, প্রতি চতুর্থ বৎসরে জাতীয় উৎসব—Panathenaea-তে আবৃত্তি করা হতো। Authentic epic-এর মধ্যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ নেই, এখানে আছে চরিত্রের স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা, কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব বা জটিলতাও এখানে নেই। পাশ্চাত্য মত অনুসারে Authentic epic-এর মধ্যে থাকবে বন্দনা, নানা বিচিত্র বিষয়ের সমাহার, ইতিহাস-কিংবদন্তী-লোককথা, যাদুকর্ম ও অতিলৌকিক ঘটনাবলী, ভাবসমুন্নতিময় ভাষণ, কঠোর অভিযান, যুদ্ধাদির বর্ণনা, পরলোক ও নরকের দৃশ্যাবলী, নানা বষয়ে তালিকা, বিশিষ্ট ও বিশদ উপমা (এর ফলে 'মহাকাব্যিক উপমা', 'হোমারীয় উপমা' প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে)।

মহাকাব্যের স্বরূপ ও বিশেষত্ব নিয়ে যে-সব বাঙালি উল্লেখযোগ্য ও মৌলিক আলোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের মতে, একটি সমগ্র দেশ, একটি সমগ্র যুগ তার সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতা নিয়ে মহাকাব্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। প্রকৃত ও আদিস্তরের মহাকাব্য দেশের মধ্যে ছড়িয়ে-জড়িয়ে থাকে, তা কারো একা নিজের রচনা নয়,

কোনো মহাকবি পরে তাকে কাব্যের মধ্যে রূপ দিলে তা মহাকাব্য হয়ে ওঠে। কাজেই 'ব্যপকতা' মহাকাব্যের একটি লক্ষণ। তবে, 'বীররস'ই মহাকাব্যের একটি প্রধান লক্ষণ—রবীন্দ্রনাথ তা মানেন না। রামায়ণে যুদ্ধাদির বর্ণনা যথেষ্টই আছে, কিন্তু "রামায়ণে যে রস সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহা বীররস নহে।" তবুও রামায়ণ একটি মহাকাব্য।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাকাব্যের লক্ষণ বলতে এক ধরনের 'সরলতা'কে বুঝেছিলেন। সরলতা' বলতে মানুষের জীবনের ও মনের অকৃত্রিমতা ও স্বাভাবিকতা। সভ্যতার বিবর্ধনের ফলে আমরা সেই 'সরলতা'কে হারিয়ে ফেলেছি, তা আর ফিরে পাওয়া যাবে না, অতএব মহাকাব্যের যুগ বিগত, মহাকাব্য আর রচিত হবে না। দ্বিতীয়ত, মহাকাব্যের মধ্যে থাকবে মূল কাহিনী ও নানা বিষয়ের অবতারণা।

প্রাচীন ভারতের আলঙ্কারিকেরা তাঁদের মতো করে মহাকাব্যের স্বরূপ লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। মহাকাব্য সম্পর্কে তাঁদের ধারণা পাশ্চাত্য 'এপিক' থেকে কিছু ভিন্ন। দণ্ডী তাঁর 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থে এবং বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর 'সাহিত্যদর্পণে' ভারতীয় মহাকাব্যের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। দণ্ডী মহাকাব্যের যে লক্ষণগুলি নির্দেশ করেছিলেন, বিশ্বনাথ কবিরাজ তাকেই ভিত্তি করে প্রসঙ্গটিকে বিশদতর এবং আধুনিকতর করে এনেছেন (সাহিত্যদর্পণ ঃ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ৩১৫-৩২৫ সংখ্যক শ্লোক)। তাঁর মতে ঃ মহাকাব্য—বেশি বড়ও নয়, বেশি ছোটও নয়, এমন আয়তনের আটটির অধিক সর্গে রচিত হবে। প্রতি সর্গের শেষে পরবর্তী সর্গের সূচনা থাকবে। দিনের বিভিন্ন সময়ের বর্ণনা থাকবে, প্রাকৃতিক জগতের নানাদিকের বর্ণনাও এতে দিতে হবে। মিলন, বিরহ, মুনি, স্বর্গ, নগর, যজ্ঞ, যুদ্ধযাত্রা, বিবাহ, মন্ত্রণা, প্রভৃতি যথার্থ ছন্দ-অলঙ্কার ব্যক্ত করতে হবে। কবি বা কাহিনীর নামে, নায়কের নামে, এমনকি অপ্রধান চরিত্রের নামেও মহাকাব্যের নামকরণ হতে পারে। প্রতি সর্গের মূল বর্ণিতব্য বিষয় অনুসারে সেই সর্গের নামকরণ হবে।

মহাকাব্যের নায়ক হবেন ধীরোদাত্ত দেবপুরুষ। ধীরোদাত্ত বলতে যিনি নিজের প্রশংসা করেন না, ক্ষমাবান, গম্ভীর, হর্ষ-শোকে অবিচলিত, যিনি দৃঢ়ব্রত। কিংবা, সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয়। শৃঙ্গার, বীর, শান্ত—এই তিনটি রসের মধ্যে একটিকে প্রধান রস রূপে দেখাতে হবে, অন্য রসগুলি এরই সহায়ক হবে। নাটকের মতো মহাকাব্যেও থাকবে সন্ধিবিভাগ (মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, উপসংহৃতি)। কাহিনীটি হবে ইতিহাস থেকে বা কোন ঐতিহ্যমূলক ধারা থেকে নেওয়া। ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ—এই চারটি বর্গই বর্ণিত হবে বটে, কিন্তু একটি বর্গ প্রাধান্য অর্জন করবে। নমস্কার, আশীর্বাদ অথবা বস্তু নির্দেশ করে মহাকাব্য শুরু হবে। কখনো থাকবে খলচরিত্রের নিন্দা বা সাধুচরিত্রের গুণগান। এক-একটি সর্গ এক-একটি ছন্দে রচিত হবে এবং সর্গ-শেষে ছন্দের পরিবর্তন করে অন্য ছন্দে শ্লোক রচনা করতে হবে।

এই বিস্তৃত নির্দেশ থেকে প্রাচ্য মহাকাব্য সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় এবং পাশ্চাত্য এপিকের সঙ্গে এর সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য দুইই লক্ষ্য করা যায়।

মহাকাব্য-এপিকের যে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে, সেই অনুযায়ী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্য থেকে তার উদাহরণও মেলে।

(ক) প্রাথমিক বা আদিস্তরের মহাকাব্য বা Authentic Epic : এই স্তরের মহাকাব্য বলতে হোমারের Iliad এবং Odyssey (খ্রি. পূ. ১০০৭), Gilgamesh, Beowulf, Elder Edda-র কোনো পর্যায়, রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদিকে বোঝায়। রবীন্দ্রনাথ কেবল চারটি রচনাকে (ইলিয়াড, ওডিসি এবং রামায়ণ-মহাভারত) Authentic epic বলে মানেন। 'গিলগামেশ্' সুমেরীয় দেশের মহাকাব্য (খ্রি.পূ.৩০০০)। গিলগামেশ্ সে দেশের রাজার নাম,—Eukidu নামে এক আধা পশু আধা মানুষের সঙ্গে নানা স্থানে তাঁর দুঃসাহসিক অভিযানের কথা এতে বর্ণিত হয়েছে। মৌখিক ঐতিহ্যের এটি একটি নিদর্শন। বারো খণ্ডে এটি সম্পূর্ণ।

(খ) Literary Epic বা সাহিত্যিক মহাকাব্য ঃ এই স্তরের উল্লেখযোগ্য মহাকাব্য হল—ভার্জিল এর ঈণিড্ Aeneid; Lucan-এর Pharsalia, অজ্ঞাতনামা কবির Song of Roland, Camoens-এর Os Lusiades, তাসো-র Gerusalemme Liferata, মিলটন-এর Paradise Lost, ভিক্তর উগো-র La Legende des siecles। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' এবং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার কাব্য'কে এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

৯১.১৫ সারাংশ

'কবিতা' মানবহৃদয়ের এক শাশ্বত প্রকাশ। এর আছে নানা ভাবগত বৈচিত্র্য, রূপগত প্রকরণ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কবিদল আজও কবিতার রূপ ও স্বরূপ নিয়ে নানান্ভাবে পরীক্ষা করে চলেছেন অবিরাম। কবিতার ভাব ও প্রকরণকে কখনো কোনো কবি নিজেই মতো করে আবিষ্কার কারন, কখনো বা অন্য কোনো কবির কাছ থেকে তা অর্জন করেন।

কবিতা হল কবির 'কল্পনা', তাঁর প্রজ্ঞা-অভিজ্ঞতার রূপ, তাঁর নির্মাণের নিদর্শন। তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার তথ্যরূপ নয়, 'সত্য' রূপ। এই ভাবনা অনুসারে গড়ে ওঠে একটি কবিতার শব্দচয়নরীতি, ছন্দোনির্মাণ, উপমা, চিত্রকল্প ও অন্ত্যমিল। কবিতার আক্ষরিক দিককে পেরিয়ে নিয়ে কবিকে পৌঁছতে হবে এক ব্যঞ্জনাময় ক্ষেত্রে। কবির নিজের উপলব্ধি ও অনুভূতিকে পাঠকের মনের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়াই কবির মূল উদ্দেশ্য।

কবির ব্যক্তিত্ব, মানস ও গভীর উপলব্ধি যেখানে বড়ো হয়ে ওঠে, সেখানে কবিতা হয় ' মন্ময় কবিতা' (Subjective Poetry), যেখানে বস্তু ও বিষয়টিই প্রধান হয়, সেখানে কবিতা 'তন্ময় কবিতা' (Objective Poetry)। মন্ময় কবিতার মধ্যে সঙ্গীতের একটি ভাব আছে, একদা সেগুলি বীণাযন্ত্রযোগে গাওয়াও হত, তাই তার নাম 'গীতিকবিতা'। এগুলি আকারে ছোটো, কিন্তু প্রকারে গভীর। নিসর্গজগৎ

ও রোমাণ্টিক অনুভূতি এর মূল দিক। গীতিকবিতা নানা ভাবের হতে পারে ঃ কবির আত্মচিন্তামূলক, ভক্তিভাবমূলক, স্বদেশপ্রেমমূলক, নিসর্গাশ্রিত, প্রেমমূলক, শোকবিষয়ক। তেমনি গীতিকবিতার নানা রূপও আছে ঃ 'ওড' রীতি, পত্ররীতি, সনেটরীতির গীতিকবিতা।

তন্ময় কবিতারও নানা বিষয়-ভাব রীতি আছে। যেমন, মহাকাব্য, আখ্যায়িকাকাব্য, গাথাকাব্য ও ব্যালাডও (বাঙলায় 'গীতিকা')। এছাড়া, রূপককাব্য, ব্যঙ্গকবিতা, নীতিমূলক কবিতা, প্রশস্তিমূলক কবিতা। 'আখ্যানকাব্য' এই নাম থেকেই বোঝা যায়, কাব্যের আকারে একটি আখ্যানকে এর মধ্যে রূপ দেওয়া হয়। Narration বা বর্ণনা এর প্রধান দিক। বিভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়েই 'আখ্যানকাব্য' রচিত হয়।

'মহাকাব্য' ক্লাসিকরীতির কাব্য। মহাকাব্য দুই ধরনের ঃ একটি প্রাথমিক ও আদিস্তরের। অপরটি সহিত্যিক মহাকাব্য। প্রথম স্তরের উদাহরণ ঃ রামায়ণ-মহাভারত, ইলিয়াড-ওডিসি। দ্বিতীয় স্তরের উদাহরণ ঃ জন মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' বা মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'। মহাকাব্য সম্পর্কে ভারতবর্ষীয় চিন্তা এবং পাশ্চাত্য চিন্তার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। প্রথম স্তরের মহাকাব্যের মধ্যে একটি দেশ-জাতি-সমাজের পূর্ণ পরিচয় ধরা পড়ে।

৯১.১৬ অনুশীলনী

(ক) নীচে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

১। 'Epic' অভিধাটির উদ্ভব সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

২। 'Epic' এর দুটি মূল বিভাগ কী কী?

৩। বিশ্বনাথের কোন্ গ্রন্থে কোন্ পরিচ্ছেদে এবং কোন্ শ্লোক থেকে কত-সংখ্যক শ্লোকে মহাকাব্যের লক্ষণ নির্দেশিত হয়েছে?

৪। রবীন্দ্রনাথের মতে কোন্ চারটি মহাকাব্য Authentic epic?

৫। দুটি বাংলা Literary epic-এর নামোল্লেখ করুন।

(খ) নীচে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির বিস্তৃত আলোচনা করুন ঃ

১। পাশ্চাত্যের সাহিত্য তাত্ত্বিকদের অনুসরণে এপিক বা মহাকাব্যের লক্ষণ নিরুপণ করুন।

২। বিশ্বনাথ কবিরাজের অনুসরণে ভারতীয় মহাকাব্যের লক্ষণ নির্দেশ করুন।

৩। Authentic epic এবং Literary epic-এর পার্থক্য নিরুপণ করুন।

৪। মহাকাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতামত ব্যক্ত করুন।

৯১.১৭ গ্রন্থপঞ্জি

১. রবীন্দ্রনাথ ঃ প্রাচীন সাহিত্য।

২. অতুলচন্দ্র গুপ্ত ঃ কাব্যজিজ্ঞাসা।

৩. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত ঃ কাব্যালোক।

৪. শ্রীশচন্দ্র দাশ ঃ সাহিত্য-সন্দর্শন।

৫. জীবেন্দ্র সিংহ রায় ঃ আধুনিক বাংলা গীতিকবিতা।

৬. বঙ্কিমচন্দ্র ঃ বিবিধ প্রসঙ্গ ('গীতিকাব্য' প্রবন্ধ)।

৭. সুকুমার সেন ঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস।

৮. প্রভাময়ী দেবী ঃ বাংলা আখ্যারিকা কাব্য।

৯. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ঃ নানাকথা।

১০. সাধনকুমার ভট্টাচার্য ঃ মহাকাব্য জিজ্ঞাসা।

১১. কুন্তল চট্টোপাধ্যায় : সাহিত্যের রুপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ।

১২. J. A. Cudden : A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory.

১৩. Wollman : Twentieth Century Narrative Poems.

১৪. W. J. Long : English Literature, Its HIstory and Its significance.

১৫. Hudson : An Introduction to the Study of Literature.

১৬. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ঃ সাহিত্যের রূপরীতি।

১৭ : A Glossary of Literary Terms : M H ABHRMS.

একক ৯২ ❑ নাটক

গঠন

৯২.১ উদ্দেশ্য
৯২.২ প্রস্তাবনা
৯২.৩ নাটকের সংজ্ঞা, উদ্ভব, প্রকারভেদ, উপকরণ
৯২.৪ ট্র্যাজেডি নাটক ঃ বিবর্তন, শ্রেণিবিভাগ, উদাহরণ
৯২.৫ অনুশীলনী
৯২.৬ কমেডি নাটক ঃ বিবর্তন, শ্রেণিবিভাগ, উদাহরণ
৯২.৭ প্রহসন নাটক ঃ বিবর্তন, শ্রেণিবিভাগ, উদাহরণ
৯২.৮ অনুশীলনী
৯২.৯ পৌরাণিক নাটক, উদাহরণ
৯২.১০ ঐতিহাসিক নাটক, উদাহরণ
৯২.১১ সামাজিক নাটক, উদাহরণ
৯২.১২ অনুশীলনী
৯২.১৩ সাংকেতিক নাটক, উদাহরণ
৯২.১৪ অনুশীলনী
৯২.১৫ একাংক নাটক, উদাহরণ
৯২.১৬ সারাংশ
৯২.১৭ অনুশীলনী
৯২.১৮ গ্রন্থপঞ্জি

৯২.১ উদ্দেশ্য

বিশ্বসাহিত্যের একটি প্রাচীন শাখা হল—নাটক। এমন দেশ নেই, যেখানে নাটকের প্রচলন নেই। নানাদেশে নানাভাবে নাটকের উদ্ভব ঘটেছে এবং তার নানা রূপ-রূপান্তর দেখা দিয়েছে। নাটকের উপস্থাপনাও নানা রকমের। নাটকের সেই নানা বিচিত্র রূপও বিষয়ের দিকটি তুলে ধরাই এই

এককটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এটি পড়লে নাটকের বিচিত্র ভাব ও প্রকরণ সম্পর্কে আপনি অবহিত হতে পারবেন।

৯২.২ প্রস্তাবনা

মানুষের জীবন ও মনের বিচিত্র দিককে অবলম্বন করে নাটক রচিত হয়। শুধু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন নয়, নাটকের মধ্য দিয়েই একটি জাতির পরিচয় ধরা পড়ে। কারণ সেই দেশ ও জাতির নিজস্ব পরিচয় নিবিড় ও ঘনিষ্ঠভাবে নাটকে প্রতিফলিত হয়। নাটককে তাই বলা হয়—একটি জাতির দর্পণ। আদিযুগে মানুষের নানা আনুষ্ঠানিক কৃত্যের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল। সেইসব অনুষ্ঠানের সময় যে-সব নৃত্য-গীত হতো, তারই ক্রমবিকশিত রূপ হলো নাটক। কালক্রমে সেই সব অনুষ্ঠানের পরিচয় লুপ্ত হয়ে গেছে, তবু ক্বচিৎ কখনো কোনো-কোনো নাটকের মধ্যে তার শেষ রেশ খুঁজে পাওয়া যায়। তারপর একদিন নাটক অনুষ্ঠান-মুক্ত হয়ে হলো—অনানুষ্ঠানিক। তখন মানুষের মন, জীবন, সমাজ ইত্যাদির কথা বিস্তৃত ও বিশদরূপে প্রতিফলিত হতে লাগল। নাটকের নানা প্রকরণ দেখা দিল। ট্র্যাজেডি-কমেডি-প্রহসন প্রভৃতি রূপে নাটকের বিকাশ হলো। কখনো পঞ্চাংক, কখনো তিন অংকে, কখনো একাংক রূপে তা উপস্থাপিত হতে লাগল। নৃত্য ও গীত তো আদিকাল থেকেই ছিল, কিন্তু নাটকের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই নৃত্য-গীতের তাৎপর্যময় প্রয়োগ শুরু হয়। সংলাপ হল নাটকের মূল উপকরণ। সংলাপ ছাড়া নাটকের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। সেই সংলাপের মধ্যেও কালে কালে নানা বিবর্তন দেখা গেছে। কখনো-গানেই সংলাপ, কখনো দীর্ঘ সংলাপ, কখনো উপভাষায় রচিত সংলাপ, কখনো মিশ্রভাষায় রচিত সংলাপ। প্রথমদিকে চরিত্র খুব একটা প্রাধান্য পেত না। চরিত্রের চেয়ে ঘটনাই প্রাধান্য পেত বেশি। তারপর চরিত্র তার আপন প্রাধান্য অর্জন করেছে। চরিত্রের সংখ্যা বেড়েছে, নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ-জীবনের সব পর্যায়ের মানুষ ক্রমে-ক্রমে নাটকে সম্মান পেয়েছে। অর্থাৎ জীবনকে পূর্ণরূপে প্রতিফলিত করবার চেষ্টা হয়েছে। চরিত্রের মধ্যে দেখা গেল—নায়ক চরিত্র, প্রতিনায়ক চরিত্র, নায়িকা-উপনায়িকা চরিত্রের বিভিন্নতা। তখন সংলাপও ভিন্ন হয়ে গেল। একক সংলাপ, স্বগতোক্তি, জনান্তিক উক্তি ইত্যাদি। কাহিনীতেও মূল একটি কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনীর সৃষ্টি হল। প্রথম যুগে রূপসজ্জা এবং দৃশ্যসজ্জা—কোনোটাই ছিল না। সাধারণ বেশবাসেই নাট্যাভিনয় করা হত। কালক্রমে বেশবাসের ভিন্নতা ও প্রয়োজনীতা বিশেষভাবে অনুভুত হয়েছে। রঙ্গামঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, দৃশ্যসজ্জা, যবনিকা, ইত্যাদির প্রবর্তন ঘটেছে। নাট্যকারেরা নতুন নতুন ভাব ও রূপের নাটক লিখতে শুরু করেছেন। সেই সঙ্গে অভিনয়রীতিরও উৎকর্ষ ঘটতে থাকে। গ্রিস দেশ ও ভারতবর্ষে নাটকের বিশেষ প্রচলন ঘটে। গ্রিস দেশের অ্যারিস্টটল এবং ভারতবর্ষের ভরতমুনি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। নাটকের এই বিচিত্র কথাই অতঃপর বিস্তৃতভাবে আলোচিত হচ্ছে।

৯২.৩ নাটকের সংজ্ঞা ঃ উদ্ভব, প্রকারভেদ ঃ উপকরণ

সংস্কৃতে নাটককে 'দৃশ্যকাব্য' বলা হয়েছে। দৃশ্য ও কাব্য এই দুটি প্রসঙ্গকে ভিন্নভাবে বিচার করে এ দুটির মধ্যে ঐক্যবন্ধ লক্ষ্য করলে বিষয়টি স্বচ্ছ হয়ে যায়। 'দৃশ্য' বলতে চোখের সম্মুখে অভিনয় করে যা দেখানো হয়। অভিনবগুপ্ত বলেছেন, 'কাব্য বস্তুত নাটকই'। নাটক— শ্রব্যকাব্য। যাদের মন নির্মল দর্পণের মতো, চিত্ত ক্রোধ-মোহ মুক্ত, তাঁরা নাটক শুনলেও নাটক চোখে দেখার মতো তার রস পান। নাট্যরস ও কাব্যরস অভিন্ন। যাদের সে সামর্থ্য নেই, তাদের জন্যই অভিনয় ও নৃত্য-গীতের ব্যবস্থা করতে হয়। অভিনয়ের উদ্দেশ্য হলো—মনের প্রকৃত ভাবকে ব্যক্ত করা। সে জন্য নানা প্রকার সাজ-সজ্জা, অঙ্গভঙ্গির ও অনুকরণের আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে। অ্যারিস্টটল বলেছেন, Mime বা অনুকরণ মানুষের এক স্বাভাবিক বৃত্তি এবং Mimesis বা অনুকৃতি থেকে অভিনয়ের উদ্ভব হয়েছে। সংস্কৃতে অভিনয়ের সামগ্রী বলতে চারটি : বাচিক (বাক্যের দ্বারা বিরচিত অভিনয়), আঙ্গিক (বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে অভিনয়), আহার্য (এর অর্থ ঃ 'আহরণীয়', 'কৃত্রিম'। অভিনয়কালের শরীরকে সৌষ্ঠবশালী ও সৌন্দর্যযুক্ত করবার জন্য যে সব আভরণ গ্রহণ করা হয়, তাই-ই আহার্যাভিনয়ের অন্তর্ভুক্ত), এবং সাত্ত্বিক (যে ভাব চিত্তের একাগ্রতা উৎপাদনে সক্ষম হয়, তাই হল সাত্ত্বিক ভাব)।

অভিনয়ের সঙ্গে নৃত্য ও গীতের অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে। গবেষকদের অনুমান, নৃত্য-গীত থেকেই নাটকের উৎপত্তি হয়েছে। সংস্কৃত 'নৃৎ' ধাতু থেকে 'নাটক' কথাটি এসেছে। সংস্কৃতে 'নাট্য' এবং 'নাটক' কথা দুটির মধ্যে যে পার্থক্য আছে, বাংলায় তা মেনে চলা হয় না। সংস্কৃতে দশবিধ রূপকের কথা বলা হয়েছে। 'রূপক' বলতে ইংরেজিতে যাকে বলে Drama, তাই হল 'নাট্য'। এ কিন্তু 'নাটক' নয়। নাটক হল, দশ প্রকার রূপকের "এক বিশিষ্ট প্রকার রূপক"। 'কাব্যালোক' বইতে ড. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত তাই মন্তব্য করেছেন, "বাংলায় রূপক অর্থে নাট্য শব্দের সঙ্গে ভুল নাটক শব্দ চলিয়া গিয়াছে।"

বাংলায় 'নাট' কথাটির অর্থ একাধিক—নৃত্য, অভিনয়, রঙ্গ-তামাশা। মধ্যযুগের বঙ্গীয় কবিরা এইসব নানা অর্থে 'নাট' শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। চর্যাপদে 'বুদ্ধনাটক' এবং নটপেটিকার উল্লেখ মেলে ধর্মমঙ্গালে পাই : "সাতকাণ্ড রামায়ণ নাচিল নাটকে।" অর্থাৎ নৃত্যের মাধ্যমে রামায়ণ নাটক পরিবেশিত হলো। 'নাটমন্দির' কথাটির অর্থ : "দেবমন্দিরের সমীপস্থ নৃত্যগীতোৎসবের মণ্ডপ।" সহজেই বোঝা যায়, তখন নৃত্যগীতাদি হতো দেব-মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে। সেই প্রাঙ্গণে দেবতাদেরই কর্মক্রিয়া, যা 'লীলা' নামে খ্যাত, তাই প্রদর্শিত হতো। প্রদর্শিত হত পুতুল-নাটের মাধ্যমে। অনেকে মনে করেন, প্রাচীন নাটকের প্রস্তাবক বা 'সূত্রধার' তা পুতুল-নাচের সূত্রধার থেকেই এসেছে। দেবতাদের কর্মক্রিয়া বা 'লীলা' প্রদর্শিত হতো বলেই, ভারতের কোনো-কোনো স্থানে নাটকের নামান্তর 'লীলা' আখ্যাটি

প্রচলিত আছে। বাঙলাতেও 'লীলা' নাটকের বিশেষ অংশ বোঝাতে প্রচলিত আছে (যেমন : 'দানলীলা', 'নৌকালীলা')।

প্রাচীনকালে মানুষের নানা পার্থিব প্রয়োজনে, নানাপ্রকার আচার-অনুষ্ঠান-অভিচার-যাদুকর্ম-পূজার আয়োজন করতে হত। কোনো আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে থাকত আভিনায়িক দিক। এই অভিনয়মূলক অনুষ্ঠানগুলি থেকেই নাটকের উদ্ভব হয়েছে। এই সব অভিনয়ের কালে নৃত্যগীতাদিও হত। গ্রিস দেশের দিওন্যিসুস (Dionysus) দেবতার পূজা-উৎসবের কালে এক বিশেষ ধরনের গান হত, তা ডিথিরাম্ব (Dthyramb) গান নামে পরিচিত। এই পূজা ও সঙ্গীত থেকেই কালক্রমে গ্রিক ট্র্যাজেডি নাটকের উদ্ভব ঘটেছে, যদিও কেউ কেউ বলেন, পূর্বপুরুষের প্রতি পূজা নিবেদনের পরবর্তী ফলরূপেই ট্র্যাজেডির উদ্ভব হয়েছে।

যাই হোক ভক্তিমূলক-পৌরাণিক বিষয় বা সাধু-সন্তদের অলৌকিক কর্মাবলীর বিবরণমূলক বিষয় প্রথম যুগের নাটকের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। কমেডি নাটক প্রথম যুগে প্রাধান্য অর্জন করেনি। প্রথম দিকে কমেডি ছিল আসলে গান, — হাস্যরসাত্মক গান। অ্যারিস্টটল কমেডি নিয়ে বিশেষ কিছু আলোচনা করেন নি, তাঁর মতে ট্র্যাজেডি যেমন উচ্চ-অভিজাত মানুষের নাটক কমেডি তেমনি অনভিজাত স্তরের মানুষের জন্য। নিজস্ব বা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সাহিত্য শাখা রূপে উদ্ভূত হবার পূর্বে কমেডি অন্যান্য নাটকে, দুই অঙ্কের মধ্যবর্তী ছোটো নাটক (অর্থাৎ Interlude) রূপে অভিনীত হত।

ভারতীয় নাটকের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। Dramaturgy অর্থাৎ নাট্যতত্ত্ব নিয়ে এখানে ভরতমুনি লিখেছেন 'নাট্যশাস্ত্র', নন্দিকেশ্বর লিখেছেন 'অভিনয়দর্পণ'। ভারতীয় নাটকের মূল লক্ষ্য কিন্তু 'রস'। এখানে ট্র্যাজেডি নাটক নেই। নাটকের সৃষ্টিকর্তারূপে ব্রহ্মার নাম করা হয়ে থাকে। তিনি ঋগবেদ থেকে পাঠ্য অংশ, সামবেদ থেকে সঙ্গীত, যজুর্বেদ থেকে অভিনয় এবং অর্থবেদ থেকে রস সংগ্রহ করে নাটকের সৃষ্টি করেন। নাটককে তাই বলা হয়—'পঞ্চম বেদ'। দৈত্যরা নাটক অভিনয়ের তীব্র বিরোধিতা করলে তাদের উপদ্রব থেকে রক্ষা করবার জন্য ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে নাট্যগৃহ প্রস্তুত করে দিতে বলেন। দৈত্যরা মনে করত, নাটক তাদের পক্ষে অপমানজনক। তার উত্তরে ব্রহ্মা বলেছিলেন, সকল শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করে নাটক সৃষ্ট হয়েছে। নাটক সকলের জন্য। এইজন্য নাটক আরম্ভের পূর্বে 'রঙ্গপূজা' করে নিতে হবে। ব্রহ্মা বলেছেন, নাটকে দেবগণের, রাজমণ্ডলের, ব্রহ্মর্ষিগণের থাকবে, তাদের সুখ-দুঃখের দিকগুলির অনুকরণ করে অভিনয় করলে তবেই তাকে 'নাট্য' বলা যাবে।

বেদের অনেক অংশ কথোপকথনে রচিত। যেমন—পুরুরবা-উর্বশীর কথোপকথন। এই সব অংশগুলিই নৃত্য-গীত সহযোগে অভিনয় করতে গিয়ে নাটকের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেক গবেষক অনুমান করেন।

নাটকের প্রকারভেদ নানাপ্রকার দৃষ্টিকোণ থেকে করা যায়। বর্তমান ক্ষেত্রে নাটকের রূপগত ও ভাবগত—এই দুই দিক থেকে করছি। রূপের দিক থেকে নাটক পঞ্চাঙ্ক, তিনাঙ্ক ও একাঙ্ক হতে পারে। বাংলা নাটকের প্রথম যুগে সঙ্গীতপ্রান এক ধরনের পালার প্রচলন হয়, যাকে বলা যায় অপেরা বা গীতাভিনয়। নৃত্য ও গীত নাটকের দুই প্রধান উপকরণ। পরবর্তীকালে গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের উদ্ভব হয় এই দুটি উপকরণকে ভিত্তি করে। নকশা ও প্রহসন নাটকের প্রকরণ অন্যান্য 'রেগুলার' বা 'নিয়মিত' নাটক থেকে ভিন্ন। কাজেই নাট্যশিল্প এদের স্থান ও মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে, ভাবের দিকের সঙ্গে রূপ-প্রকরণগত দিকটিকেও উপেক্ষা করা যায় না। তেমনি—শ্রুতিনাটক। এতে রঙ্গামঞ্চের যেমন প্রয়োজনীয়তা তেমনি, অনেক সময়েই পাত্র-পাত্রীরা থাকে অদৃশ্য। আজকাল অবশ্য পাত্র-পাত্রীরা দৃশ্য থেকেই নাটক পাঠ করে শোনাচ্ছেন, পাঠকালে অভিনয়ও করছেন, থাকছে আলো ও ধ্বনির ব্যবস্থা। মূকাভিনয়, মুখোস-নাটক প্রভৃতি এক-একটি বিশিষ্ট প্রকরণ।

ভাবগত দিক থেকে নাটকের বিভাগ সহজেই করা যায় ঃ ভক্তিমূলক নাটক, পৌরাণিক নাটক, ঐতিহাসিক, সামাজিক নাটক, ট্র্যাজেডি ও কমেডি নাটক রূপক-সাংকেতিক তত্ত্বনাটক, চরিতনাটক বা জীবনীমূলক নাটক, অ্যাবসার্ড নাটক। ট্র্যাজেডির সঙ্গে ট্র্যাজি-কমেডি নাটকেরও নাম করা যায়, যেমন কমেডির সঙ্গে প্রহসন বা Farce-এর নাম করা যায়। 'অতিনাটক' যদি পারিভাষিক অর্থে ধরি (অর্থাৎ পরিমাণে বেশি নয়), আমাদের বাঙলা সাহিত্যে তা নেই। এখানে 'অতিনাটক' বলতে তাকেই বুঝিয়ে থাকে, নাটকীয়তার পরিমাণ যেখানে অযৌক্তিক পরিমাণে অধিক।

নাটকের উপকরণ বলতে—কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র ও সংলাপ। কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনীর কথাও ওঠে। চরিত্র বলতে—চরিত্রের নাটকীয় তাৎপর্য , তার অর্ন্তদ্বন্দ্ব ও ক্রমবিকাশ। চরিত্রও নানা ধরনের হতে পারে। কমেডির চরিত্র, ট্র্যাজেডির চরিত্র, প্রহসনের চরিত্র—নাটকের ভাব ও রস অনুযায়ী চরিত্র পরিকল্পিত হবে। কখনো একক চরিত্র কখনো জনতা চরিত্র। সমাজের স্তর অনুযায়ী চরিত্র। ঐতিহাসিক নাটকে ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক চরিত্র একই ধরনের হবে না। তেমনি সামাজিক নাটকের চরিত্র সাংকেতিক নাটকে বা অ্যাবসার্ড নাটকে ভিন্ন রকমের হয়ে যাবে। সংলাপের মধ্যে থাকবে চরিত্র, পরিস্থিতি, প্রয়োজন অনুসারে সংলাপ। সংলাপও নানা ধরনের ঃ একোক্তি, স্বগতোক্তি, নেপথ্যে ও জনান্তিকে উক্তি। গান নাটকের আর একটি উপকরণ। গানের সংযোজন নানা ভাবে ও নানা কারণে হতে পারে। দেখতে হবে, অকারণে বা কেবল প্রমোদের কারণেই গান যোজনা না করা হয়। কোরাস (Chorus)-এর প্রয়োগ প্রাচীন গ্রিক নাটকের একটি প্রয়োজনীয় বিষয় যদিও আধুনিক নাটকে কোরাস-এর প্রয়োগ থাকে না। বাংলার ঐতিহ্যশালী যাত্রার পালাতে 'বিবেক' ইত্যাদি চরিত্রকে খানিকটা এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

রঙ্গামঞ্চ, দৃশ্যসজ্জা, অভিনয় রূপসজ্জা প্রভৃতি হল নাটকের প্রয়োগগত দিক। নাটকের আধখানা

তার সাহিত্যিক দিক আর বাকি আধখানা তার প্রয়োগগত বাস্তব দিক। এই প্রয়োগগত বাস্তব দিকটির ওপরেই আজকাল বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। নানা গবেষণা হচ্ছে। রঙ্গমঞ্চের বিবর্তন ঘটছে দিন-দিন, অভিনয় রীতিরও সূক্ষ্মতা বাড়ছে। আলো ও ধ্বনির প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই অধিক থেকে অধিকতর হচ্ছে।

নাটক দুভাবে পরিবেশিত হতে পারে ঃ পেশাদারী ও অপেশাদারী বা শৌখিন নাট্যদল কর্তৃক। পেশাদারী নাটকে স্বাভাবিক কারণেই তেমন কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা থাকে না, জনসাধারণকে আনন্দ দেওয়াই সেখানকার মূল লক্ষ্য। অপেশাদারী শৌখিন নাটক হলো এক-একটি বিশিষ্ট নাট্যভাবনাকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা এক-একটি নাট্যদলের বা গ্রুপ-থিয়েটারের সম্পদ। নাটক রচনা এবং অভিনয়ের মাধ্যমে রঙ্গমঞ্চে তার প্রয়োগ—দু'দিক থেকেই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে এখানে। এঁদেরই প্রয়াসে সে দেশের নাটকের উন্নয়ন ঘটে। অনেক নাট্যকার রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত না হয়েও নাটক রচনা করেন।

এক-একটি নাট্যদলের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও আদর্শকে রূপ দেবার জন্য কিংবা তার প্রচার-প্রসারের জন্য নাট্যপত্রিকার প্রকাশ করা হয়। এইসব নাট্যপত্রিকার প্রবন্ধ তাঁদের বিশিষ্ট চিন্তাকে তুলে ধরে।

৯২.৪ ট্রাজেডি নাটক ঃ বিবর্তন, শ্রেণিবিভাগ, উদাহরণ

গ্রিক 'Tragoidia' কথাটি থেকে 'Tragedy' কথাটি এসেছে। কথাটির অর্থ—'ছাগসঙ্গীত'। বিশ্বসাহিত্যের একটি বিশেষ দিক হল, 'ট্র্যাজেডি'। বহু দেশের বহু রসজ্ঞ পণ্ডিত যেমন ট্র্যাজেডির স্বরূপ লক্ষণ বিচার করেছেন, তেমনি জগতের বড়ো নাট্যকারই ট্র্যাজেডি নাটক রচনা করেছেন। অনেক রসজ্ঞ পণ্ডিতই ট্র্যাজেডি সম্পর্কে আলোচনা করলেও গ্রিক সাহিত্যশাস্ত্রী অ্যারিস্টটল (খ্রি.পূ. ৩৮৪-৩২২) তাঁর Poetics নামক গ্রন্থে ট্র্যাজেডি সম্পর্কে যে আলোচনা-বিচার করেছেন, তাকেই প্রথম প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। অ্যারিস্টটল তাঁর সমকালীন গ্রিক-নাট্যকারদের রচনাবলী অবলম্বন করে ট্র্যাজেডি তত্ত্বটি গড়ে তুলেছিলেন। অন্যান্য নাট্যকরাসহ এঁদের মধ্যে আছেন—এস্কাইলাস, সফোক্লিস এবং ইউরিপিদাস।

Poetics বা কাব্যতত্ত্বের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে ট্র্যাজেডি হলো—"The imitation of an action that is serious and also, as having magnitude, complete in itself; in language with pleasurable accessories, each kind brought in separately in the parts of the work; in a dramatic, not in a narrative form; with incidents arousing pity and fear, wherewith to accomplish its Catharsis of such emotions."

এই সংজ্ঞাটির মধ্যে ট্র্যাজেডির নানাদিকের কথা বলা হয়েছে। পর্যবেক্ষণ করে দেখলে এর মধ্যে ট্র্যাজেডির ছ'টি আঙ্গিক বিশেষত্বকে খুঁজে পাওয়া যাবে। সমালোচকেরা এই ছ'টি অঙ্গকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেনঃ একভাগ হলো—ট্রাজেডির বাহিরঙ্গক দিক ঃ ভাষা, সঙ্গীত এবং দৃশ্যসজ্জার দিক। আর এক ভাগ হল—এর অন্তরঙ্গ দিক ঃ প্লট, চরিত্র ও চরিত্রের চিন্তার দিক। ট্র্যাজেডির ঘটনাবলী দর্শকের মনে 'ভয়' ও 'করুণা' জাগাবে। তারই ফল হিসেবে, মনের মধ্যে এক বিশেষ অবস্থা, যাকে বলা হয়—'Catharsis'। এই ভাবটি মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলাই ট্র্যাজেডির মূল লক্ষ্য। ট্র্যাজেডির বহিরঙ্গের ও অন্তরঙ্গের যে ছ'টি অঙ্গকে নির্দেশ করা হল,—এই ছ'টি অঙ্গই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ও অন্বিত, কোনটিই বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে বিচার্য নয়। প্রথমে বহিরঙ্গীয় বৈশিষ্ট্যের কথা ঃ

বহিরঙ্গের দিক বলতে অ্যারিস্টটল নাটকের ভাষা, সঙ্গীত ও দৃশ্যসজ্জা (spectacle)- কে বুঝিয়েছেন। Poetics গ্রন্থের বিংশ থেকে দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ট্র্যাজেডির শব্দচয়ন ও ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন ট্র্যাজেডিতে লক্ষ্যপূরণের জন্যে যে-কোনো ধরনের ভাষাই ব্যবহার করা চলতে পারে। ট্র্যাজেডিতে গান বলতে যাকে মূখ্যত কোরাসদলের গীত। এই গানকে কোরাসদলের একটি প্রধান দিক বলতে হয়। দৃশ্যসজ্জাকে অ্যারিস্টটল যথোপযুক্ত মূল্য দেন নি। শেকসপীয়ারের 'কিং লীয়ার' নাটকে রাজা লীয়ারের মনের মধ্যে যে ঝড় চলছিল, বাইরের প্রাকৃতিক জগতেও তখন ঝড় চলছে। কিন্তু দৃশ্যসজ্জার মধ্যেও যদি সেই ঝড়কে ব্যক্ত করা না হয়, তবে ঝড়ের ব্যাপকতার হানি ঘটে। কোরাসের গান ছাড়াও কোনো-কোনো নাটকে অভিনেতাদেরও গান থাকত। শোকসঙ্গীতগুলি অভিনেতাগণ এবং কোরাসের দল সকলেই একসঙ্গে গাইত।

অতঃপর অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচ্য। প্লটকেই অ্যারিস্টটল সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছেন চরিত্রের চেয়েও বেশি। এ নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে নানা সংশয়-বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু প্লট সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের ধারণাটি বুঝে নিলে এই সংশয় অনেকটাই দূরীভূত হয়। প্লট হল, জীবনের নানা ঘটনার একটি শৃঙ্খলাময় সজ্জা বা বিন্যাস, বা পরিকল্পনা, যা সেই নাটকটির Catharsis জাগ্রত করতে সক্ষম। নাটকের পাত্র-পাত্রীরা সেই প্লটটিরই অনুকরণ করে, কোনো বিশেষ চরিত্রের জীবনের ঘটনাবলীকে নয়। এইজন্যেই চরিত্র নয়, প্লটকে অ্যারিস্টটল প্রাধান্য দিয়েছেন।

ট্র্যাজেডির প্লটের তিনটি প্রধান উপকরণ হল—Peripety বা Peripetia (= বিপর্যয়/বিপ্রতীপতা। আরম্ভের সঙ্গে শেষের বিপরীতভাব), Anagnosis(=আবিষ্কার করা), নায়ক-নায়িকা জীবন ও কর্ম সম্পর্কে যে নতুন সত্য ও ভাবকে শেষে আবিষ্কার করে), এবং তৃতীয়ত, নায়ক-নায়িকার জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা-বেদনা-ধ্বংসের দিক। নাটকের মধ্যে যে বিপরীতমুখী ঘটনা থাকবে, তাকে সম্ভবপর ও অপরিহার্য হতে হবে। Anagnosisহল— নায়ক-নায়িকার জীবন সম্বন্ধে একপ্রকার জ্ঞান লাভ। এই জ্ঞান কোনো ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে হতে পারে। প্লটকে তিনি সরল ও জটিল—এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন।

যেখানে ঘটনার পরিণতিতে কোনো বিপ্রতীপতা থাকে না, সেখানে প্লট হল সরল। আর যেখানে তা থাকে, তা জটিল প্লটের নাটক। উৎকৃষ্ট নাটকের প্লট হবে জটিল। বিপ্রতীপতা এবং আবিষ্কার—এই দুটি দিকের উদ্ভব ঘটবে প্লটের ভেতর থেকেই, যাতে মনে হবে এগুলো যেন পদর্বের ঘটনার অনিবার্য ফল।

প্লটের মধ্যে থাকবে স্থান-কাল-পাত্রের ঐক্য। পাত্র বা চরিত্রের ঐক্যের মূল কথা হলো—প্রতিটি চরিত্রের জীবনের সেই-সেই ঘটনাবলীকে নাটকটিতে স্থান দিতে হবে, যা নাটকটির মূল বক্তব্যের পরিপোষক। নাটকের সমস্ত ঘটনা সম্ভাব্যতা ও অপরিহার্যতার দৃঢ়বন্ধনে বাঁধা থাকবে। নাটকের উপকাহিনীও মূল কাহিনীর পরিপোষক হবে।

প্লটের পর অ্যারিস্টটল চরিত্রের কথা বলেছেন। ট্র্যাজেডি নাটকের নায়ক চরিত্র হবে এমন যার পরিণতি দর্শকের মনে 'ভয়' ও 'করুণা' জাগায়, যার পরবর্তী ফল রুপে মনে Catharsis-এর সৃষ্টি হতে পারে। নাটক হবে ভালোয়-মন্দয় মিশ্রিত মাঝামাঝি চরিত্র। পরিণামে একজন মন্দ লোকের সমৃদ্ধি ও উন্নতি ট্র্যাজেডির অনুকূল নয়। যে-মানুষের মধ্যে কিছু উদার ও মহৎ গুণের সমাবেশ থাকে, সেই মানুষই ট্র্যাজেডির আদর্শ নায়ক চরিত্র হতে পারে। নায়কের পতন ও ব্যর্থতার কারণ রুপে থাকবে তার জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত কোনো 'ভূল' কর্ম। একে বলে—'Hamartia' (অর্থ ঃ 'ভুল')। এই 'ভূল' কর্মের জন্যই নায়কের পতন-ব্যর্থতা ঘটে। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য নায়ক চরিত্রের Hubris/Hybris (= অবাধ ঔদ্ধত্য)। অবাধ ঔদ্ধত্যের কারণে নায়ক যেখানে দেবনির্দেশকে উপেক্ষা করে কিংবা তাকে অতিক্রম করতে চায়, তখন তার পতন ঘটে। নায়কেরই 'ভুল'-জনিত কর্মের প্রসঙ্গে তার চরিত্রগত কোনো Flaw বা ত্রুটির কথাও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নায়ক চরিত্রের Thouhgt বা 'চিন্তা'ই তার কর্মের মাধ্যমে নাটকে রুপায়িত হয়। অনেক সময়েই নায়ককে তার বিরুদ্ধ পরিস্থিতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। সেই নায়ক চরিত্রকেই অ্যারিস্টটল শ্রেষ্ঠ বলেছেন, যে তার বিরুদ্ধে পরিস্থিতিতেও প্রারম্ভিকভাবে সক্রিয় এবং সংগ্রামশীল হতে পারে। তবে এই সংগ্রামের ফলেই তার মধ্যে যখন অপ্রতিরোধ্য রুপে এসে পড়ে নিয়তি-নির্দিষ্ট অনিবার্য বিফলতা—সেখানেই ট্র্যাজেডির সূচনা হয়। সেখানে নায়ক অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করে।

ট্র্যাজেডির নায়ক চরিত্রের পতন-মৃত্যুর ফলে দর্শকের মনে যে 'ভয়' ও 'করুণা'র বোধ জাগ্রত হয়, তার ফলে এর পরবর্তী স্তরে, দর্শকের ভাবাবেগের যে মোক্ষণ ঘটে, তাকে বলে Catharsis (ইংরেজি অর্থ : Purgation, বাংলায় বলা যায় 'মোক্ষণ')। এই Catharsis-ই ট্র্যাজেডির মূল লক্ষ্য। অ্যারিস্টটল তাঁর Poetics গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এর উল্লেখ করেছেন, যদিও এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেননি। সমালোচকদের মধ্যে পরবর্তীকালে এ নিয়ে বিশেষ সংশয় ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। যাই হোক, অ্যারিস্টটল প্লটকে এমনভাবে সজ্জিত করতে বলেছেন, যাতে দর্শকমনে Catharsis-রে উদ্বোধন ঘটে।

এ যেন দর্শকের মনের সব তীব্র আবেগের নিঃশেষ প্রকাশের পর এক শান্ত-গভীর অবস্থা। এ যেন দর্শকমনে এক ধরনের 'স্বাস্থপ্রদ প্রতিক্রিয়া'। অনেকে মনে করেন, ঝড়ের পর এই প্রশান্ত অবস্থাই ট্র্যাজেডির 'আনন্দ' (pleasure)। মন যেন পার্থিব জগৎ থেকে ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়। যে-পরিস্থিতিতে মানুষ তার আপন প্রিয়জনকেও হত্যা করতে বাধ্য হয় সেই পরিস্থিতির প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য বিচার করে দর্শক যেন নিজের চিত্তকেও পরিশুদ্ধ করে নেয়। অবশ্য এই ধরনের চিন্তার মধ্যে একটি নৈতিক দিকও এসে পড়ে। Catharsis-জনিত ভীতি ও পরিশুদ্ধির অনুভব দর্শককে নিজের অজান্তেই বেদনা ও পরিণামের সঙ্গে সমীকৃত করে তোলে।

অ্যারিস্টটলের ট্র্যাজেডি-চিন্তার মধ্যে Destiny বা নিয়তি একটি প্রধান দিক হয়ে উঠেছে। মানুষ এখানে নিয়তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—এবং সে নিয়তি পূর্ব-নির্ধারিত। এই পূর্ব-নির্ধারিত নিয়তি দ্বারাই চালিত হয়ে মানুষ তার প্রিয়জনকে হত্যা করে বা এমন কাজ করে যা সে করতে চায়নি। এ যেন এক অনতিক্রম্য, অপ্রতিরোধ্য শক্তি, যাকে লঙ্ঘন করা যায় না। আসলে প্রাচীন গ্রিকরা ছিল নানা দৈবীশক্তিতে বিশ্বাসী। মানুষের উদ্ধত ব্যবহারে বা আচরণে এ যেন এক Nemesis (= প্রতিদান, প্রতিশোধ ; মানুষের আচরণে ক্ষুব্ধ দেবতার বিরূপতাময় প্রতিদান।— তারই ফলে মানুষের জীবনে নেমে আসে নিয়তির নিষ্ঠুর বিধান। এই শক্তির অধিষ্ঠান জগদ্ব্যপী, ট্র্যাজেডির নায়ক-নায়িকা এই শক্তিমান সত্তার হাতের ক্রীড়নক। নিজেদের চরিত্রের কোনো বিশেষ দোষ-দুর্বলতার কারণে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতে বাধ্য হয়। তারা মহৎ ও উদার চরিত্রের মানুষ হলেও এই শক্তির হাত থেকে মুক্তি নেই। নায়ক-নায়িকার জীবনের সেই দুঃখ- যন্ত্রণার দিকটি নাটকে রূপায়িত হয়। মানুষ এখানে অসহায়।

গ্রিক ট্র্যাজেডির আর এক বৈশিষ্ট্য হল Chorus (= অর্থ হল—'সমবেত সঙ্গীত/'নৃত্য')-এর প্রয়োগ। মূলত উর্বরতা বিষয়ক অনুষ্ঠানে 'কোরাস' দলবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করত, পরে এটি ট্র্যাজেডির এক অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। Aeschylus-এর নাটকে কোরাস সক্রিয় ভূমিকা নিত, Sophocles-এর নাটকে Actionসম্পর্কে টীকা-ভাষ্য প্রদান করত, আর Euripides-এর নাটকে এরা গীতিকবিতার যোগান দিত। গ্রিকদের কাছ থেকে রোমানরাও তাদের নাটকে এই ধারাটিকে গ্রহণ করে। গ্রিক নাটকের আদিযুগে কেবল একজন চরিত্রের সঙ্গে কোরাসের আলাপনই ছিল নাটক। পরে চরিত্রসংখ্যা বাড়তে থাকে। তাঁর Poetics গ্রন্থের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে অ্যারিস্টটল লিখেছেন, কোরাস নাট্য ঘটনার action-এ অংশগ্রহণ করবে। ভূমিকাধর্মী ভাষণ দিয়ে কোরাস রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করবে, শেষ পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে, এবং অতীত ঘঠনাবলীর চারণা করবে, বর্তমানের ঘটনাবলীর টীকা-ভাষ্য করবে এবং ভবিষ্যতের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত দান করবে। কোরাস যখন অতীত ঘটনার চারণা করে, তখন নাটকটির বিষয়গত পটভূমিকা সম্পর্কে দর্শককে অবহিত করে। যখন বর্তমানের ঘটনাবলীর ওপর টীকা-মন্তব্য করে তখন নাটকের প্লট ও চরিত্র সম্পর্কে দর্শকদের বুঝতে সাহায্য করে। আর ভবিষ্যতের ঘটনার ওপর ইঙ্গিত দিয়ে নাটকের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করে। কোরাস যেন ট্র্যাজেডি নাটকের নায়ক চরিত্রের সঙ্গে এক ধরনের মানসিক

সাযুজ্য অনুভব করে, নায়কের মহত্ত্বের কথা, যে বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে যে সংগ্রামশীল, তার কথা দর্শককে জানায়, তাকে সমবেদনা জানায়, সান্ত্বনা দেয়, উৎসাহিত করে, সর্তক করে দেয়, উপদেশ দেয়। তার কর্মে ও যন্ত্রণায় অংশগ্রহণ করে। এ-বিষয়ে 'কোরিক গীতি' (Ode) বিশেষ সহায়ক দিক।

নাটকের গঠন ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও কোরাস-এর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেহেতু কোরাস রঙ্গামঞ্চে সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকে, নাটকের স্থানগত, কালগত এবং Action বা ক্রিয়াগত ঐক্য রক্ষিত হয়ে থাকে। নাটকের পাত্র-পাত্রীর প্রবেশ প্রস্থানের কথা তারাই ঘোষণা করে। গ্রিক নাটক দৃশ্য বা অঙ্ক দ্বারা বিভক্ত হত না। এক-একটি পর্যায় (যাকে দৃশ্য বা অঙ্ক বলা যেতে পারে) শেষ হলে তারা যে 'গীতি' (একে Ode বলা হত) গাইত, তার দ্বারাই দৃশ্য-অঙ্কের বিভাগের আভাস ফুটে উঠত।

গ্রিক নাটকের গঠনের কয়েকটি বিশেষত্ব ছিল। সেগুলি এই ঃ ১.Protasis : নাটকের প্রারম্ভিক অংশে চরিত্র যেখানে প্রবর্তিত হচ্ছে, পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। ২.Epitasis : প্লট যেখানে ঘনীভূত হচ্ছে। ৩. Catastasis : ট্র্যাজেডির চারটি স্তর বিভাগের মধ্যে এটি তৃতীয়। এটির অন্যতম অর্থ হল, কোনো ভাষণের ভূমিকা। ৪. Catastrophe : এর আক্ষরিক অর্থ হল— 'ওলটানো অবস্থা'। নাটকের আখ্যানের সর্বোন্নয়নের পরবর্তী অংশ, গ্রন্থিমোচনের অংশ।

এই প্রসঙ্গ গ্রিক ট্র্যাজেডির আয়তন-পরিমাপগত অংশগুলোও (Quantitative Parts) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেগুলি হল—Prologue, Episode, Exode এবং Choric Song। Prologue হল সমগ্র নাটকটির সেই অংশ যা কোরাসের আগমনের পূর্ববর্তী Episode দু'টি সম্পূর্ণ কোরাস গানের মধ্যবর্তী অংশ। Exode হল একটি সমগ্র নাটকের সেই অংশ, যার পরে আর কোরাসগীতি হবে না। Choric অংশকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হত ঃ 'Parode' হল কোরাসের অবিভক্ত গান, প্রথম গান। কোরাস-গীতি (একে বলে Ode) এক বিভাজিত অংশ Stasimon, অপর বিভাজিত অংশকে বলে Trochee। এদের ছন্দোরূপ ভিন্ন।

ট্র্যাজেডির স্বরূপ নির্দেশ করবার জন্য অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির সঙ্গে মহাকাব্যের পার্থক্যও নিরূপণ করেছেন। মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডির মধ্যে প্রথম পার্থক্য হল, মহাকাব্য হল বর্ণনারীতির দৃষ্টান্ত, আর ট্র্যাজেডি হল জীবনের Action-এর অনুকরণ। দ্বিতীয়ত, ট্র্যাজেডির কালসীমা সাধারণত সূর্যের এক আবর্তনকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ, মহাকাব্যের তেমন কোনো কালগত সীমা নেই। তৃতীয়ত, একটি মহাকাব্য আগা-গোড়া একই ছন্দে লিখিত হতে পারে কিন্তু একটি ট্র্যাজেডি নাটকে থাকতে পারে একাধিক ছন্দের প্রয়োগ। মহাকাব্যের সব উপকরণই ট্র্যাজেডিতে মেলে, কিন্তু ট্র্যাজেডির সমস্ত বিশেষত্ব ও উপকরণ মহাকাব্যে মেলে না। অবশ্য মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডির মধ্যে সাদৃশ্যও আছে। প্লটের মধ্যে যে ঐক্যের দিক তা ট্র্যাজেডি এবং মহাকাব্য উভয়ের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য এক অপরিহার্য দিক।

যুগে-যুগে ট্র্যাজেডি নাটকের নানা বিবর্তন ঘটেছে, নানা দেশের নাট্যকারদের দ্বারা। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম

থেকে চতুর্থ শতাব্দী ছিল গ্রিক নাটকের স্বর্ণযুগ। এই যুগকে বলা হয় 'ক্লাসিক্যাল ট্র্যাজেডি'র যুগ। Aeschylus, Sophocles, Euripides ছিলেন এই যুগের নাট্যকার। কোরাসের প্রয়োগ, স্থান-কাল-ঘটনার ঐক্য রক্ষা, দুতের মাধ্যমে নাটকের ঘটনার চরম বিপর্যয়ের সংবাদ দান— এইগুলি ছিল ক্লাসিক্যাল ট্র্যাজেডির প্রধান লক্ষণ। অতঃপর ট্র্যাজেডির কেন্দ্রভূমি গ্রিস থেকে রোমে স্থানান্তরিত হয়। Hellenic অর্থাৎ গ্রিক নাট্যধারার প্রভাব ইতালীয় নাট্যকারদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। এখানকার শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিকার— সেনেকা (Seneca)। তবে গ্রিক বা ক্লাসিক্যাল আদর্শকে এঁরা সর্বত্রই গ্রহণ করেন নি। গ্রিক নিয়তিবাদের পরিবর্তে এঁরা গ্রহণ করলেন— মানুষের নিজস্ব ক্রিয়া-কর্মকে, মানবিক-শক্তিকে। ফলে একদিকে এখানকার ট্র্যাজেডি নাটকে এল—মৃত্যু, রক্তপাত, প্রতিশোধ, পারস্পরিক নির্বাধ হত্যা এবং অতিপ্রাকৃত ভয়ঙ্কর শক্তির প্রতি বিশ্বাস। গ্রিক নাটকের Catharsis নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, দেখা গেল অতিনাটকীয়তার প্রভাব । নাটকের মধ্যে গীতিভাব অপেক্ষা দীর্ঘ অলংকারপূর্ণ ভাষণ ও বক্তৃতা স্থান পেল। সেনেকার এই নাট্যরীতি ইউরোপে বিশেষ সমাদৃত হল। এই ট্র্যাজেডির যুগকে বলা হয় Revenge ট্র্যাজেডির যুগ।

ইতালির রেনেসাঁস (Renaisance)-এর লব্ধ ফল গোটা ইউরোপেই প্রসারিত হয়। ট্র্যাজেডির এক নতুন রঙ্গভূমির সৃষ্টি হয় ইংলণ্ডে, স্বভাবতই শেকস্‌পীয়ার ছিলেন তার নায়ক। সেখানকার ট্র্যাজেডি মূলত রোমান্টিক আদর্শের ট্র্যাজেডি। রানী এলিজাবেথের যুগে এর বিকাশ। শেকস্‌পীয়ার ছাড়া মার্লো বেন জনসন প্রভৃতি নাট্যকারেরা এই যুগকে অলংকৃত করেন। সেনেকার আদর্শে এখানে নিয়তির বদলে মানুষই ভাগ্যের পরিচালক হয়েছে। শেকস্‌পীয়ার দেখালেন, নিয়তির অধিষ্ঠান বাইরে নেই, মানুষেরই অন্তরে সে আছে। এরই ফলে ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে মানবিক চরিত্রগুলি অনেক বিকশিত হলো। যদিও সেনেকার প্রভাবজাত অশরীরী আত্মার মূর্তি পরিগ্রহ ইত্যাদি সব ভৌতিক ব্যাপার শেকস্‌পীয়ারের নাটকেও (যথা : 'হ্যামলেট', 'ম্যাকবেথ', 'জুলিয়াস সীজার') দেখা দিয়েছিল। তবে, গ্রিক কোরাস রীতির অনুসরণ সাধারণভাবে এখানে নেই, দুতের মাধ্যমে চরম বিপর্যয়ের সংবাদদানের প্রথা নেই, অপ্রধান চরিত্রের মাধ্যমে কোরাস-রীতির পরোক্ষ অনুসরণ অবশ্য আছে, আছে স্বগতোক্তির ব্যবহার, গীতির ব্যবহার। সেই সঙ্গে ট্র্যাজেডির মধ্যে Dramatic relief রূপে কিছু কিছু লঘুরসের দৃষ্টান্তও মেলে।

ফ্রান্সে ও জার্মানিতে প্রতিভাধর অনেক নাট্যকার এক বিশিষ্ট নাট্যধারার প্রবর্তন করলেন, যা নব্য, ক্লাসিক্যাল যুগ বা Neo-classical যুগ রূপে কথিত। এঁদের মধ্যে আছেন, জার্মানির গ্যেটে, লেসিং শিলার এবং ফ্রান্সর Racine। রীতির দিক থেকে এ ধারার নাটক গ্রিক নাট্যরীতিরই অনুসারী। বিষয়ের দিক থেকে প্রাধান্য পেয়েছে প্রেম ও রোমান্টিকতার দিক। তবে ভাষার দিক থেকে অলংকার ও আড়ম্বরপূর্ণ রীতির প্রভাব দেখা গেছে। কোরাসের প্রয়োগ নেই। স্থান-কাল-ঘটনার ঐক্য রক্ষার নিদর্শন আছে। এই নব্য ক্লাসিক্যাল যুগের ট্র্যাজেডির বিষয়গত আর একটি দিক হল বীর নায়ক পুরুষদের নিয়ে ট্র্যাজেডি রচনা। তা ইংলণ্ডেও দেখা গেছে।

অতঃপর ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে আর এক পরিবর্তন সূচিত হল। সামাজিক-পারিবারিক-গার্হস্থ্য জীবনকে অবলম্বন করে এবং এই জীবনেরই সমস্যাকে ভিত্তি করে ট্র্যাজেডি রচনা করা। এতদিন ট্র্যাজেডি বলতে বোঝাত উচ্চ-অভিজাত-রাজপুত্রদের কাহিনী, প্রখ্যাত বীর নায়কদের কাহিনী। কিন্তু নরওয়ের ইবসেন এসে ট্র্যাজেডিকে একেবারে নিতান্ত ঘরের বিষয় করে তুললেন তাঁর 'A Doll's House', 'An Enemy of the People' প্রভৃতি নাটকে। এরই ফলে, ইংলণ্ডের জন গলস্‌ওয়ার্দির (Galsworthy) 'Justic' নাটকের মধ্যে নায়ক চরিত্ররূপে দেখা দিল এক ব্যাংক কর্মচারী, — যে মধ্যবিত্ত অর্থ-সংস্কৃতির একজন প্রতিনিধি।

নানা ভিন্ন ভিন্ন নাট্যরূপ (dramatic form)-এর মধ্য দিয়েও ট্র্যাজেডির বিকাশ ঘটেছে। যেমন, একাংক নাটক, কাব্যনাটক। অনেক কবি ও নাট্যকার এদিকে লেখনী চালনা করেছেন।

ট্র্যাজেডি নাটকের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সব দেশের সব ভাষাতেই মেলে। তার থেকে কেবল কয়েকটি পরিচিত ট্র্যাজেডি নাটকের কথা এখানে আলোচিত হল ঃ

শেকস্‌পীয়ার শিক্ষিত বাঙালির কাছে বিশেষ পরিচিত। তাঁর ট্র্যাজেডি নাটকের মধ্যে অনেকগুলিই বাঙালির প্রিয়। ধরা যাক, শেকস্‌পীয়ারের ট্র্যাজেডি নাটকে নিয়তির প্রসঙ্গটি। 'Othello' নাটকে ডেসডিমোনার রুমাল হারিয়ে ফেলা,— যা নিজেরই অজ্ঞাতে কৃত একটি কর্ম, সেই রুমালই ইয়াগো ওথেলোকে দেয়, ডেসডিমোনার অসতীত্বের সাক্ষী রূপে। ওথেলার মনে ডেসডিমোনার প্রতি সন্দেহ চলছিলই। আরো পারিপার্শ্বিক নানা কারণের যোগফল রূপে, একদিন রাতে সে যখন গলা টিপে ডেসডিমোনাকে মৃতপ্রায় করে তুলল, এমন সময়ে এমিলিয়া এসে সব ঘটনা খুলে বলল, ওথেলোর তখন আত্মহত্যা করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। নিয়তি এখানে ডেসডিমোনারই অন্তরস্থিত এক বিরূপ ও বিরুদ্ধ সত্তা। 'নীলদর্পণ' নাটকেও নিয়তি একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। গোলোক বসুর বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা করা হয়েছিল, তাঁকে হাজতবাসের নির্দেশ দেওয়া হয়, এদিকে মামলা মিথ্যে বলে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয় ; সে হুকুম নিয়ে আসার আগেই গোলোক উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন— অথচ তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এখানে নিয়তি এভাবেই কাজ করেছে, এই ফলেই পরবর্তীকালে, এই বসু-পরিবারে পারিবারিক বিপর্যয়ের সূচনা হয়।

King Lear নাটকে রাজা লীয়ার তিন কন্যার (গনেরিল, রিগেন এবং কর্ডেলিয়া) মধ্যে কনিষ্ঠা কন্যা কর্ডেলিয়ার প্রতি 'ভুল' করে অন্যায় কাজ করেছিলেন। অপর দুই কন্যার বিরূপ আচরণে তিনি উন্মাদ হয়ে যান। শেষে তাঁর মনে এল Anagnorisis, (ওথেলার মধ্যেও এই Anagnorisis-এর প্রবর্তন ঘটেছিল), তখন মৃতা কন্যার প্রতি যথেষ্ট পিতৃস্নেহ প্রদর্শন করেও আর তাকে ফিরে পেলেন না। দ্বিজেন্দ্রলালের 'শাজাহান' নাটকেও দেখা যায়, শাজাহানের পিতৃস্নেহের দুর্বলতাই তাঁর ট্র্যাজেডির কারণ। পিতৃস্নেহ এখানে Tragic flaw হয়ে দেখা দিয়েছে। শচীন্দ্রগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে দেখা যায়, সিরাজের মধ্যে একটি রোমান্টিক আবেগ কাজ করেছিল, সেটাই তাঁর সব কর্ম-ক্রিয়া Dianoia, Thought বা চিন্তা, তাকেই তিনি রূপদান করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এই আবেগই তাঁর Fatal flaw।

গ্রিক ট্র্যাজেডিকার ইউরিপিদেস-এর বিখ্যাত ট্র্যাজেডি নাটক 'ইফিগেনেইয়া হে এন আউলিদি' (Iphigeneia-e-en Aulidi)/ইফিগেনিয়া ইন আলিসে-র প্রসঙ্গে মাইকেলের 'কৃষ্মকুমারী' বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী' নাটক দুটি স্মরণীয়। 'কৃষ্মকুমারী' যে পদ্মিনীর অশরীরী সত্তাকে দেখেছিলেন বা তাঁর বাণী শুনেছিলেন, সে কি গ্রিক ট্র্যাজেডির দৈবাদেশ? আমরা মনে করি, এ কৃষ্মকুমারীরই অন্তরের নির্দেশ, কাজেই নিয়তি এখানে বাইরের কোনো শক্তি নয়।

কয়েকটি নাটক পর্যালোচনা করে দেখা গেল, বিভিন্ন নাটকে ট্র্যাজেডির নানাদিকের বিকাশ ঘটেছে।

৯২.৫ অনুশীলনী

(ক) নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

১। অভিনয় কাদের জন্য, অভিনয়ের উদ্দেশ্য কী?

২। 'Mimesis-কথাটির অর্থ ও প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। সংস্কৃত ' নাট্য' এবং 'নাটকে'র মধ্যে পার্থক্য কী?

৪। 'সুত্রধার' অভিধাটির পরিচয় দিন।

৫। ভারতীয় নাটককে কেন 'পঞ্চম বেদ' বলা হয়?

৬। 'Tragoidia' কথাটির অর্থ কী?

৭। অ্যারিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডির শেষ লক্ষ্য কী?

৮। 'Nemesis' কথাটির প্রসঙ্গে আলোকপাত করুন।

৯। 'Hybris/Hubris কাকে বলে?

১০। 'Anagnorisis' কী?

(খ) নীচের প্রশ্নগুলির বিশদ উত্তর দিন।

১। 'দৃশ্যকাব্য' সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। রূপগত এবং কাব্যগত—এই দুই দিক থেকে নাটকের শ্রেণিভাগ করুন।

৩। অ্যারিস্টটলের অনুসরণে ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা দিন এবং ছয়টি অঙ্গের উল্লেখ করে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করুন।

৪। 'প্লট' বলতে অ্যারিস্টটল কী বুঝিয়েছেন? কেন তিনি চরিত্রের ওপর প্লটের স্থান নির্দেশ করেছেন?

৫। গ্রিক ট্র্যাজেডিতে কোরাসের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬। সেনেকা এবং শেকস্‌পীয়রীয় ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্য কী?

৭। বিভিন্ন যুগের ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করুন।